সম্পাদক :

ঐতিহ্যের
মৃত্যু
নেই.....
দেশে বিদেশে এই কারুশিল্পের
শিল্পের প্রসারে সদা সচেষ্ট
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

এ সংখ্যায় :

চিত্র-পরিচিতি ঃ
বহুরূপী-প্রযোজনার মিছিলে সেই অবিস্মরণীয় মুখ আর মুহূর্তগুলি।
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
কুমার রায়।

বহুরূপী

নাট্য-ষান্মাসিক। চতুর্দশ-'বিশেষ'-সংখ্যা
সম্পাদক। গঙ্গাপদ বসু
প্রকাশক। বিমল গুপ্ত
প্রকাশনের স্থান। ১১-এ নাসিরুদ্দিন রোড, কলি: ১৭
মুদ্রণ। ফটো-প্রিন্ট এ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৮, বলদিয়াপাড়া রোড, কলি: ৬
ব্লক, প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১-এ রৈমোর ক্যাসেল স্ট্রিট, কলি: ৮-
পত্রিকা বন্ধন। নব আদর্শ, ৪, রামমোহন রায় রোড, কলি: ৯
এ সংখ্যার দাম। দেড় টাকা

একটি অভিনয় রজনী

॥ মোহিত মুখোপাধ্যায় ॥

ছেলেটা রাগে ফুঁসছিল। প্যারিসের পোর্ট-সেন্ট-মার্টিন থিয়েটার-'ভ্যামপায়ারে'র অভিনয় রজনী। সারা প্যারিস সহর যে নাটক দেখার জন্ম ক্ষেপে গেছে তা'র আরম্ভ হ'ল বলে। বিরাট মঞ্চ জুড়ে নক্সাকাটা পর্দাটা কাঁপছে, অর্কেষ্ট্রা স্টলে যন্ত্রবাঁধার টুংটাং আওয়াজ উঠেছে, বক্সে সৌখীন প্যারিস বাসিনীদের জহরতগুলো তেলের আলোয় ঝলসে উঠছে। আলো-অন্ধকারে, ভীড়ে, উৎসাহে একটা মাদকতা ছেলেটাকে বারে বারে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলছে—কিন্তু বারবার সে ক্ষেপে উঠছে।

ক্ষেপবে নাই বা কেন। গাঁয়ের ছেলে প্রথম সহরে এলো ইউরোপের কলাতীর্থে, প্যারিসে। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, নাটক লিখবে—নাট্যকার হবে। এমন নাটক লিখবে যা'র অভিনয় শেষ হলে আত্মবিস্মৃত মুগ্ধ দর্শক হঠাৎ সম্বিত পেয়ে করতালির ঝড় ওঠাবে প্রেক্ষাগৃহে—বার বার দাবী জানাবে নাট্যকারকে চাই। আর যবনিকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অভিবাদন গ্রহণ করবে সে। রাজা যা পায় না, কোটিপতির ভাগ্যে যা মেলে না, তা'ই তা'র চাই। সর্বমনের গভীরে তার নিজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু হ'ল কি? প্যারিসে এসেই শুনল, 'ভ্যাম্পায়ার দেখো নি? জীবন বৃথা। নাটক লিখবে আর এমন নাটক চোখে দেখলে না?' কাজেই একবেলার খাবার পয়সাটা থিয়েটারের জন্য বরাদ্দ হ'ল। অভিনয়ের ঘণ্টা খানেক আগেই এসে পৌঁছাল, তখন সাপের কুণ্ডলীর মত পাকে পাকে জড়ানো মানুষের ভীড় ঠেলে টিকিট ঘরের সামনে পৌঁছান অসম্ভব। প্যারিসের সুবিখ্যাত ঠকবাজের হাতে কয়েক ফ্রাঁ দণ্ড দিয়ে কোনোমতে 'পিটে'র একটা টিকিট জোগাড় হ'ল; কিন্তু সে শুধু বিপদের আরম্ভ।

ভেতরে বসে চারপাশ দেখতে দেখতে চোখ পড়ল একদিকে। 'পিটে'রই একটা জায়গা, একটু উঁচু, এখান থেকে স্টেজ সুন্দরভাবে দেখা যায় ভীড়ও বেশী নয়। কাজেই ছেলেটা টুক করে সেখানে বসে পড়ল। হঠাৎ একজন পাশ থেকে বলল 'কোত্থেকে এলে, নতুন?' আর একজন বলল 'ডুচার্ড পাঠাল বুঝি?' আর একজন বলল 'রোমান তো?' ব্যাপারটা কি? একটু রেগেমেগেই সে বলল, 'আমি কে, তোমাদের অত জানার কি আছে? টিকিট কেটে এসেছি, ব্যাস!' আর যাবে কোথায়! ঠাট্টা, টিটকারী হট্টগোল সুরু হয়ে গেল, তাই থেকে বচসা এবং হাতাহাতি। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খুব গম্ভীর মুখে, অত্যন্ত ভদ্রভাবে ছেলেটাকে বলল 'আপনি আমার সঙ্গে

136

একটি অভিনয় রজনী

॥ মোহিত মুখোপাধ্যায় ॥

ছেলেটা রাগে ফুঁসছিল। প্যারিসের পোর্ট-সেন্ট-মার্টিন থিয়েটার-'ভ্যামপায়ারে'র অভিনয় রজনী। সারা প্যারিস সহর যে নাটক দেখার জন্য ক্ষেপে গেছে তা'র আরম্ভ হ'ল বলে। বিরাট মঞ্চ জুড়ে নক্সাকাটা পর্দাটা কাঁপছে, অর্কেষ্ট্রা স্টলে বাদ্যযন্ত্রগুলোর টুংটাং আওয়াজ উঠেছে, বক্সে সৌখীন প্যারিস বাসিনীদের জহরতগুলো জেলের আলোয় ঝলসে উঠছে। আলো-অন্ধকারে, ভীড়ে, উৎসাহে একটা মাদকতা ছেলেটাকে বারে বারে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলছে—কিন্তু বারবার সে ক্ষেপে উঠছে।

ক্ষেপবে নাই বা কেন। গাঁয়ের ছেলে প্রথম সহরে এলো, ইউরোপের কলাতীর্থে, প্যারিসে। একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, নাটক লিখবে—নাট্যকার হবে। এমন নাটক লিখবে যা'র অভিনয় শেষ হলে আত্মবিস্মৃত মুগ্ধ দর্শক হঠাৎ সম্বিত পেয়ে করতালির ঝড় ওঠাবে প্রেক্ষাগৃহে—বার বার দাবী জানাবে নাট্যকারকে চাই। আর যবনিকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অভিবাদন গ্রহণ করবে সে। রাজ্য যা পায় না, কোটিপতির ভাগ্যে যা মেলে না, তা'ই তার চা'ই। সর্বমনের গভীরে তার নিজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু হ'ল কি? প্যারিসে এসেই শুনল, 'ভ্যাম্পা'য়া'র দেখো নি? জীবন বৃথা। নাটক লিখবে আর এমন নাটক চোখে দেখলে না?' কাজেই একবেলার খাবার পয়সাটা থিয়েটারের জন্য বরাদ্দ হ'ল। অভিনয়ের ঘণ্টা খানেক আগেই এসে পৌঁছাল, তখন সাপের কুণ্ডলীর মত পাকে পাকে জড়ানো মানুষের ভীড় ঠেলে টিকিট ঘরের সামনে পৌঁছান অসম্ভব। প্যারিসের সুবিখ্যাত ঠকবাজের হাতে কয়েক ক্রাঁ দণ্ড দিয়ে কোনোমতে 'পিটে'র একটা টিকিট যোগাড় হ'ল; কিন্তু সে শুধু বিপদের আরম্ভ।

ভেতরে বসে চারপাশ দেখতে দেখতে চোখ পড়ল একদিকে। 'পিটে'রই একটা জায়গা, একটু উঁচু, এখান থেকে স্টেজ সুন্দরভাবে দেখা যায় ভীড়ও বেশী নয়। কাজেই ছেলেটা টুক করে সেখানে বসে পড়ল। হঠাৎ একজন পাশ থেকে বলল 'কোখেকে এলে, নতুন?' আর একজন বলল 'ফুচার্ড পাঠাল বুঝি?' আর একজন বলল 'রোমান তো?' ব্যাপারটা কি? একটু রেগেমেগেই সে বলল, 'আমি কে, তোমাদের অত জানার কি আছে? টিকিট কেটে এসেছি, ব্যাস!' আর যাবে কোথায়! ঠাট্টা, টিটকারী হট্টগোল সুরু হয়ে গেল, তাই থেকে ঝগড়া এবং হাতাহাতি। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক খুব গম্ভীর মুখে, অত্যন্ত ভদ্রভাবে ছেলেটাকে বলল 'আপনি আমার সঙ্গে

মুচড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে যে সারা সারি বেদনাবিস্তার হয়ে উঠবে। আসলে নাটক অভিনয় করলেই হয় না, নাটক উপভোগও করাতে জানতে হয়।

'ক্লাকে'দের জন্ম রোম সম্রাট নীরোর আমল থেকে, তাই এরা নিজেদের রোম্যান বলে জাহির করে।

ইতিমধ্যে অভিনয় চলেছে। মঞ্চের পর্দা উঠলে ছেলেটা সবভুলে অভিনয় দেখতে সুরু করে, আর ভদ্রলোক বই পড়েন। সে অঙ্ক শেষ হলে ভদ্রলোক বই বন্ধ করেন। সমস্ত দর্শকের প্রশংসার বিরুদ্ধে একা হিস্‌হিস্ করেন। আবার আওয়াজ ওঠে বার করে দাও, বার করে দাও। কলরব শান্ত হলে গল্প চলে মাঝবয়েসী ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বল্পবয়েসী ছেলেটার। সে শোনে যে ক্লাকেদের কখনো সাহস হয় না খারাপ নাটক, বাজে অভিনয় ভালো বলে তারিফ করতে। প্যারিসের তুখোড় নাট্যামোদীরা তা সহ্য করবে না। সে শোনে নাটক লিখতে হলে লিখতে হবে এমন বিষয় নিয়ে যা মানুষের হৃদয় এবং বুদ্ধি দুটোকেই আলোড়িত করে, যা মানুষের স্বপ্ন এবং শক্তি। ভদ্রলোকের নাক কুঁচকে ওঠে তাঁহিল্যো—ভাম্পায়ার। লেখো বিদ্যুত নিয়ে, বারুদ নিয়ে, বাষ্পশক্তি নিয়ে লেখো একফোঁটা জলে যে কোটি কোটি প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিয়ে। লেখো সাহসী মানুষের হৃদয় বেদনা নিয়ে, চরম বেদনার মধ্যে দেবোত্তর মানুষের মহিমাকে অবলম্বন করে। লেখো ভণ্ডামী, কুসংস্কার, আত্মম্ভরিতার দম্ভকে উপহাস করে।'

অভিনয় শেষ হোলো। ভদ্রলোক বই মুড়ে জনারণ্যে মিশে গেলেন, কিন্তু ছেলেটা সঙ্গ ছাড়লো না। পাশে গিয়ে ধরল আবার, বললো আপনার সঙ্গ বড় ভালো লাগলো কিন্তু আপনার পরিচয়টা পেলাম না। ভদ্রলোক বিচিত্র হেসে ছেলেটাকে নিয়ে গেলেন থিয়েটারের সামনে যেখানে অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে যেখানে অভিনেতাদের নামের আগে লেখা নাট্যকারের নাম 'ম'সিয়ে এক্স'। তার তলায় আঙুল দিয়ে বললেন ঐ লোকটাই আমি 'ম'সিয়ে এক্স।'

"—আপনার নিজের লেখা নাটকে বিদ্রূপ করছিলেন" বিস্ময়ে হতবাক ছেলেটা প্রশ্ন করল।

"তোমার নিজের নাটকের অভিনয়ে তুমি নিন্দা করবে, আর সারা হল জুড়ে লোক বলবে অধৈর্য্য হয়ে 'বার করে দাও ওকে'। এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে বলো। আমার বড় আনন্দ লাগে এতে।" ছেলেটা বলল আমি নাটক লিখতে চাই। এমন নাটক যা নাট্যকার ধিক্কার দিলেও দর্শকরা তাকে বার করে দিতে চাইবে। কেমন করে তেমন নাটক লিখতে পারবো? ভদ্রলোক বললেন পড়ো। তুমি গ্রীক নাটক পড়েছো? —ইসকিলাস পড়েছো? পড়েছো সফোক্লিসের নাটক? পড়েছো ইউরিপিডিস, সেনেকা, টেরেন্স, প্লটাস, এরিস্টোফিনিস? তার সঙ্গে পড়তে হবে সেক্সপীয়র, লোপ-ডি-ভেগা, রেসিন, কর্নেই, মলিয়ের, ভলতেয়র, বোমার্শে, সীলার, গেটে। সবচেয়ে বেশী করে পড়ো অধুনাকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যসম্পদ। কিন্তু কাব্য পড়তে ভুলো না—হোমার, ভার্জিল, দান্তে, তাসো, সারভান্তে, মিল্টন। তার সঙ্গে পড়ো বিলুপ্ত ইতিহাস, বিচিত্র দর্শন, আশ্চর্য বিজ্ঞান।

আরো পড়তে হবে। ভদ্রলোক হঠাৎ চুপ করলেন। ছেলেটার মুখ সাদা হয়ে উঠেছে, বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে নামগুলো। ছেলেটা নীচু গলায় বললো এত পড়লে লিখবো কখন ? ভদ্রলোক বল্লেন, মনের সোনার কলম যখন ছাপিয়ে উঠবে, তখন আপনি তোমার লেখা নামবে উপছিয়ে, ধরে রাখতে পারবে না। লিখে থই পাবে না। ভালো নাটক লিখবে। শুভরাত্রি, চলি।

ছেলেটা আলেকজাণ্ডার দুমা যার নাটক পরবর্তীকালে ফরাসী দেশের লোক দেখবার জন্ম পাগল হয়ে উঠত। ভদ্রলোকের নাম চার্লস নোদিয়ের—তৎকালীন ফরাসী সাহিত্যের নতুনধারা'র রোমান্টিক আন্দোলনের—নেতা।

★ ★ ★

আজ আড়াইশ বছর পরে আমরা আবার এ শহরে বসে ভাবছি সত্যিই তো ভালো নাটক লেখা হচ্ছে না কেন ?

টেনেসি উইলিয়ম্‌স্

॥ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সেদিন ম্যারিলিন মনরোর মৃত্যুসংবাদ শুনে হঠাৎ মনে হ'য়েছিল, এ যেন টেনেসি উইলিয়ম্‌স্-এর কোন নায়িকা, তেতে ওঠা টিনের ছাদের উপর ঝুঁজে বেড়াল। স্বর্ণমানবের মার্কিনী রাজ্যে যন্ত্রের কঠিন শাসনে সুস্থ প্রাণচেতনার অপমৃত্যুতে স্বভাবতই ভাঙা মানুষ তথা নিউরটিকদের আবির্ভাব। নিউরসিসের নৈঃসঙ্গ্য—যন্ত্রণাবিদ্ধ কবিতার আর্তনাদে (উইলিয়ম্‌স্ বলেন, "পার্সোনাল লিরিসিজম্") সেই নৈঃসঙ্গ্যকে স্পর্শবেদ্য ক'রে তোলা যায়। এবং সে আর্তনাদ নিতান্তই আর্তনাদ, শুধু কণ্ঠনিঃসৃত নয় সর্বদেহের আর্তনাদ, সর্বসত্তার আর্তনাদ। থিয়েটারের প্রশ্ন তুললে, বুঝতে কষ্ট নেই যে, হিস্টিরিকাল ও আপাত-উদাসীন (ব'লতে পারেন "ট্রান্স্"-সদৃশ) অভিনয়ের বৈচিত্র্যরচনায় নিউরসিসের মর্মস্পর্শক অভিব্যক্তি আশ্চর্য বেদনাবহ হ'য়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, উইলিয়ম্‌স্ মঞ্চমায়ার কাছের লোক ; এলিয়া কাজানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাঁর কার্পণ্য বা কুণ্ঠা নেই। উইলিয়ম্‌সের নাটকে স্বভাবতই নাটকীয়তার অভাব নেই।

"একদা অসুস্থ লাজুকতার জ্বালায় মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রচনা ক'রতে পারতাম না ; সেই কারণেই বোধ হয় গল্প-নাটক লিখতে আরম্ভ ক'রেছিলাম। আজ সেই জিভ-বাঁধা-পড়া, মুখ-লাল-হ'য়ে-ওঠা, নীরব নতমস্তক ভয় কেটে গেছে ....., তবু আজও কেন জানি থিয়েটারের অর্কেস্ট্রা ও ব্যালকনি অংশের নীরব গোধূলিতে অপরিচিতদের ভিড়ের সঙ্গে এক হ'য়ে যেতে যত সহজ লাগে, টেবিলে ব'সে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ ততটা সহজ লাগে না।" ["ক্যাট্ অন্ এ হট্ টিন্ রুফ্": মুখবন্ধ।]। অর্থাৎ, দর্শকজনমণ্ডলীর চেতনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের সঙ্কল্পেই টেনেসি উইলিয়ম্‌স্-এর নাট্যরচনা। দর্শকমনকে টেনে রাখতে হবে ব'লেই প্রথম থেকে শেষ অবধি টেন্‌শন, কাহিনীর মধ্যপথে যবনিকা উত্তোলন (যাতে পূর্বাপর বৃত্তান্তের স্বাভাবিক কৌতূহল দর্শকের মনে জন্ম করে), এবং প্রায় সর্বদাই নাটকের প্রায় সবটাই উঁচু তারে বাঁধা।

আবেগের কাছে আত্মসমর্পণে আরো দ্বিধারহিত ব'লেই উইলিয়ম্‌সের নাটকে নারীদের প্রাধান্য। কিন্তু এই নারীদের উপস্থাপনেও "গ্লাস মেনাজেরি"-র পরবর্তী নাটকে লক্ষণীয় রীতিপরিবর্তন ঘ'টেছে। জন্ম থেকেই লরা উইংফিল্ডের একটি পা ঈষৎ পঙ্গু। দৈহিক এই বিকলতা থেকে যে হীনমন্যতা (সিঁড়ির উপর পায়ের ব্রেস্-এর আওয়াজটা মনে হ'ত যেন "বজ্রের গর্জন"—এবং সেইহেতু লজ্জা), সেই হীনমন্যতাই লরাকে নৈঃসঙ্গ্যে নির্বাসিত ক'রেছে। জিম এসে সেই নৈঃসঙ্গ্যকে ভেঙে দেয়, কিন্তু

নৈঃসঙ্গ্য থেকে সে-মুক্তি নিতান্তই সাময়িক ; কারণ, জিম যাবার আগে ব'লে যায়, "আমি বেটির সঙ্গে বেরোই"—জিম আর আসবে না। পঙ্গু দেহ, ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের পুতুলের প্রতি আসক্তি, এককলি গানের সুর, এবং শেষে আশাভঙ্গ (তাও যেন প্রায় ভবিতব্য, কারণ জিম নির্দোষ)—সব মিলিয়ে এই চরম সেন্টিমেন্ট্যালিটির জোরেই লরা দর্শকজনের সহানুভূতি ধরে রাখে। তাছাড়াও, নাটকের বাঁধা সুর নস্ট্যালজিয়া (সিসিল ডে লিউইস্ একদা এই অনুভূতিটিকে বর্ণনা ক'রেছিলেন, "অনুভূতিকুলে বিবর্ণ ইন্‌ভ্যালিড")—টমের স্মৃতিমন্থনে পুরনো দিন ছেড়ে আসার ব্যথা যেন লেগেই আছে। এই সার্বিক সেন্টিমেন্ট্যালিটিকে বজায় রেখেও একে ঈষৎ ভেঙে দেবার জন্যেই কিছুটা যান্ত্রিকতার বা প্রয়োগকৌশলের সোচ্চার ব্যবহার—পর্দার উপর ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ স্লাইড ফেলে দৃশ্যবিশেষের অর্থব্যাখ্যান, হয় কথায় নয় ছবিতে। প্রয়োগকলায় বাস্তবতাকে কিঞ্চিৎমাত্র আহত ক'রে দর্শককে কিছুটা সরিয়ে দিয়ে তার দৃষ্টিকে অব্‌জেক্টিভ্ ক'রে তোলা—এতদুদ্দেশ্যেই ঐ প্রয়োগকৌশলের অবতারণা।

পরবর্তী নাটক "স্ট্রীট কার নেম্‌ড্ ডিজায়ার"—এ নারীচরিত্র জটিলতর হ'য়ে উঠেছে। শুরুতে ব্লান্‌শ্-এর প্রতি বিদ্বেষই জ'মে ওঠে—হঠাৎ উড়ে এসে সে যেন স্টেলা-স্ট্যানলির সুখের দ্বৈত জীবনে ভাঙন ধরাতে আসে। অন্তঃসত্ত্বা স্টেলাকে দেখে মনে হয়, এ জীবনে কিছু অপূর্ণ নেই, আর ব্লান্‌শ্ ই যেন বিবাদী সুর। স্বাতন্ত্র্যের মোহে সে সবার উপরে উঠে দাঁড়াতে চায়। সেই চেষ্টাতেই তার প্রতিবেশীরা দূরে স'রে যায়, ব্লান্‌শের নৈঃসঙ্গ্য আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে। কিছুক্ষণ কাটতেই দেখা যায়, আভিজাত্যের দম্ভের ঠিক পেছনেই, আলোর পেছনে ছায়ার মত, ব্লান্‌শের অসহায়তা, যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে প্রেম ও আশ্রয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা। স্ট্যানলি তার উপর শোধ নিতে শুরু করে—তার অতীতকে পুনরাবিষ্কার করে, মিচ্‌কে সরিয়ে দেয়, শেষে ব্লান্‌শ্‌কে ধর্ষণ করে, পাগল ব'লে ধরিয়ে দেয়। পরাজিতার অসহায়তায় ব্লান্‌শ্ দর্শকজনের সহানুভূতি আকর্ষণ করে—প্রথম বিদ্বেষ অনুশোচনা হ'য়ে দাঁড়ায়, সহানুভূতির সঙ্গে মিশে যায়।

একটি চরিত্রের আস্বাদকে এইভাবে নাটকের মধ্যেই ব'দলে দেওয়া, শুরুর বিদ্বেষকে ক্রমে ক্রমে ভেঙে সহানুভূতিতে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়া—এ-রীতি "রোজ ট্যাটু"-তেও স্পষ্ট। শুরুতে যাকে মনে হয় দজ্জাল (পাছে জ্যাকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, সেই আশঙ্কায় সেরাফিণা কন্যা রোজার জামাকাপড় লুকিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে তাকে উলঙ্গ করে রেখে দেয়), পরে ক্রমেই দেখি, সে কত দুর্বল। প্রথমে প্রতিবেশিনীদের আক্রমণ, তারপর রোজার বিদায় ও গৃহত্যাগ, তারপর বেসি ও ফ্লোরার কথায় মৃত স্বামীর প্রেমের নেশাহে সহসা অনিশ্চয়, শেষে আলভারোর মোহ ও মোহভঙ্গ—একের পর এক পর্যায়ে অসহায়তার প্রতিষ্ঠা, এবং অসহায়তায় সহানুভূতি। এ বছরের নতুন নাটকে ("দি মিল্ক্ ট্রেন্ ডাজ্‌ন্ট্ স্টপ্ হিয়ার") ষষ্টিবর্ষীয়া সিসি গোফর্থ (নামটাও লক্ষণীয়, "সিসি" নামে মেয়েলি ন্যাকামি তথা মেয়েলিপনা, "গোফর্থ" অর্থাৎ "এগিয়ে যাও") যোড়শীর মতই শাদা আঁটি প্যান্টস্ পরেন, হাই-হীল পরেন। বৃদ্ধার প্রেম-প্রার্থনায় (সিসি শেষ পর্যন্ত এক সুদর্শন তরুণের কাছে বিবসনা হ'য়ে জিজ্ঞেস করেন, "দেখতে পাও না, কী

সৃজন ও মূল্যায়ন : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

॥ অগ্নিমিত্র ॥

॥ এক ॥

ইদানীং কয়েকবছর যাবৎ নবনাট্য ব্যাপারটা নিয়ে গোটা দেশে এমন একটা হৈ চৈ কাণ্ড সুরু হয়ে গেছে যেন হঠাৎ মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝাপটায় মুখ-থুবড়ে-পড়া সমাজ সংস্কৃতি আর সাহিত্য একেবারে রাতারাতি ওই নবনাট্যের রথ পায়ে ভর দিয়ে রীতিমতো ম্যারাথন দৌড় সুরু করে দিয়েছে। প্রগতির এমন একটা মওকা কোন্ বুদ্ধিমান হাত ছেড়ে দেয়? আমরাও ছাড়িনি।

প্রথমে সুরু হয়েছিলো বেসরকারী উদ্যোগে। কিছুকাল পরেই এলো সরকারী প্রচেষ্টা আর পিঠচাপড়ানি। সব মিলে সারা দেশটাই হয়ে উঠল এক নাট্যশালা। এবারে এগিয়ে এলেন বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ। মানানসই অ্যাকাডেমিক কায়দায় নবনাট্যের যুগবিভাগ হয়ে গেল। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ের শেষে যুক্ত হল নতুন অধ্যায়টি 'নবনাট্য আন্দোলন'। কে সার্থক, কে ব্যর্থ, কে আধা-সার্থক, কে বহু-সার্থক তারও খতিয়ান এরই মধ্যে প্রায় শেষ। নাট্য-ধর্ম, রীতি-বৈচিত্র্য, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিব্য বাণী (যার অধিকাংশই বাস্তবে কার্যকরী হবে না বলে সন্দেহ করি) সব কিছুই হ'ল। মোটামুটি একটা ভাবনারা-বলয়-রেখা আলোচনা-রীতিও গড়ে উঠল। মোটের ওপর বেশ চ'লে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেউ কেউ ক্ষেপে উঠে হুংকার ছাড়লেন, 'পক্ষীরাজ যদি হবে তো লেজ নেই কেন?' কেউবা আবার সখেদে প্রশ্ন তুললেন, সবইতো দেখছি সেই দিশী কুক্কুর পক্ষরাজ কিম্বা যুঁই বেল। ওক উঠলো কই? চেরীগুচ্ছ কই? আহা, আমাদের বাপ্পা অঞ্চলে অমন ফলন্ত জমিতে চিরকাল সেই ধানের চাষই হবে? আঙ্গুর চাষ হবে না? অন্ত আর একদল সরাসরি ঘোষণা করলেন, নাটক অভিনয়ে আঙ্গিকের অত বাড়াবাড়ি চলবে না। এদিকে যে বেচারাগণ রাতের নিদ্রা ঘুচিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আধপেটা খেয়েও নিছক নিষ্ঠার জোরে সত্যিকারের একটা কিছু ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন তাঁরা কেউ বা সকুণ্ঠভাবে, কেউবা সংশয় নিয়ে প্রশ্ন করলেন আপনারা কোন্ রকমটি চান? যাঁদের কাছে উত্তর চাওয়া হ'ল তাঁদের অনেকেই ফ্যাসাদে পড়লেন। সত্যিই তো, ঠিক কোন্ রকমটি হ'লে ত্রুটিহীন মনের মতন নাটক হয়, প্রযোজনা কোন্ পর্যায়ে গেলে নিখুঁৎ হয়—এ সব তো ভেবে দেখা হয়নি! তবে হ্যাঁ এটুকু তাঁরা বলতে পারলেন যে, নীলদর্পণ নাটক খানা হ্যামলেটের মতো 'যথার্থ ট্র্যাজেডি' হয়নি, গিরিশ ঘোষ মশায়ের পাল্লা-দিশিরে (কারও কারও মতে আবার শেক্সপীয়রের পিতামহ-তুল্য), রবিঠাকুরের সাংকেতিক নাটক গুলো ভোঁতা এবং অনন্য-সাধারণ সৃষ্টি (এ কথা বলার ঝুঁকি নেই

বললেই চলে, কারণ রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন), ডি. এল, রায় ব্যর্থ নাট্যকার ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু প্রবীণ যাঁরা, তাঁরা শেষ পর্যন্ত যা বললেন তার নির্গলিতার্থ, বাপুহে পশ্চিম যা ক'রছে তাই করলেই বোধ হয় উৎরে যাবে। কখনো গ্রীক, কখনো এলিজাবেথীয়, কখনো নরওয়েজীয় ভদ্রলোকদের 'কপি' করে যাও, ব্যাস্। নবীন পন্থী সমালোচকেরা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। প্রশ্নটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনেট মিনিস্টারের মতো সময় নিলেন ক'দিন। তারপর পশ্চিমের বনেদী কাগজের লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট (কারণ যে লোকটার প্রথম নাটক সবে প্রকাশিত হয়েছে তার নামটাও পাওয়া যাবে) এবং হালফিল নাট্যসাহিত্যের ক্যাটালগ ঘেঁটে দু'চার ডজন নতুন নতুন নামের লিষ্টি ছুড়ে দিয়ে বললেন, এদের মতো লিখবে, বোঝেচ হে ?

আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলিষ্ঠ নির্দেশ দিতে পারলেন কি কেউ ? তা তো মনে হয় না।

এ পর্যন্ত হলেও বা কথা ছিল। সমস্যা যে আরও জটিল। নবনাট্যের অষ্টপ্রহর মোচ্ছবে অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন নেই। যে যা পা'রছে লিখছে। যে যা পাচ্ছে অভিনয় করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সামাজিক সমস্যার অভাব নেই। সেই সমস্যাগুলিকে নাটকে রূপায়িত করবার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে শুধু বহিরঙ্গের কয়েকটি নির্দিষ্ট ছক মনে মনে গেঁথে নিয়েছেন। কখনো অক্ষমতা, কখনো বা আশু খ্যাতির লোভ তার বড় কারণ। তার ভেতর থেকে আর একদল 'নাইট ক্লাব' 'ক্যাবারে', হোটেল ইত্যাদি থেকে উত্তেজক বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে দু'কলম লিখেই ঝটপট প্রগতিবাদী সেজে বসেছেন। যে কোনো সভ্য সমাজে দু'মুঠো অন্নের জন্যে নারীসম্প্রদায়ের একজনেরও দেহ-বিক্রয় সে সমাজের চরমতম কলঙ্ক, মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য। তাকে অবলম্বন করে কথাসাহিত্য আর নাট্যসাহিত্যে রচনার ছড়াছড়ি। জাতির এতবড়ো দুর্ভাগ্য, মানবতার এই মর্মান্তিক অবমাননা আমাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। বরঞ্চ এই উত্তেজক বিষয়বস্তুকে পেয়ে আমরা মনে মনে উৎফুল্ল। আমাদের মানবতাবোধ নিঃশেষ প্রায়, আমরা নিঃস্ব।

আমি জানি, উপরে যে কথাগুলি বলা হ'ল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মতো কিছু নজীর আছে আমাদের সাহিত্যে। যাঁরা মানবতার এ বেদনায় বিচলিত বিক্ষুব্ধ, যাঁরা অবক্ষয়ের এই বিভীষিকাময় ছবি আঁকতে বসে নিজেও চোখের জল ফেলেছেন তাঁরা নমস্য। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কত? আর যাঁরা 'ভেনাসের গলিত শবদেহের' পাশ থেকে পচাই মদের বোতল তুলে নিয়ে অন্ধ অবসন্ন উত্তেজিত-স্নায়ু মানুষগুলোকে সেই বস্তু উপহার দেবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা কত? আর মাতালকে আরও মাতাল করে তুলে কিছু লুটে নেবার ফিকিরে সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করেছেন যাঁরা খিড়কী দরজা দিয়ে তাঁদের কী বলব? অমিত কবিত্ব শক্তির অধিকারী জয়দেব গোস্বামী। সেন রাজত্বের অপরাহ্নে বিকৃত বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য রুচির খোরাক তাঁকেও জোগাতে হয়েছে। কামকলার সার্বাঙ্গিক বর্ণনা দিয়ে সর্বশেষে বারকতক মুরারীর নামে হরিধ্বনি দিয়ে সিভিশন বাঁচিয়েছেন মাত্র। একালের পাঠক তো দেখছেন, একদিন যাঁরা মানবতার জয়ধ্বনি তুলে সাহিত্যের খাস দরবারে ঢুকে শ্রদ্ধার আসনটি পেয়েছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ সেই আসনটি আঁকড়ে রাখবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় নগরীর নৈশ

সৃজন ও মূল্যায়ন : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

॥ অগ্নিমিত্র ॥

॥ এক ॥

ইদানীং কয়েকবছর যাবৎ নবনাট্য ব্যাপারটা নিয়ে গোটা দেশে এমন একটা হৈ চৈ কাণ্ড সুরু হয়ে গেছে যেন হঠাৎ মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাপটায় মুখ-থুবড়ে-পড়া সমাজ সংস্কৃতি আর সাহিত্য একেবারে রাতারাতি ওই নবনাট্যের রণ পায়ে ভর দিয়ে রীতিমতো ম্যারাথন দৌড় সুরু করে দিয়েছে। প্রগতির এমন একটা মওকা কোন্ বুদ্ধিমান হাত ছেড়ে দেয়? আমরাও ছাড়িনি।

প্রথমে শুরু হয়েছিলো বেসরকারী উদ্যোগে। কিছুকাল পরেই এলো সরকারী প্রচেষ্টা আর পিঠচাপড়ানি। সব মিলে সারা দেশটাই হয়ে উঠল এক নাট্যশালা। এবারে এগিয়ে এলেন বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ। যানানসই অ্যাকাডেমিক কায়দায় নবনাট্যের যুগবিভাগ হয়ে গেল। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস বইয়ের শেষে যুক্ত হল নতুন অধ্যায়টি 'নবনাট্য আন্দোলন'। কে সার্থক, কে ব্যর্থ, কে আধা-সার্থক, কে হবু-সার্থক তারও খতিয়ান এরই মধ্যে প্রায় শেষ। নাট্য-ধর্ম, রীতি-বৈচিত্র্য, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিব্য বাণী (যার অধিকাংশই বাস্তবে কার্যকরী হবে না বলে সন্দেহ করি) সব কিছুই হ'ল। মোটামুটি একটা ভারসাম্য-বজায়-রাখা আলোচনা-রীতিও গড়ে উঠল। মোটের ওপর বেশ চ'লে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেউ কেউ ক্ষেপে উঠে হুংকার ছাড়লেন, 'পক্ষীরাজ যদি হবে তো ল্যাজ নেই কেন?' কেউবা আবার সখেদে প্রশ্ন তুললেন, সবইতো দেখছি সেই দিশী কুক্কুরক গন্ধরাজ কিম্বা যুঁই বেল। ওক উইলো কই? চেরীগুচ্ছ কই! আহা, আমাদের বাদা অঞ্চলে অমন মনোরম জমিতে চিরকাল সেই ধানের চাষই হবে? দ্রাক্ষার চাষ হবে না? অন্ত আর একদল সরাসরি ঘোষণা করলেন, নাটক অভিনয়ে আঙ্গিকের অত বাড়াবাড়ি চলবে না। এদিকে যে বেচারাগণ রাতের নিদ্রা ঘুচিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আধপেটা খেয়েও নিছক নিষ্ঠার জোরে সত্যিকারের একটা কিছু ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন তাঁরা কেউ বা সকুণ্ঠভাবে, কেউবা সংশয় নিয়ে প্রশ্ন করলেন আপনারা কোন্ রকমটি চান? যাঁদের কাছে উত্তর চাওয়া হ'ল তাঁদের অনেকেই ফ্যাসাদে পড়লেন। সত্যিই তো, ঠিক কোন্ রকমটি হ'লে ত্রুটিহীন রূপসন নাটক হয়, প্রযোজনা কোন্ পর্যায়ে গেলে নিখুঁৎ হয়—এ সব তো ভেবে দেখা হয়নি! তবে হ্যাঁ এটুকু তাঁরা বলতে পারলেন যে, নীলদর্পণ নাটক খানা হ্যামলেটের মতো 'যথার্থ ট্র্যাজেডি' হয়নি, গিরিশ ঘোষ যাত্রার পালা-লিখিয়ে (কারও কারও মতে আবার শেক্সপীয়রের পিতামহ-তুল্য), রবিঠাকুরের সাংকেতিক নাটক গুলো ভোঁতা এবং অনন্য-সাধারণ সৃষ্টি (এ কথা বলার ঝুঁকি নেই

বললেই চলে, কারণ রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন), ডি. এল. রায় ব্যর্থ নাট্যকার ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু প্রবীণ যাঁরা, তাঁরা শেষ পর্যন্ত যা বললেন তার নির্গলিতার্থ, বাপুহে পশ্চিম যা ক'রছে তাই করলেই বোধ হয় উৎরে যাবে। কখনো গ্রীক, কখনো এলিজাবেথীয়, কখনো নরওয়েজীয় ভদ্রলোকদের 'কপি' করে যাও, ব্যাস্। নবীন পন্থী সমালোচকেরা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। প্রশ্নটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনেট মিনিষ্টারের মতো সময় নিলেন ক'দিন। তারপর পশ্চিমের বনেদী কাগজের লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট (কারণ যে লোকটার প্রথম নাটক সবে প্রকাশিত হয়েছে তারও নামটাও পাওয়া যাবে) এবং হালফিল নাট্যসাহিত্যের ক্যাটালগ ঘেঁটে দু'চার ডজন নতুন নতুন নামের লিষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এদের মতো লিখবে, বোঝেচ হে ?

আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলিষ্ঠ নির্দেশ দিতে পারলেন কি কেউ ? তা তো মনে হয় না।

এ পর্যন্ত হলেও বা কথা ছিল। সমস্যা যে আরও জটিল। নবনাট্যের অষ্টপ্রহর মোচ্ছবে অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন নেই। যে যা পারছে লিখছে। যে যা পাচ্ছে অভিনয় করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সামাজিক সমস্যার অভাব নেই। সেই সমস্যাগুলিকে নাটকে রূপায়িত করবার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে শুধু বহিরঙ্গের কয়েকটি নির্দিষ্ট ছক মনে মনে গেঁথে নিয়েছেন। কখনো অক্ষমতা, কখনো বা আশু খ্যাতির লোভ তার মূল কারণ। তার ভেতর থেকে আর একদল 'নাইট ক্লাব' 'ক্যাবারে', হোটেল ইত্যাদি থেকে উত্তেজক বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে দু'কলম লিখেই ঝটপট প্রগতিবাদী সেজে বসেছেন। যে কোনো সভ্য সমাজে দু'মুঠো অন্নের জন্যে নারীসম্প্রদায়ের একজনেরও দেহ-বিক্রয় সে সমাজের চরমতম কলঙ্ক, মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য। তাকে অবলম্বন করে কথাসাহিত্য আর নাট্যসাহিত্যে রচনার হুড়োহুড়ি। জাতির এতবড়ো দুর্ভাগ্য, মানবতার এই মর্মান্তিক অবমাননা আমাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। বরঞ্চ এই উত্তেজক বিষয়বস্তুকে পেয়ে আমরা মনে মনে উৎফুল্ল। আমাদের মানবতাবোধ নিঃশেষ প্রায়, আমরা নিঃস্ব।

আমি জানি, উপরে যে কথাগুলি বলা হ'ল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মতো কিছু নজীর আছে আমাদের সাহিত্যে। যাঁরা মানবতার এ বেদনায় বিচলিত বিক্ষুব্ধ, যাঁরা অবক্ষয়ের এই বিভীষিকাময় ছবি আঁকতে বসে নিজেও চোখের জল ফেলেছেন তাঁরা নমস্য। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কত ? আর যাঁরা 'ভেনাসের গলিত শবদেহের' পাশ থেকে পচাই মদের বোতল তুলে নিয়ে অন্ধ অবসন্ন উত্তেজিত-স্নায়ু মানুষগুলোকে সেই মদ উপহার দেবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা কত ? আর মাতালকে আরও মাতাল করে তুলে কিছু লুটে নেবার ফিকিরে সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করেছেন যাঁরা খিড়কী দরজা দিয়ে তাঁদের কী বলব ? অমিত কবিত্ব শক্তির অধিকারী জয়দেব গোস্বামী। সেন রাজবংশের অপরাহ্নে বিকৃত বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য রুচির খোরাক তাঁকেও যোগাতে হয়েছে। কামকলার সার্বাঙ্গিক বর্ণনা দিয়ে সর্বশেষে দায়কতক মুরারীর নামে হরিধ্বনি দিয়ে সিভিলন বাঁচিয়েছেন মাত্র। একালের পাঠক তো দেখছেন, একদিন যাঁরা মানবতার জয়ধ্বনি তুলে সাহিত্যের খাস দরবারে ঢুকে শ্রদ্ধার আসনটি পেয়েছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ সেই আসনটি আঁকড়ে রাখবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় নগরীর নৈশ

জীবন থেকে পচাই মদ এনে আকণ্ঠ পান করাচ্ছেন নির্বিচারে। হাতে বহুল প্রচারিত প্রভাবশালী পত্র পত্রিকা। থাকার দত্তে কেউ কেউ শক্তিমান প্রতিষ্ঠিতসম্পন্ন তরুণ আগন্তুককে সেই তত্ত্বেই বিশ্বাস অর্পণ করতে বাধ্য করেছেন, যে তত্ত্বে কেবলমাত্র অবাধ যৌন বিকৃতির মধ্যেই জীবন এবং সাহিত্যের পরম চরিতার্থতা। তরুণ আগন্তুকেরা সেই তত্ত্ব-বিশ্বাসের পাণ্ডা-প্রণামী দিয়েই ভেতরে আসবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করছে। তারপর ওইটিকেই সাধ্যতত্ত্ব ক'রে গুরুদক্ষিণা পুরোপুরি উশুল করে দিচ্ছে। সুস্থ জীবন যাপন ক'রতে যেটুকু রুচি, পবিত্রিতবোধ এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন, হয়তো তা থেকে এই হতভাগ্যেরা বঞ্চিত (এঁদের পঙ্কু আত্মার সদ্গতি হোক !)।

নাটক প্রসঙ্গে কথা সুরু ক'রে আলোচনাকে এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু যেহেতু সমকালীন নাট্য-সাহিত্য এবং কথাসাহিত্যের মানস-পটভূমি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সেইহেতু এ প্রসঙ্গেরও প্রয়োজন, নয়তো বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

॥ দুই ॥

কথাসাহিত্যে এবং কাব্যসাহিত্যের একটা দিকে যখন উপরোক্ত সমাজবিরোধী লেখকদের হস্তাবলেপে রীতিমতো পচন ক্রিয়া সুরু হয়েছে, তখন তা নাট্য সাহিত্যে কতখানি ক্রিয়াশীল হয়েছে অথবা আদৌ ক্রিয়া সুরু হয়েছে কিনা ? আমার মনে হয়, বিক্ষিপ্ত দু'চারটি উদাহরণ ছাড়া ওরকম দল বেঁধে সর্বনাশ করবার রোমাঞ্চকর ইন্দ্রিয়-বাসনা এখনো দেখা দেয়নি। তবে দেখা দিতে পারে। সর্বাত্মক যৌনব্যাপ্তির প্রবক্তারা হঠাৎ যদি ওঁদের বক্তব্যকে গল্প উপন্যাসের বদলে নাটকের মাধ্যমেই বলবার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করেন তাহ'লে সে দুর্দিন আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই চরম হয়ে দেখা দেবে। তারই কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অবশ্য দেখা গেছে। সংঘবদ্ধভাবে উল্লিখিত প্রচেষ্টা যে এখনো সুরু হয়নি তার পেছনে একটা বড়ো কারণ আছে। বরাবর শুনে আসা গেছে, আমাদের নাটক বড়ো দুর্বল। এই একটি কথাই নবাগত নাট্যকারদের মনের ওপর একটা অভাববোধের চেতনা এনে দিয়েছে। যার ফলে, ভালো কিছু সৃষ্টির তাগিদ তাদের এখনো মরে যায়নি। কিন্তু সে ভালো রচনার মানদণ্ড কী ? এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। এখনো দেখা যায়, যে বিশেষজ্ঞ গ্রীক আর এলিজাবেথীয় নাটক ছাড়া (বড় জোর ইবসেন পর্যন্ত) আর কিছুকেই নাটক বলে মনে করেন না, তিনিই হঠাৎ হয়তো স্নেহভাজন কোনো ভাগ্যবানের লেখা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর নাটককে নিয়ে এমন হৈ চৈ সুরু করে দিলেন যে সাধারণ পাঠক বা দর্শক রীতিমতো বিভ্রান্ত। সাধারণ মানুষের মহল থেকে প্রশ্ন আসবে, নাটক সমালোচনার যথার্থ মানদণ্ড কী ? প্রশ্নকর্তা সে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাবেন না। কারণ সত্যিই কোনো মানদণ্ড নেই। সমালোচক নাট্যকারকে একহাত নিচ্ছেন, নাট্যকার প্রযোজককে। প্রযোজক দর্শককে এবং দর্শক সমালোচককে। সকলেই আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যাকুল। এর ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়াল, এককথায় তাকে বলা যায় 'হাইড পার্ক।' সমালোচকের তাড়া খেয়ে প্রতিকারী নতুন নাট্যকার প্রাণপণে চেষ্টা করতে

লাগলেন বিলিতি সাহিত্যের ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট থেকে কিছু জোগাড় ক'রে সমালোচকের পুষ্ঠপোষকতা পেয়ে। মৌলিক নাট্যকার হবার জন্যে। কেউ বা বুদ্ধি ক'রে দিশী সমাজ থেকেই এমন উপাদান হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন যা স্বাভাবিক নয়, ব্যতিক্রম। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রয়োজন। কিন্তু বৈচিত্র্যই শুধু যদি মৌলিকতার পরীক্ষা পাশ করার একমাত্র উপাদান হয়ে ওঠে তাহলে রস এবং শিল্পসৃষ্টির দিকে নজর কমতে বাধ্য। নাট্যকারের মুখ তার দেখে প্রযোজকও ছুটলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানে। দর্শক গালাগালি ক'রে ফিরে গেল। ওদিকে সমালোচক রাত জেগে কন্টিনেন্টের তাবৎ দেশের বাঘা বাঘা নাট্যবিদ আর সমালোচকের বক্তব্য ইংরিজি অনুবাদ মারফৎ সংগ্রহ করে জাঁদরেল সব প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। অমুক ইতালীয় নাট্যবিদ বলেছেন বা অমুক জর্মন পণ্ডিত মনে করেন কিম্বা অমুক রুশ প্রযোজক লিখেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তব্যের সংগ্রহ ইংরিজি অনুবাদের মারফৎ। প্রবন্ধটি বাঙলায় লেখা হলেও তার নৈকষ্য কৌলিন্য বজায় রাখতে হরবখত ইংরিজি উদ্ধৃতি অপরিহার্য। তাই বাঙালী প্রবন্ধকারের রচনার মধ্যে কিবা জর্মন, কিবা ফরাসি, কিবা রুশ পণ্ডিতের মন্তব্য—বাঙলায় অনূদিত হয় কদাপি। আমাদের সমালোচকের প্রবন্ধ বা বইএর পাতায় ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই (তিনি যদি ইংরেজী-ভাষী না-ও হন তবুও) বক্তব্য এইভাবে কেবল ইংরেজী মারফৎ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা বার বার আমাদের মানসিক দৈন্যকে প্রকট করে তোলে।

সে যাই হ'ক, মোটামুটি পাঁচজন পণ্ডিত ব্যক্তির বক্তব্য তো পাওয়া গেল। কিন্তু মূল প্রবন্ধকারের বক্তব্য কী? সেটা ঠিক স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। যদিও বা একটু আভাসে ইংগিত থাকে তাও নিতান্ত ভেগু ভেগু (Vague)।

নবনাট্যের বর্তমান পর্যায়টা মোটের ওপর যা দাঁড়িয়েছে তা অনেকটা এইরকমই। তবু ব্যতিক্রম কিছু আছে অবশ্যই। তা যদি না থাকত তাহলে পেশাদারী মঞ্চের তীক্ষ্ণবুদ্ধি মালিক বা প্রযোজকদের কেউ কেউ যেভাবে সহাবস্থানের আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন সেটা হয়তো হ'ত না।

তা সত্ত্বেও নবনাট্যকে কেন্দ্র করে 'আন্দোলন' শব্দটার ওপর যাঁরা খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে একমত না হতে পারার জন্যে আমি দুঃখিত। আন্দোলন, তা সে সমাজের যে কোনো অংশেই ঘটুক, তার মধ্যে সন্নিহিত কর্মসূচীর একটা নির্দিষ্ট আদর্শ থাকে। আন্দোলনে অংশগ্রাহী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের চেয়েও ঢের বেশী প্রয়োজনীয় আত্মিক এবং আদর্শগত সমধর্মিতা। তা এই আন্দোলনে আছে কি? আমার তো মনে হয়, বরঞ্চ তার উলটো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নাট্যকার, প্রযোজক এবং কয়েকটি সম্প্রদায় ব্যতীত বাদবাকী অংশগ্রাহীদের মধ্যে যে মনোভাবটি সবচেয়ে বেশী প্রকট বলে আমার মনে হয়েছে তা হ'ল অকর্ষিত বা অল্পকর্ষিত এবং সহজে এড়িয়ে-যাওয়া এক নতুন ভূমিখণ্ডে এসে অচিরে সৌভাগ্যবান হওয়ার বাসনা। এ মনোভাবটা ক্ষতিকারক নয়। বরঞ্চ নতুন নতুন প্রতিভা বিকাশের একটা ক্ষেত্র থাকা ভালো। অবহেলিত নাটক-শাখা তাতে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পরিণতিটা কী হচ্ছে? আগন্তুকেরা যে যাঁর নিজের

কর্মসূচী এবং চিন্তাপ্রণালীকেই আন্দোলনের মুখ্য হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ঈর্ষা আর বিদ্বেষ দানা বাঁধছে বিচ্ছিন্নভাবে। 'কখনো বা মধ্যযুগীয় 'সভাকবি প্রথা' নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করছে। বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছেন উদীয়মান নাট্যকারদের কেউ কেউ। কিছু বিটোয়, কিছু স্তোকবাক্য আর কিছু প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে স্রষ্টা আর সমালোচকের এক করুণ আত্মবিক্রয় ঘটছে হামেশা।' তার চেয়েও বড়ো বিপদ তাদের নিয়ে, যারা সংহত চিন্তাধারার অধিকারী নয়। নাট্য আন্দোলনের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে তারা এসেছে নয়া কিসিমের আমোদ ফুর্তির লোভে। নবনাট্য আন্দোলন নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না। অভিনয় করা এবং সেই উপলক্ষে ফুর্তি করাটাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরা নির্বাচন করে বহু-নারীচরিত্র-বিশিষ্ট নাটক। সুবিধেমতো তেমন না পেলে ফরমায়েশ করে দলের কাউকে দিয়ে দরকারমাফিক নাটক লিখিয়ে নেয়। নামাবলীটা কিন্তু গা থেকে নামায় না। বেচে বলে, নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি।

সব কিছু মিলিয়ে এই যে পরিস্থিতি এর মধ্যে আন্দোলনের সংহত রূপটি কোথায়? মুষ্টিমেয় সার্থক-প্রচেষ্টার সঙ্গে সবটা জুড়ে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রকে আমরা যতই প্রসারিত এবং পরিব্যাপ্ত বলে ভাবি না কেন, আসলে সে আমাদের মনগড়া আত্মতুষ্টি।

॥ তিন ॥

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক।

আমাদের শিল্প সাহিত্যে সৃজন ও মূল্যায়নের পেছনে বহুকাল ধরে যে মনোধর্ম কাজ করে আসছে তার যথার্থ রূপটা কী? এই রূপ বিচারের সূচনা উনবিংশ শতাব্দী থেকে হলেই ভালো হত। তথাকথিত এবং বহু ঘোষিত রেনেসাঁস নামক পর্ব থেকে সুরু করে দিব্যি একটা কলেজী প্রবন্ধ লেখা যেত। আমার দুর্ভাগ্য (এবং পাঠকেরও) যে আমি ব্যাপারটার সূত্র সন্ধান করতে চাই আরও অনেক আগেকার একটা যুগ থেকে। সেটা হ'ল বৈদিক আর্য সংস্কৃতি ভারতে অনুপ্রবিষ্ট হবার অনতিকাল পরের যুগ।

ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা যে অবিমিশ্র বৈদিক-আর্য সংস্কৃতি নয় সে কথা জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতেরা বলে দিয়েছেন। বহিরাগত পশুপালক আর্য গোষ্ঠী ঋগ্বেদের যুগ পর্যন্ত যে জীবন-দর্শনকে মানত সেটা কমবেশী বস্তুতান্ত্রিক। ঋগ্বেদের মন্ত্রতন্ত্র 'আমাদের গোধন দাও, আমাদের অন্ন দাও, আমাদের রূপবতী পত্নী দাও, এই দাও, ওই দাও' জাতীয় পার্থিব কামনার এত ছড়াছড়ি যে তার আধ্যাত্মিক টীকা রচনা করতে যাওয়া মানে নতুন ক'রে কিছু রচনা করা (পরবর্তী যুগে অবশ্য তাই করা হয়েছে)। আবার যিনি কিছু দিলেন তাঁকে স্তুতি করতে করতে স্বর্গে তুলে দেওয়ার নজীরও কিছু আছে।[১] এতে নিন্দের কিছু নেই। পার্থিব সুখ-শান্তি জীবমাত্রেরই কাম্য। কিন্তু শেষ তো সেখানে নয়। অর্বাচীন

[১] রাজা স্বনয়ের উদ্দেশে মুনি কক্ষিবের প্রশস্তিগীতি, ঋক্ ১।১২৫।১৯, ১।৫৭।৬, ৬।৬০ ইত্যাদি, অক্ষ ব্যাখ্যা বিবাদ করা কঠিন।

উপনিষদগুলির কাল থেকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে অধ্যাত্মতত্ত্বের রথে চড়ে এসে উপস্থিত হল চূড়ান্ত সর্বনাশ। মায়াত্মক ব্রহ্মবাদী সেজে বসে রাতারাতি ভোল পালটে ফেললে আর্য সংস্কৃতি। বেদ কিম্বা উপনিষদের মধ্যে পার্থিব ব্যাপারের প্রসঙ্গ তুলে কিছু বলতে গেলেই এই মারে তো এই মারে। দেবগুরু বৃহস্পতির নেহাৎ কপাল ভালো বলে তাঁকে নিয়ে বেশী হৈ চৈ হয় নি। কিন্তু তাঁর ওপর যে চাপা আক্রোশ ছিল তার সবটুকু গিয়ে ফেটে পড়ল বৃহস্পতি-শিষ্য চার্বাকের ওপর। প্রচারমাহাত্ম্য সেকালেও বড়ো কম ছিল না। বস্তুবাদী চার্বাকের দর্শনকে বিকৃত ব্যাখ্যা করতে করতে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ এমন একটা পর্যায়ে এনে ফেললেন যে কিছুকাল পরে প্রাকৃতজন বুঝতে শিখলে, চার্বাক এবং তাঁর মতাবলম্বীরা মায়াত্মক জীব। স্বয়ং বুদ্ধদেবও এঁদের অনন্ত ক্রোধ থেকে রক্ষা পাননি। বেদ না মানলেই নাস্তিক। আর্য সংস্কৃতির ওপর ক্রীতদাসসুলভ আনুগত্য না থাকলেই সে বিধর্মী অশুচি। অতএব 'বৌদ্ধ চোর ও নাস্তিক সর্বথা পরিত্যাজ্য।' ঋকবেদ থেকে সুরু করে মধ্যপর্বের উপনিষদগুলি পর্যন্ত পার্থিব কামনা বাসনার যে অবাধ আকাঙ্খার প্রকাশ, তার টীকা ভাষ্য পালটে গেল। পরবর্তী কালে সেই আরোপিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলতেই মুনিঋষি আর প্রাকৃতজন একেবারে 'ইগনোরান্ট'। আহা, অনির্বচনীয়।

এই হচ্ছে সেই স্বর্ণ আর্য সংস্কৃতির প্রথম সর্গ। এরই কাছে হীনমন্য হ'য়ে অনার্য গোষ্ঠীগুলির একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পীয় (হরপ্পা) সভ্যতার বিনয়ক্ষণ থেকে প্রাগার্য ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির মেরুদণ্ড নিশ্চয়ই ভেঙেছিল। এ তার অবশ্যম্ভাবী ফল।

বাঙলায় আর্য সংস্কৃতির দিগ্বিজয় গুপ্ত রাজাদের যুগে। এ দেশের অনার্য গোষ্ঠীগুলির বেশ একটা বড়ো অংশের ওপরে আর্যাবর্তের হীনমন্য অনার্য গোষ্ঠীর প্রভাব এসে পড়েছিল। আর্য সংস্কৃতিও পূর্ব দিকে এগোতে এগোতে গুপ্ত যুগে একেবারে এদেশের দরজায় এসে দাঁড়াল। হীনমন্য অনার্য গোষ্ঠীগুলি আর্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিলে। জাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে গোয়ার গোবিন্দ একরোখা মানুষও ছিল কিছু। তারা এত সুখে রাজী হল না, ডেরাডাণ্ডা তুলে রওনা হল পাহাড়ে জঙ্গলে। এদের উত্তর পুরুষরা বর্তমানে আমাদের করুণা এবং রিসার্চের পাত্র হয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে মরছে।

যা বলছিলাম।

গুপ্ত যুগে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির এই যে যোগাযোগটা ঘটল, এটা কোনো-ক্রমেই সমানে সমানে নয়। উপাদানের দিক থেকে তো বটেই, মনোভাবের দিক থেকে আলাদা জাতের। এ সংযোগ ঘটল বিজয়ী আর্য-মানসের বিপুল আত্মম্ভরিতা আর পুঞ্জীভূত মর্ষকামের সঙ্গে বিজিত অনার্য-মানসের চূড়ান্ত হীনমন্যতার। সুতার্কিকেরা বলেছেন, বাঙালী মিশ্ররক্তের ওয়ারিশান—বর্ণসংকর জাতি। সংস্কৃতিতে তার প্রভাব থাকবেই। তবু যদি দু'হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া অসম-মিলনের ফলাফল একাল পর্যন্ত না গড়াত, তাতে সান্ত্বনা থাকত কিছু। কিন্তু ব্যাপারটা তা ঘটেনি। দু'টো ধারায় মিলে জগাখিচুড়ি হয়েছে। বাঙালীর চিন্তামানসে তাই এত বিরোধী ধর্মের সমাবেশ। একদিকে আত্মম্ভরিতা অন্যদিকে হীনমন্যতা। সংস্কৃতির মেকানিক্যাল মিক্স্‌চার! এরই ফলে হয়তো বাঙলায়

সংস্কৃতকে পালাজ্বরের মতো এক একটা কাল অন্তে হীনম্মন্যতার সর্বাঙ্গ কাঁপানো জ্বর এসে বেশ কিছু-কালের জন্যে বেহুঁশ করে রেখে গেছে। প্রমাণ? পাল রাজাদের যুগে যে বাঙালী বৌদ্ধ ভাবধারার আদর্শে নিজস্ব একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, তা কোথায় তলিয়ে গেল সেন-রাজাদের কালে। সেন রাজারা আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সেটা টের পেয়েই উচ্চ কোটির বাঙালী ঝটপট ভোল পালটে নিলে। সংস্কৃত আর পুরাণ চর্চার ধুম পড়ে গেল। এর পরেই এলো তুর্কিরা। তাদের মনোমত হবার প্রাণান্তকর চেষ্টাও উচ্চকোটির বাঙালী রীতিমতো উদ্যমের সঙ্গেই করেছে। অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে রক্তের সম্পর্কটাতো ছিল। কিন্তু 'পাছে লোকে কিছু বলে।' অতএব যৎ-যাবতীয় অনার্য চিন্তাকে একবার যদি আর্য-পুরাণ আর ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে আর পায় কে? ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই হাস্যকর জোড়াতালির চেষ্টাটা করা হয়েছে। আর্যত্বের ছাপ না লাগানো পর্যন্ত নিজেদের যতীত কোনো কিছুকেই 'আমার' বলে স্বীকৃতি দেবার বলিষ্ঠতা তাঁদের ছিল না। এও সেই আর্যম্মন্যতার প্রভাবে। উচ্চ কোটির বাঙালী সব জেনে শুনেও সেদিন নিজেকে পুরোপুরি আর্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ কায়েম হয়ে বসবার পর ওই একই মানসিক দৈন্য নতুন পোষাকে দেখা দিয়েছিল।

বৈদিক আর্য সংস্কৃতি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে শ্রদ্ধা করতে শেখে নি। যাযাবর মেষপালকের রক্তে সে ঔদার্য ছিল না। তাই সবাই তার দাস। যে তার কর্তৃত্ব এবং ভণ্ডামি মানতে রাজী নয় সে নাস্তিক কিম্বা পাষণ্ড। অনার্য চিত্ত ছিল গোঁয়ার, একরোখা কিন্তু আত্মম্ভরী নয়। বাঙালী চিন্তার যে অংশে আর্যত্বের ছোঁয়াচ লাগেনি সে অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে চাঁদ সওদাগর। আর যে অংশ আর্যসংস্কৃতির অ্যানেস্থেসিয়া করা হয়েছিল সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে ধর্মাচারের নামে সমাজজীবনে ভণ্ডামি আর ব্যভিচারের প্রচলন-কৌশল। অনার্য মানস, আর যাই হ'ক, দৈব কামনাকে কামনা বলেই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে। নবারি-সর্বস্ব আর্য-সংস্কৃতি-ধারকের মতো তাকে নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার রাংতা মুড়ে ভক্তি গদগদ হয়ে তারপর নির্লজ্জ কামুক রূপটা প্রকাশের প্রয়োজন তার দেখা দেয়নি। গুপ্তযুগে যার সূচনা, তাইই প্রায় হাজার দেড়েক বছর ধ'রে বাঙলার মাটিতে গেড়ে বসেছে, শিকড় চালিয়ে দিয়েছে অনেক গভীরে। উনবিংশ শতাব্দীতে সেই একই ভড়ং আমরা করেছি। শুধু পাত্র বদল হয়েছে, এইমাত্র। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিল্প, আমাদের সাহিত্যকে পশ্চিমী সংস্কৃতির ইনকিউবেটারে না রেখে আমরা স্বস্তি পাইনি। ইংরেজের কাছে, গোটা পশ্চিমের কাছে নেবার অনেক কিছুই ছিল, এখনো অনেক কিছু আছে। কিন্তু গ্রহীতা হিসেবে আমাদের মনের সুস্থতা আর স্বাভাবিকতা দুয়েরই অভাব।

॥ চার ॥

একই আধারে ভণ্ডামি আর হীনম্মন্যতার সহাবস্থান যে কতো মারাত্মক তার মোক্ষম উদাহরণ ভারতীয় সংস্কৃতি। মন্দিরগাত্রে নগ্ন কামকেলির ভাস্কর্য রূপস্থাপন করে আমরা বুক ফুলিয়ে একথা বলতে

যৌন

পারিনি যে, এ আমাদের বাসনাজাত সৃষ্টি। পরিবর্তে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করে নিজেদের সহজ বুদ্ধিকেই কলুষিত করেছি। আমাদের ধর্মসাধনা, আমাদের সমাজ-জীবন—সর্বত্র এই আত্মপ্রতারণাকে সযত্নে লালন ক'রে আমরা গর্বিত। সেই আত্মপ্রতারক মনের প্রভাব আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে মাথা উঁচিয়ে। নাটক তো তার বাইরে নয়। তাই সে যাত্রাতেও পৃথক ফল ঘটেনি। দীনবন্ধু মিত্রিরকে আমরা করুণা করি কারণ তিনি শেক্সপীয়র হতে পারেন নি বলে। ডি, এল, রায়কে নিয়ে দুঃখ করি কারণ বেচারা ভদ্রলোক না বরকা না বাহারকা। না সোফোক্লিস, না শেক্সপীয়র। সেই আমরাই আবার কোনো পেশাদারী থিয়েটারের স্থূল নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলি 'অপূর্ব' (সুপারলেটিভ ডিগ্রিটা আমরা বাক্যালঙ্কার হিসেবেই প্রয়োগ করি তাই হয়তো !), দু'কলম 'রাইটআপ'ই হয়তো লিখে ফেলি সেই অভিনব নাটক সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিষ্কৃতি দিয়েছি। দিল্লী থেকে নাম করে এলে সে নাটকের প্রতিটি অভিনয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি আমরা। দিল্লী যাবার আগে প্রযোজকের আর্থিক সংকটে নাভিশ্বাস ওঠে। রাজধানী ঘুরে এলে অবিশ্যি ভয় থাকে না আর।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? আমরা কোন্ নিরিখে বিচার করছি এখানে—নিজের বিচার বুদ্ধিতে না দিল্লীর শিরোপায় কলকানিতে?

কিছুকাল আগে লিটল থিয়েটারের ডি, আই, পি যখন অশ্লীলতার অপরাধে সংবাদপত্রের কাছে এক'ঘরে হবার দাখিল তখন সেই সংবাদপত্রেরই কোনো একখানিকে দেখেছি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে রবিবারের সাহিত্য বিভাগে (এবং সুযোগ পেলে সংবাদ বিভাগেও) উত্তেজক যৌনবিকৃতিমূলক কাহিনীকে নানা বাছাই করা চটকদার নাম দিয়ে পরিবেশন করতে। সেই সংবাদ পত্রেই ক'দিন আগে দেখা গেল মার্কিন দেশে অনুষ্ঠিত ইয়াঙ্কি-রুচি-সম্ভব বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারিণীর দেহের বিভিন্ন অংশের ইঞ্চিগত মাপ সমেত সংবাদ ছাপতে। উৎপল দত্ত অশ্লীল তা নয় দেখা গেল কিন্তু এই সহজিয়া সংবাদপত্র নিজের সম্বন্ধে কী বলেন জানতে ইচ্ছে হয়।

আমাদের সমালোচকবর্গের মধ্যে অনেকেই হয়তো যথার্থ উচ্চাঙ্গের নাটক না পেয়ে আশাহত। কিন্তু যথার্থ নাটকের পথ নির্দেশ করে নতুন নাট্যশাস্ত্র রচনার মৌলিকতা অর্জিত হয়নি। এখনো যেখানে একটা কথা বলতে গিয়ে সমালোচক আর দশজন সমালোচকের মন্তব্য জড় করে তারপর হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, সেখানে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব যে কতখানি তা বুঝিয়ে না বললেও চলে।

যাঁরা নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের বহুজনেরই নাটক আমি পড়েছি। কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে বলি, মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-সমস্যায় যে কটি নির্দিষ্ট ছক তাঁরা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান নাট্যকারের কাছে পেয়েছিলেন, তার বাইরে পা বাড়াবার সাহস বোধহয় তাঁরা হারিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ে যে জাতি ধুঁকছে তার উপযোগী শক্তিশালী নাটক রচনার পক্ষে অগভীর ফর্মুলা-মাফিক নাটক পর্যাপ্ত নয়। এ পথে জনপ্রিয়তা অর্জন হয়তো করত এবং শক্তি-বিহীন কিন্তু এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে না। গত শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন কুল সর্বস্বের আদর্শে বহু বিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি সমাজ সমস্যা মূলক যে বহু সংখ্যক নাটক রচিত হয়েছিল তার কোনোটিই যে সমস্যার গভীরে না গিয়ে

গতানুগতিক ভাবে একটু জনপ্রিয়তার আকর্ষণেই রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আজকের নবনাট্যের উদ্যোক্তাগণ সেই ভুল করবেন বা সেই অক্ষমতার পরিচয় দেবেন—তা কাম্য নয়। এই আলোচনায় যে হীনমন্যতার প্রসঙ্গ আমি এনেছি তার অন্যতম কারণও এই দিকে একটা ইংগিত করা। সৃজন কর্ম এবং সমালোচন—উভয় ক্ষেত্রেই যদি আমাদের মজ্জাগত সেই অবাস্থি আর হীনমন্যতা এখনো পাশাপাশি মাথা তুলে সগৌরবে এবং সকুণ্ঠায় বিরাজ করতে থাকে, সেটা কল্যাণকর হবে না।

বাংলা নাটকের সাফল্য

॥ ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ॥

আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর নাট্যসমালোচক আছেন, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে নাটক আজও রচিত হয় নাই, তবে ভবিষ্যতে রচিত হইতে পারে; আর এক শ্রেণীর সমালোচক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে—এ'যাবৎ যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন নাটক পাশ্চাত্ত্য ভাষায় রচিত যে কোন উল্লেখযোগ্য নাটকের তুল্য গুণ সম্পন্ন। এই দুই শ্রেণীর সমালোচকের মত এবং বিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা যদি সামান্য মাত্র হইত, তবে তাহা উপেক্ষা করিলেও চলিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটি মত সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী, সুতরাং গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁহারা ইংরেজি সাহিত্যের একান্ত ভক্ত এবং দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারাই মনে করিয়া থাকেন যে, বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কোন নাটক রচিত হয় নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছোটগল্প কাব্য রচিত হইয়াছে। এ' কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন না। ইহার কারণ আধুনিক বাংলা উপন্যাস ছোটগল্প এবং কাব্য পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও আঙ্গিক যেভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে, বাংলা নাটক রচনায় তাহা সেভাবে অনুসরণ করা হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্য বিচারে আমাদের দেশে যে অলঙ্কার শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্য-বিচারের জন্য তেমন কোন অলঙ্কার শাস্ত্র আজও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনা পদ্ধতিই আজও বাংলা সাহিত্য-বিচার-কালে আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই বিচারে বাংলা নাটক আলোচনা করিতে গিয়া যখন দেখা যায়, যে, পাশ্চাত্ত্য নাটক অনুযায়ী ইহা রচিত নহে, তখনই ইহা নাটক নহে বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহা কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা প্রথমেই বিচার করিতে হয়।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এদেশে উপন্যাস ছিল না, সেইজন্য ইংরেজী উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাবধারা একান্ত ভাবে অনুসরণ করিয়া আধুনিক যুগে উপন্যাস রচনায় কোন অন্তরায় দেখা দিল না। আধুনিক কাব্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর যখন এ'দেশে তাহারই প্রভাব বশতঃ নাটক রচনার প্রেরণাও দেখা দিল, তখন এই বিষয়ে অন্ধভাবে ইংরেজি ভাবাদর্শকে অনুসরণ করিবার পক্ষে প্রধানতঃ দুইটি অন্তরায় দেখা দিল, প্রথমতঃ সংস্কৃত নাটকের আদর্শ, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ যাত্রা প্রমুখ বাংলার অন্যান্য লোক-নাট্যের আদর্শ।

ইংরেজি নাটক যখন এদেশে প্রথম প্রচার লাভ করল, তখন সংস্কৃত নাটক কিংবা বাংলার অন্যান্য লোক-নাট্যের প্রভাব যে নিতান্ত স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—বরং উভয়ই তখন অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ' কথা সত্য ইংরেজি নাটক এ'দেশে প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত নাটকও এক অভিনব প্রাণশক্তি লাভ করিয়া পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক কালে রচিত এবং বহুল প্রচারিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' উভয়ই সংস্কৃত নাটকেরই বাংলা অনুবাদ, ইহাদের বহুল প্রচারের মধ্য দিয়া সংস্কৃত অনভিজ্ঞ পাঠকও সংস্কৃত নাটকের আস্বাদ লাভ করতে সক্ষম হইয়াছিল। তারপর যখন কলিকাতায় ইংরেজীতে নাট্যাভিনয়ের সূচনা দেখা দিল, তখন এ'দেশের বিদ্যোৎসাহী রাজা ও জমিদারগণ সংস্কৃত নাটকেরই বাংলা অনুবাদ করাইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সৌখীন রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া তাহাদের অভিনয় করাইবার জন্য প্রয়াসী হইলেন। তারপর পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রভাববশতঃ দেশীয় কৃষ্ণযাত্রার বৈচিত্র্যহীন ধারাটিও নূতন নূতন বিষয়-বস্তুর এবং নূতনতর আঙ্গিকের সন্ধান পাইয়া নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, সেই সময়েই কলিকাতার অলিতে গলিতে এবং সেখান হইতে বাংলার পল্লীগ্রামাঞ্চলেও 'নূতন যাত্রা'র কর্ম-ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করল। সুতরাং দেখা যায়, ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বাংলা কথা ও কাব্য সাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন জন্মলাভ করিলেও নাটকের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখা দিল—সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন নাটক রচিত হইবার ফলে, এই দেশের এই বিষয়ক যে ধারাটি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল; পাশ্চাত্য নাটক অনুশীলনের মধ্য দিয়া জাতি নিজের এই বিষয়ক বিলুপ্ত ঐতিহ্যটির সন্ধান করিয়া লইল, তাহার ফলে দীর্ঘকাল ব্যবধানে সংস্কৃত নাটক এবং দেশীয় যাত্রার মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার হইল। প্রধানতঃ এই জন্য পাশ্চাত্য ভাব এবং আঙ্গিক অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া প্রথম হইতেই এ' দেশে কোন নাটক রচিত হইতে পারিল না। তখন কিছু কিছু পাশ্চাত্য নাটক বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল সত্য, কিন্তু এই সকল অনুবাদ কিংবা অনুকরণ এই বিষয়ক জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া লইতে পারিল না। সেই যুগে ইংরেজি নাটকের বহু বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও ইংরেজি কথাসাহিত্যের যে কোন বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল না, তাহার কারণও প্রধানতঃ ইহাই। বিশিষ্ট কোন জাতীয় ঐতিহ্য কিংবা আদর্শের অভাবে কথাসাহিত্য অতি সহজেই পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, সুতরাং তাহার অনুবাদের আর প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু নাটক রচনায় দেশীয় ঐতিহ্য অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া সেখানে কেবল অনুবাদ ভিন্ন আর কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই।

এখানে একটি কথা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কাব্য সাহিত্যেরও ত এ'দেশের একটি ঐতিহ্য ছিল, সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের নূতন আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলাম, তখন দেশীয় ঐতিহ্য যদি তাহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া না থাকে, তবে নাটকের ক্ষেত্রে এ' কথা প্রযোজ্য হইবে? কিন্তু তাহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কাব্য-

সাহিত্যের ঐতিহ্য ছিল, তাহার বহির্মুখী রূপটি অবলম্বন করিয়াই নবযুগের বাঙালীর নূতন কাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; এমনকি, মাইকেল মধুসূদন দত্তও কাব্যের প্রাণের মধ্যে নূতনত্বেরই বিকাশ করুন না কেন, কাব্যদেহের গঠনে তিনি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে তিনি যে চৌদ্দ অক্ষরের গাঁথুনিকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার ব্রজাঙ্গনার মধ্যে যে বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ও ভাষাকে অক্ষত রাখিয়াছেন, ইহা তাহার ঐতিহ্য প্রীতিরই নিদর্শন তথাপি এ'কথাও সত্য বাংলা প্রাচীন কাব্যের ঐতিহ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আসিয়া একশত বৎসর ব্যাপী অনুশীলনের অভাবে সম্পূর্ণ গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু লোক-নাট্যের ধারা নানা ভাবে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়াও দেশীয় কৃষ্ণযাত্রার ধারা খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন প্রাণরসে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা কদাচ মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর ধারার মত লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

এই সকল কারণেই দেখা যায় যে, বাংলাসাহিত্যে যখন নাটকের প্রথম প্রাদুর্ভাব হইল, তখন তাহা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ করিতে পারিল না; চলমান দেশীয় এই বিষয়ক একটি ঐতিহ্যের ধারা ইহার এই বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করিল। সেইজন্য বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক যাহা রচিত হইল, তাহা কোন ইংরেজিনবিশের দ্বারা রচিত হইল না, বরং তাহার পরিবর্তে একজন সম্পূর্ণ ইংরেজি অনভিজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত দ্বারাই তাহা রচিত, তাহা রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব-নাটক'। যখন আমরা আধুনিক নাট্য সাহিত্য প্রবর্তনের মূলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বলি, তখন এ'কথা মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখি না যে, বাংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আধুনিক নাটক যিনি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হইবার বিন্দু মাত্রও সুযোগ লাভ করেন নাই। অথচ তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই আমরা গণ্য করি।

বাংলা নাটকসম্পর্কে যে যাহাই বলুন না কেন, ইহার সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, অনুবাদ ব্যতীত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন বিষয় বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইবার পূর্বেই মৌলিক রচনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাটক রূপেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক পরিচয়ই নাটক, ইহার মধ্য দিয়াই মধ্যবিত্ত বাংলার সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়টি প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব-নাটক' যখন প্রকাশিত হয়, তখনও রঙ্গলালের প্রথম কাব্য, প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম উপন্যাস কিছুই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয় নাই, আরও দশ বৎসরেরও পর বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব দেখা দিয়েছিল। এমন কি, ইহাদের আবির্ভাবের পরও ইঁহাদের প্রত্যেকেরই রোমান্টিক অনুভূতির প্রাবল্য বাঙালী বাস্তব-জীবনকে ইহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেই নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন কেবলমাত্র সংস্কৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা ভাষায় যে নাটক

রচনা করিলেন, তাহা কেবল বাংলা নাটকেরই প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হইয়া রহিল না, ইহার ভিতর দিয়া বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন জীবনের প্রথম স্পন্দন দেখা দিল। অতএব যে রচনার মধ্য দিয়া বাঙালীর জীবনস্পন্দন সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা নাটক হিসাবেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ এ' কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, সাহিত্যের সকল বিষয়ের মতই ইহার নাটকও জীবনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, বরং নাটকের মধ্য দিয়া সেই জীবনের প্রকাশ আরও প্রত্যক্ষ। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকে'র পাশ্চাত্য নাটক হিসাবে যে ত্রুটিই থাকুক না কেন, ইহার মধ্য দিয়া যে বাঙালী সমাজের একটি অংশের বাস্তবরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ এই জীবন যে সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব তাহা নহে, নাটকীয় ভঙ্গিতেই ইহার মধ্য দিয়া জীবনের উপস্থাপনা দেখা যায়, অর্থাৎ ইহার মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ জীবনের পরিচয় আছে, আবার ইহার মধ্যে জীবনের সংঘাতের চিত্রটিও আছে। ইহার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটি স্বার্থ যেভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতেই ইহার মধ্য দিয়া একটি নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হইবার অবকাশ হইয়াছে। কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের সংঘাত ইহাতে নাই বলিয়াই ইহা বাঙালীর নাটক হিসাবে ব্যর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বাঙালীর জীবনের সংঘাত চিরকালই ভিতর হইতেই আসিয়াছে, বাহির হইতে আসে নাই। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডীতে চন্দ্রবেশিনী চণ্ডীকে দেখিয়া ফুল্লরার মধ্যে যে সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও অন্তর্মুখী ছিল, তাহার বহির্মুখী কোন পরিচয়ই ছিল না। সেই ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ বাঙালী নরনারীর জীবনে যখনই কোন সংঘাত সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই সেই সংঘাত বর্হিমুখী পরিচয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী পরিচয় লাভ করিয়াছে। সুতরাং এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের অনুকূল বাংলা কোন নাটকে বহির্মুখী সংঘাত যদি দেখা না যায়, তবে তাহাকে বাঙালীর নাটক হিসাবে ব্যর্থ বলিবার কোন কারণ নাই।

রামনারায়ণ তর্করত্নের পর মধুসূদনের কথা আমরা বাদ দিয়াও যদি দীনবন্ধুর রচনার মধ্যে প্রবেশ করি, তবে সেখানেও দেখিতে পাই, ইংরেজি নাটকের অনুকূলে তাহাদের মধ্যে বহির্মুখী ঘটনার আড়ম্বর সৃষ্টি করা সত্ত্বেও অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাহাদেরও নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'নীল-দর্পণ' নাটকের দুইটি শক্তির বহির্মুখী বিরোধের মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বই ইহাদের নাটকীয় গুণ সৃষ্টির যথার্থ কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। বহির্মুখী বিষয় বস্তু লইয়া রচিত হওয়া সত্ত্বেও 'নীল-দর্পণ' নাটকে নীচরিত্র যে এত প্রাধান্য লাভ করিল, ইহার কারণ ইহাই। অন্তর্মুখীনতা নীচরিত্রেরই গুণ, পুরুষচরিত্রের গুণ নহে; সুতরাং বহির্মুখী ঘটনা অন্তর্মুখীন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, 'নীল-দর্পণে' তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহাতেও যে জগৎ ও জীবন আছে, তাহা বাঙালীর পক্ষে শাশ্বত ও সত্য, বাঙালী হিন্দুমুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, জীবন-সংস্কার একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা এত শক্তিশালী রচনা। ইংরেজের সমাজ কিংবা জীবন ইহাতে নাই, যে দুই অত্যাচারী ইংরেজ নীলকর আছে, তাহাদের পরিচয় কেবলমাত্র ইহাদের অত্যাচারে, ইহাদের ব্যক্তিত্ব নহে। ব্যক্তিধর্ম দেশকালনিরপেক্ষ সবলের যে অত্যাচারী সত্তা দুর্বলের সম্মুখে

চিরকালই বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, উভ এবং রোগের মধ্য দিয়া উহারই প্রকাশ দেখা যায়। ইহাদের রূপায়ণে দীনবন্ধুর যে কোন ত্রুটী প্রকাশ পায় নাই, তাহা নিরপেক্ষ সমালোচক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। 'নীল-দর্পণ' নাটকের মূল্য যে কেবল মাত্র সাময়িক নহে, বরং তাহার পরিবর্তে ইহার মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের চিরন্তন সুখদুঃখের কাহিনী বিধৃত হইয়াছে, তাহা ইহার কয়েকটি চরিত্র গভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাশ্চাত্য আদর্শ অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া যদি এই নাটক রচিত হইত, তবে ইহার মধ্যে এই শক্তি কিছুতেই প্রকাশ পাইতে পারিত না, কারণ, অনুবাদ এবং অনুকরণের মধ্য দিয়া মৌলিক সৃষ্টির শক্তি কিছুতেই প্রকাশ পায় না। দীনবন্ধুর সকল নাটকই চিত্র-প্রধান, পাশ্চাত্য নাটকের মত ঘটনাপ্রধান নহে, ঘটনার পরিবর্তে চিত্রের প্রাধান্য আমাদের জাতীয় রস-সংস্কার হইতেই যে আসিয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আমাদের মধ্যযুগের কাহিনী-মূলক কাব্য অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ঘটনার পরিবর্তে চিত্রের প্রাধান্যই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারই প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীর কাহিনীমূলক রচনার মধ্যে গিয়াও প্রবেশ করিয়াছে। যদিও বাংলা নাট্যসাহিত্য রচনার প্রথম যুগ অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ, তথাপি মাইকেল কিংবা দীনবন্ধু অনুবাদের পথে অগ্রসর না হইয়া স্বাঙ্গীকরণের দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্বাঙ্গীকরণের ভিতর দিয়া মৌলিক সৃষ্টির সার্থকতা দীনবন্ধুর নাটকের মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম দেখা যায়।

দীনবন্ধুর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সুদূর প্রসারী হইয়াছিল, এমন কি পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালও সেই প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র ইংরেজি নাটক পাঠ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই বিষয়ক দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ ছিল বলিয়া পাশ্চাত্য আদর্শকে তাহার নাটক রচনায় আনুপূর্বিক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর যে অংশে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সময় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে পাশ্চাত্য প্রভাব সর্বব্যাপী হইলেও নাটকের মধ্যে তাহার প্রভাব যে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহার কারণও নাটক বিষয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় ঐতিহ্যের দৃঢ়তা; ইহা যদি কোন দিক দিয়া শিথিল হইয়া পড়িত, তবে সেই সুযোগে পাশ্চাত্য রূপ ও আদর্শ ইহাকে প্রবলভাবে অধিকার করিয়া ফেলিত। সুতরাং এই ঐতিহ্য যে কতখানি সুদৃঢ় ছিল, তাহা ইহা হইতেই বিচার করিতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর যুগচিন্তা ততোধিক প্রকাশ পাইয়াছে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর অধ্যাত্মচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারাটির সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যোগ রক্ষা করিয়াছেন। এ'কথা সত্য হয়ত তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি দীনবন্ধুর নাটকের চরিত্রগুলির মত যুগোত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে নাই, তথাপি জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে ধারণ করিয়া থাকিবার যে শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কাহারও মধ্যে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের নাটক সেক্সপীয়র কিংবা পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ দিয়া নহে, জাতীয় ঐতিহ্যের দিক দিয়া বিচার করা কর্তব্য; কারণ ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করাই গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল, সেক্সপীয়র কিংবা পাশ্চাত্য নাটকের বহির্মুখী আঙ্গিক তাঁহার উপলক্ষ্য ছিল মাত্র।

গিরিশচন্দ্রের পরই রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করতে হয়। দেখা যায় যে মাত্র কয়েকখানি নাটক যেমন, 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বিয়োগান্তক নাটকের ভাব ও আঙ্গিকের উপর লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, অন্যান্য নাট্যরচনায় তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার নাটককে 'পালা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'রক্তকরবী' সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'ইহা নন্দিনী নামক মানবীর পালা' ইত্যাদি। এ' কথা সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের উপকরণ বাহুল্যকে সর্বদাই নিন্দা করিয়াছেন, এমন কি, শুধু মুখেই নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, লিখিতভাবে তাহার মত এই বিষয় স্পষ্ট তাহার প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং যে অভিনয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল এবং সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস তিনি পালন করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি তাঁহার নাটকের নিজস্ব একটি বিশিষ্ট রূপদান করিয়াছেন। এই কথাটি বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য নাটকের সংজ্ঞার দ্বারা যখন তাঁহার নাটকের মূল্য বিচার করিতে অগ্রসর হই, তখন ভুল আমারই হয়, নাট্যকারের হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে বহু মতবাদ বহুদিক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার নাটক সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাটকের দোষগুণ সম্পর্কে যে সর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গ পত্রে এই নাটকখানি সম্পর্কে লিখিয়াছেন,

কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।

এই কথাটি কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকই নয়, তাহার প্রায় সকল নাটক সম্পর্কেই প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন বাঙ্গালীর সর্বকালীন-রস-চেতনার সুযোগ্য প্রতিনিধি, সুতরাং তাহার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব নহে, বরং তাহার পরিবর্তে সমগ্র বাঙালী জাতির রস-চৈতন্যে স্পন্দন অনুভব করতে পারা যায়। সুতরাং তিনি যখন বলেন, যে তাঁহার নাটকের মধ্যে লিরিকের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা জাতীয় জীবনের রস-চৈতন্য অবলম্বন করিয়াই তাহার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে কাহারও মুক্তির উপায় নাই। এ কথা সকলেই জানেন, সংস্কৃত নাটক 'লিরিকধর্মী' রচনা, কৃষ্ণযাত্রা লিরিকধর্মী রচনা, বাংলা 'নূতন যাত্রা'ও গীতবাদ্য-বহুল লিরিকধর্মী রচনা। কেবলমাত্র যাঁহারা ইংরেজী নাটকের অনুবাদ কিংবা অন্যভাবে ইংরেজী নাটককে অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বাদ দিলে দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ লিরিকধর্মী রচনা। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটি বিশেষত্ব সুতরাং যে জাতির নাটক লইয়া বিচার করিব, সেই জাতির মৌলিক চরিত্রগুণের যদি সন্ধান না করিতে পারি, তবে যে বিচার কিছুতেই যথার্থ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালীর নাটকের বিশেষত্ব তাহার মৌলিক চরিত্রগুণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, সেখানে ইংরেজের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই, যেখানে ইংরেজ

এক বাঙালী আর—ইহারা কিছুতেই এক হইতে পারে না। সেই সূত্রেই বাঙালীর নাটক বাঙালীরই নাটক, ইহা কখনই ভিতরে ও বাহিরে ইংরেজি নাটকের পরিচয় লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, তাহার নাটকে লিরিকের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তখন কেবল ইহা রবীন্দ্র নাটকেরই একটি বিশেষত্ব বলিয়া গ্রহণ করলে ভুল হইবে, ইহা বাংলা নাটকেরই বিশেষত্ব, কারণ বাঙালীজাতির মধ্যেই ইহার শক্তিটি বিধৃত হইয়াছে। এখনও এমন সমালোচক আছেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে রবীন্দ্রনাথের পর আর বাংলা নাটক রচিত হয় নাই, কেহ কেহ আরও সাহস একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত আসিয়াই বাংলা নাট্যরচনার ধারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল সাহিত্য বিচারে নহে, ব্যক্তিগত জীবনেও এমন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্ব বিষয়কে নিতান্ত তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া যাহা পুরাকীর্তি কেবল মাত্র তাহারই জয়গান করিয়া থাকেন। ইহা একশ্রেণীর মানুষের একটি সাধারণ প্রকৃতি, নিরপেক্ষ সাহিত্য সমালোচনা তাহাদের দ্বারা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। মানুষের মন কদাচ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে না, পুরাকীর্তি-পার্শ্বেই নূতন কীর্তি স্থাপিত হয় এবং তাহাও একদিন পুরাকীর্তিতে পরিণত হয়। নূতনের মধ্য দিয়া পুরাতনেরও সৃষ্টি হয়, নূতন সৃষ্টি না হইলে পুরাকীর্তিরও সন্ধান পাওয়া যাইত না। সুতরাং এই শ্রেণীর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সমালোচকের উক্তির কোন মূল্য নাই। বাংলা নাটকের প্রাণশক্তির প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহা সুস্পষ্ট পদরেখা ধরিয়া এক যুগ হইতে আর এক যুগে যত প্রত্যক্ষ ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন বিষয় দ্বারা তাহা সম্ভব হইতেছে না। অতীতে বাংলা নাটক যেমন কয়েকটি যুগ উত্তীর্ণ হইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তেমনই বর্তমানেও আমাদের চোখেরই সম্মুখে ইহা নূতন যুগের সীমানায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাণশক্তিহীন নির্জীব পদার্থের পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভব হইত না। সাম্প্রতিক বাংলা নাটক কেবল সক্রিয় এবং সচেতন বলিয়াই যুগের জীবনটি ইহা নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করিতে পারিয়াছে, নির্জীব হইলে পুরাতন পর্যুষিত রীতিরই অনুসরণ করিত। আমরা যাহাকে নবনাট্য আন্দোলন বলি, তাহা প্রকৃত অর্থে কোন 'আন্দোলন' না হইতে পারে, তথাপি ইহা বাংলা নাটকের যে প্রাণশক্তির পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ ইহার ভিতর দিয়া বাংলার প্রত্যক্ষ সমাজ জীবনটি যে আত্ম তাহা পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে প্রকাশ ভঙ্গির অভিনবত্বে আত্মবিশ্বাসের অপরিমিত শক্তিতে নব যুগের বাংলা নাটক যে সত্য এবং সৌন্দর্য-সন্ধানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই। যাহা নির্বীর্য, নিস্তেজ প্রাণশক্তিহীন, তাহার দ্বারা ঐ কাজ কখনই সম্ভব নহে। এই নব-যুগের একজন মাত্র নাট্যকার সম্পর্কে আমি এখানে উল্লেখ করিতে চাই, তিনি তুলসী লাহিড়ী। তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী নাট্যকার। তিনি কয়েকখানি নাটকই রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার দুইখানি নাটকের সঙ্গে বাঙালী নাট্যামোদী মাত্রেরই পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে এক খানির নাম 'দুঃখীর ইমান' এবং আর একখানি নাটকের নাম 'ছেঁড়া তার'। পল্লী বাংলার জীবন-সংস্কার সম্পর্কে যাহার সামান্য পরিচয়ও আছে তিনি অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ইহাদের মধ্যে যদ যেমন আছে, তেমনই জীবনের বাস্তব

রূপও প্রকাশ পাইয়াছে। এলিজাবেথীয় নাটক অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে বহুমুখী ঘটনার আড়ম্বর কিছু মাত্র নাই, ইহাদের মধ্যে যে জীবনগুলি রূপায়িত হইয়াছে, তাহাদের পরিসর নিতান্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তথাপি ঘটনার আবর্তে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং সর্বোপরি বাস্তব জীবনের রূপায়ণে ইহারা যে কোন সভ্য দেশের নাটকের সমান মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে। তথাপি ইহাদের সর্বজনীন স্বীকৃতিতে যে একটি বাধা আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই বিষয় ইহার প্রথম বাধা ইহার আঞ্চলিক ভাষা, কারণ ইহার ভাষা কাব্যের ভাষা নহে, সাহিত্যের ভাষা নহে, ইহার ভাষা বাংলার আঞ্চলিক জীবনাশ্রিত নিরক্ষরের ভাষা। দ্বিতীয়তঃ যে জীবন-সংস্কারটি ভিত্তি করিয়া এই নাটকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের দেশেরই নাগরিক অধিবাসীর নাই। অথচ ইহা সম্যক বুঝিতে না পারিলে নাটকের পরিণতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে পারা যায় না। বাংলা ভাষায় সার্থক নাটক রচনায় এইখানেই একটি প্রধান বাধা দেখা যায়। বাংলার নাগরিক জীবনের অধিবাসীর সঙ্গে পল্লীজীবনের অধিবাসীর একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পল্লীজীবনের সংস্কারের শক্তি নাগরিক জীবনের সংস্কারের শক্তি অপেক্ষা অধিক। অথচ সেই পল্লীজীবনের সঙ্গে সহরে নাট্যকারদিগের নাটকের পাঠক ও দর্শকের যোগ ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তুলসী লাহিড়ীর উক্ত দুইখানি নাটকই একান্ত-ভাবে পল্লীজীবনের সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে, নাট্যকার ইহাদের শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার পাঠক এবং নাটকের দর্শকগণ তাহার সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই, যদি হইত তবে উক্ত নাটক দুইখানির জনপ্রিয়তা আরও লক্ষিত হইত। আঞ্চলিক ভাষা অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু একদিন নাটকীয় সংলাপ সৃষ্টিতে সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে নাগরিক জীবনের প্রসার এবং পল্লীজীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য নাটকের ভিতর দিয়া তাহার প্রয়োগ আর জনপ্রিয়তার কারণ হইতে পারে না। পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলের ভাষা ক্রমে আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া আসিতেছে, পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলের ভাষার সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং যে সুনিবিড় পল্লী জীবনাশ্রিত ভাষা একদিন দীনবন্ধুকে তাহার নাটকীয় সংলাপ রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, আজ সেই ভাষাও আমাদের সম্মুখে নাই। সেইজন্য বাহিরের দিক দিয়া যথার্থ আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইলেও কাহিনীর নাটকীয় গুণ এবং চরিত্রের বাস্তব ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তুলসী লাহিড়ীর উক্ত দুইখানি নাটকে তাহার কিছু মাত্র অভাব আছে, এমন মনে করা যায় না।

যুগ-মানসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই আজ বাংলা নাটক ঘটনাত্মক হইবার পরিবর্তে বিশ্লেষণাত্মক হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশ্লেষণাত্মক নাটকের সৃষ্টি হইলেও বাংলা দেশে তাহার প্রভাব সাম্প্রতিক কালের পূর্ববর্তী নহে। সুতরাং বাংলা নাটক কেবলমাত্র প্রাচীন পর্যুষিত রীতি অবলম্বন করিয়াই একটি অবিচল আদর্শের সমুখে স্থির হইয়া আছে এ'কথা বলিতে পারা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার প্রাণশক্তি কদাচ লোপ পায় নাই ; এমনকি, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য যে কোন বিষয়ের তুলনায় ইহার মধ্যেই সর্বাধিক প্রাণশক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। এই গুণেই ইহার স্থায়িত্ব এবং এই গুণেই ইহার বিকাশ ; ইহার সম্পর্কে হতাশার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

নাট্যানুরাগীর পরিক্রমা

। নলিনী কুমার বসু ।

বাহিরে তখন শেষ রাত্রের হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ। থিয়েটার হলের গুমটগরম থেকে বেরিয়েছি না যেন আলাদা রাজ্যে পা দিয়েছি। সেই আলাদা রাজ্য অবশ্য দৈনন্দিনের পরিচিত ঠাঁই। অথচ হল থেকে বেরিয়ে তাকেই বোধ হচ্ছিল নূতন, আর আট ঘণ্টা অস্বস্তিকর আবহে কাটাতে হয়েছে যে হলে সেই হল-ই কিনা বাস্তবের তীক্ষ্ণতা মুছে ফেলে আমাকে কেমন সহজেই আত্মসাৎ করে রেখেছিল। দীর্ঘ-সময়টা ছিলাম এক স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা। বাহিরে এসেও তার ঘোর কাটেনি। হল থেকে সকলে বেরিয়ে আসছে যেন স্বপ্নের দেশের মিছিল। স্বপ্ন থেকে বাস্তবতায় জেগে উঠার তখন ইচ্ছাও ছিল না, বোধ করি তেমন সামর্থ্যও ছিল না।—'আর যে যা বলে বলুক প্রতাপ, তুমি ও কথা বোলো না'—তখনও কানে শুনছি শৈবলিনীবেশী তারাসুন্দরীর অভিমানাহত কণ্ঠ। এমনকি, শেষে অভিনীত 'জয়দেব' নাটকে পরাণদের কণ্ঠের 'এই বলে নূপুর বাজে' তখনও আমার কানে গুঞ্জরিত হতে থাকলেও তারই মধ্যে শুনতে পাচ্ছি—'আজ নয়া গাঙে চাঁদের আলো কেন প্রতাপ'।—বাকি রাতটুকু বা পরের দিনই নয়, কয়েকটা দিনই কেটেছে আচ্ছন্নতার মধ্যে।

দীর্ঘকাল আগের কথা। শিশিরবাবুর নাট্য-মন্দির বা আর্টথিয়েটার তখনও আরম্ভ হয় নি। মোহাচ্ছন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করার বয়স তখন আমার নয়, কিন্তু অস্পষ্ট স্মৃতির কারসাজিতে কল্পনাকে যে সত্য বলে জাহির করছি না তা স্পষ্টই মনে করতে পারি। কেননা, ব্যতিক্রমের অভিজ্ঞতাও ত বেশ স্পষ্টই মনে আছে। এমন অনেক নাটকের অভিনয়ও তখন দেখেছি যার মধ্যপথে আর পাঁচজনের সঙ্গে 'দুত্তোর' ব'লে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসেছি। কিম্বা, বিকল্প পন্থা গ্রহণে তৎকালে প্রচলিত বেঞ্চিপাতা 'Pit' আসনে খানিকটা সময় গড়িয়ে নিয়েছি। এই পন্থার উদ্ভাবকও আমি নয়, আশে-পাশে ক্লান্তিযুক্ত নাসিকাধ্বনিই আমাকে বিকল্পপন্থায় উৎসাহিত করেছে। তা ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? তখন নাটক চলত সারারাত, আর, এ কালের মত বাস-এর সুবিধা ছিল না। অতএব, উপরে উল্লিখিত অভিজ্ঞতার কথাও যেমন মনে আছে তেমনই পরবর্তী অভিজ্ঞতার কথাও বেশ মনে করতে পারি।

এই দ্বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যেই অবশ্য তখনকার দেখা সমস্ত নাটক-অভিনয়কে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। অনেক নাটকের অভিনয়ই দেখেছি যাদের মধ্যে ভাল ছিল, মন্দ-মন্দ ছিল। কিন্তু তখনই বুঝতাম যে অভিনয়ের দ্বারা তাদের মূল্য ছিল আলাদাই। দীর্ঘকাল পরেও তাদের মধ্যে তাদের স্মৃতি হারিয়ে যায় নি। অথচ, তাদের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ বোঝার ক্ষমতা তখন ছিল না। যাই হক, মতামতটা মূল্য

এসে দাঁড়ালেন নতুন জমীনে। নতুন জমীনে তাঁদের প্রতিভা বেমানান বোধ হয়নি নাট্যানুরাগীদের চোখে। বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের উপর কথার মারপ্যাঁচ কিছু কিছু চলতে থাকলেও তাঁরা নাট্যজগতের গতি ব্যাহত হ'ল না।

নবাগতদের রীতি নীতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আগে আবার আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে পূর্ব কথায়। পূর্ববর্তীদের অভিনয়ে যে আদর্শের উল্লেখ করেছি তা যে আমার স্বকপোলকল্পিত ফানুস নয় তা নতুন কথা আরম্ভের মুখে একবার স্মরণ করা দরকার। আরও বলে রাখতে চাই যে উক্ত আদর্শকে অস্বাভাবিক বা অননুসরণীয় বলে অনেকেই মনে করেন না।

ক্যালিফোর্নিয়ার এক প্রখ্যাত পরিচালকের পরিচালনা পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই। পরিচালক গ্রেগরি-লা-কাভা। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে এক সিনেমা পত্রিকায় পড়েছিলাম তাঁর পরিচালনার বিচিত্র পদ্ধতির কথা। চিত্রনাট্য পড়া হচ্ছে, বারবার শিল্পীদের শোনানো হচ্ছে। প্রতি অভিনেতা জেনে নিয়েছেন পুরো কাহিনী, কাহিনীর গতি, জেনে নিয়েছেন যাঁর যাঁর ভূমিকা, ভূমিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জেনেছেন প্রতি দৃশ্যে কাহিনীর অংশ, প্রতি দৃশ্যে যাঁর যা করণীয়, শুধু তাঁদের জানা নেই যাঁর-যাঁর সংলাপ, কেন না পরিচালক কোন সংলাপ কাউকে মুখস্থ করতে দেন নি। আরম্ভ হয় এক একটি দৃশ্যে অভিনয়, সময়োপযোগী চরিত্রোপযোগী সংলাপ তৈয়ারী করে বলতে হয় শিল্পীদের। বিষম পরিস্থিতি। উইলিয়াম পাওয়াল্ শ্রেণীর অভিনেতারাও ভাবিত হয়ে পড়তেন এই পরিস্থিতির মুখে। পরিচালকের উদ্দেশ্য দুর্বোধ্য নয়, তিনি চাইতেন প্রতি শিল্পীকে তাঁর করণীয় ভূমিকার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যেতে।

তারাসুন্দরী সম্বন্ধেও একটি শোনা কাহিনী এই সূত্রে মনে পড়ছে। নাট্যমন্দির তখন খ্যাতির শীর্ষে। তারাসুন্দরী কলকাতায় নেই, নাট্যজগৎ থেকে দূরে তাঁর ভুবনেশ্বরের বাড়িতে নিরালায় দিন কাটাচ্ছেন। এক প্রভাতে সবিস্ময়ে প্রাচীর পত্রে ঘোষণা দেখলাম—নাট্যমন্দিরে 'জনা' নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী।—শুধু আমি নয়, অনেকেই বিস্ময়বোধ করেছিল। কেন না, আমাদের শোনা ছিল তারাসুন্দরী এই দীর্ঘকাল ব্যাপী অভিনেত্রী জীবনে 'জনা'র ভূমিকায় কোনদিন নামেন নি, নামতে স্বীকৃতও নন। তাঁর সহসা মত পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গিয়ে যা শুনেছি তা বেদনাদায়ক এবং বিস্ময়কর। কয়েক মাস পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে, আর সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছে শিল্পীর মত পরিবর্তনে। শিশিরকুমারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বীকৃতি জানিয়েছেন 'জনা'র ভূমিকা অভিনয়ে।—মনে আছে সেই অভিনয়, মনে আছে পুত্রশোকাতুরা 'জনা'র সেই আলাময় ব্যঞ্জনা 'ধূ ধূ জ্বলে জনার অন্তর—।' মন্ত্রমুগ্ধের মত ছিল প্রেক্ষাগৃহ। অভিনয় শেষে বেরিয়ে আসার মুখে কানে এল এক ভদ্রলোকের অর্দ্ধস্বগতোক্তির মত মন্তব্য 'যেন বাগ্ময় অবনীন্দ্রনাথের আর্ট, যতই শুনছি ডুবে যাচ্ছি আরও গভীরে'।—পূর্বে শোনা সংবাদের সত্যতা যাচাই করে দেখিনি, দেখার আগ্রহও ছিল না, নিশ্চিত উপলব্ধি করেছি অভিনয়ে নাট্যসম্রাজ্ঞীর আদর্শনিষ্ঠা। বহুকাল পরে, মাত্র

সেদিন মঞ্চজগতের তৎকালীন খ্যাতনামা সংগঠক ও প্রযোজক শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র গুহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উক্ত প্রচারের ভিত্তি সম্বন্ধে। উত্তরে তিনি বললেন, "কথাটা তখন চালু হয়েছিল খুবই, কিন্তু ওর মধ্যে কতখানি সত্য ছিল আমিও তা বলতে পারবো না। তবে, হাঁ। তার আগে তিনি কখনও ঐ পার্ট নিয়ে নামেন নি।"

কিন্তু সম্প্রতি যে কালের আলোচনায় এসে পৌঁছেছি সেকালের অনেকেই বিশ্বাস করতেন না ঐ অভিনয়ে ঐ আদর্শ পালনের সম্ভাব্যতায়। অভিনয় ব্যাপারটা যখন অভিনয় আগাগোড়াই কৃত্রিম, সেরূপ ক্ষেত্রে মনকে নাটকীয় চরিত্রে ডুবতে দিলে সুষ্ঠু অভিনয়কেই ক্ষুন্ন করা হয়। ঐরূপ আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের 'ন্যাচারাল এক্টিং' নিয়ে বহু হাসিঠাট্টাই তখন শোনা যেত!

যে আদর্শ অনুসরণ প্রায় প্রতিভাসাপেক্ষ নতুন যুগবাদীরা তার উপর আস্থা না রেখে সুচিন্তিত পন্থায় নাটককে সর্বাঙ্গীণ সফল করে তোলার দিকে মন দিলেন। নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম না হয়েও তাকে যে কৃত্রিম পন্থায় দর্শকের চোখের সমুখে জীবন্ত বলে প্রতিভাত করানো যায় তার প্রমাণ দিতে সক্ষম হচ্ছিলেন ক্ষমতাবান শিল্পীবৃন্দ। এই পন্থায় প্রয়োজন হত নানাবিধ মুদ্রা অভ্যাসের যার দ্বারা বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি দেখানো যায়, প্রয়োজন হত স্বরক্ষেপণের কৌশল আয়ত্ত করার। প্রবেশ-প্রস্থান, চলন-বলন পূর্ব থেকে ছক কাটা করে আয়ত্ত করতে হত অভ্যাসের দ্বারা, যেন রঙ্গে এসে অভ্যস্ত কোন অবস্থায় পড়তে না হয় কোনো অভিনেতাকে। অভিনয়-শিক্ষা বলতে যা বোঝা যায় তৎকালে নিষ্ঠার সঙ্গে সেই শিক্ষার প্রচলন ছিল রঙ্গমঞ্চে। কিরূপ বাচনভঙ্গিতে ব্যক্ত হবে সংলাপের অর্থ, কিরূপ সজ্জা ও চলন-বলনে প্রকাশিত হবে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তা' যত্ন সহকারে আয়ত্ত করা হত অনুশীলনের দ্বারা। ভিন্ন মতাবলম্বীর আপত্তির উত্তরে স্মিত হাস্যে বলতেন গুণীরা "Symptom is the disease, মুদ্রা ও বাচনের সাহায্যেই দেখানো যায় নাটকীয় চরিত্রের যথার্থ রূপ"। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের দৃশ্যগুলোতে মনকে সাময়িকভাবেও চাণক্য ভাবাপন্ন করার চেষ্টা না করে, যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী ও বাচন কৌশলের দ্বারা চাণক্য চরিত্রের রূপায়ণই অভিনয়কলার আদর্শ। চাণক্যের কূটবুদ্ধি ও স্নেহপ্রবণতা দেখাবার জন্য প্রয়োজন হয় না মনকে কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ও স্নেহপ্রবণ কল্পনা করার, শুধু প্রয়োজন এমন মুদ্রা প্রদর্শনের যা কূটবুদ্ধিদ্যোতক এবং এমন চোখের দৃষ্টি ও বাচন কৌশলের যা স্নেহপ্রবণতার পরিচায়ক। অভিনয়ে এই দ্বিবিধ আদর্শের মধ্যে যে বিপুল ফারাক তা'ত সহজবোধ্যই, এমনকি দ্বিবিধ অভিনয়ের পার্থক্য বুঝতেও কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় যাঁরা দানিবাবু ও শিশির বাবুকে দেখেছেন তাঁরা দ্বিবিধ অভিনয়ের পার্থক্যটা উপলব্ধি করেছেন বলেই মনে হয়। শিশিরবাবুর অভিনয়ে পেয়েছি যোগেশ-চরিত্রের বিশ্লেষণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি, পরিণতির দিকে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া। আর, দানিবাবুর অভিনয়ে দেখেছি—একজন যোগেশকে, নাট্যবিচারে সাহিত্যবিচারে সেই যোগেশ প্রফুল্ল-নাটকেরই যোগেশ কিনা সন্দেহ যদিও বা করা যেত বা যা করাও হয়েছে, তবু নেহাৎ কূটসমালোচককেও বলতে হয়েছে 'যাঁকে দেখছি সে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নয়, এ এক যোগেশ ঘোষ'। "ওহে একটি পয়সা

দাওনা", "সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। গেল আমি তা কি করব। আহা সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" প্রভৃতি বাচন, বা স্ত্রীকে লাথি মেরে বাক্স নিয়ে যাওয়া, কিম্বা শেষদৃশ্যে যোগেশের প্রবেশ—এইগুলি স্মৃতিতে এনে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না দ্বিবিধ অভিনয়ের ধারা। আর্টথিয়েটার প্রযোজিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে যাঁরা 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় প্রশংসা করেছেন চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অহীনবাবুর অভিনয়, পূর্ণেন্দুর ভূমিকায় দুর্গাদাস বাবুকে। কিন্তু, তাঁরা কি বলবেন রসিকের ভূমিকায় অপরেশ-বাবুর অভিনয়কে ?

উনিশ-শ সাতাশ কিম্বা আটাশ সালে, ঠিক মনে নেই, হাডিঞ্জ হোষ্টেলে এক অনুষ্ঠানে শুনেছিলাম শিশিরকুমারের মন্তব্য। তিনি বলছিলেন, "দানিবাবু যখন উপর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'স্বর্গ হতে নেমে আসে নর-নারায়ণ' তখন সামনের আর্টিস্টকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় সত্যিই কেউ নেমে আসছে কিনা। অথচ তাঁর বিশেষ কিছু করতে হয় না। অবশ্য ঐ কথার মর্ম দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্ম আমাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, মুখ-ভঙ্গী, বলার কৌশল হিসাব করেই প্রয়োগ করতে হয়।" অন্যত্র এই প্রসঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন "রাম বেশে আমি যখন 'কার কণ্ঠস্বর-কার কণ্ঠস্বর' বলে বেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত লবকে ধরে আবৃত্তি করি 'সেই নীলনলিন নয়নদুটি' ইত্যাদি তখনও আমার সম্পূর্ণ খেয়াল থাকে ফোকাস-আলোর কার্য্যকারীতায়, বুঝে-সুঝে দেহ ও মুখভঙ্গীকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করি। —নিজেকে হারিয়ে ফেলি না অভিনয়ের মধ্যে"।—কথাগুলি তাঁর জবানি থেকে উদ্ধৃত নয়, তিনি যে-কথা আরও কয়েকবার বলেছেন তার মর্মার্থ নিয়েই কথাগুলি আমি বসিয়েছি।—সংক্ষেপে বলা যায় এইরূপ অভিনয় পদ্ধতি শুধু বাংলার রঙ্গমঞ্চে নয় যে সব দেশে নাট্যাভিনয় উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল আমাদের বহু আগে সেই পাশ্চাত্যেও অনুসৃত হয়, অনুশীলিত হয় এই পদ্ধতি।

কিন্তু, পূর্ব ঐতিহ্য অনুসরণেও যেমন অসুবিধা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল এই নতুন পদ্ধতি অনুসরণেও ক্রমে এসে যাচ্ছিল লক্ষণীয় ত্রুটি।—সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তৎপূর্বে উল্লেখ করতে চাই নতুন পদ্ধতিতে নাটক প্রযোজনায় সামগ্রিক সফলতার প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনায় সফলতার কথা বলছি। অভিনয়ে পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা, নাট্য-কাহিনীর দেশ-কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ, তায় সঙ্গীত-নৃত্য পরিকল্পনা এই যুগের নাট্যপ্রযোজনার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। সমগ্র নাটকের সর্ব অঙ্গের মধ্যে সমতা রক্ষা করার রীতি পূর্বযুগের অভিনয়ে প্রাধান্য পায় নাই। সেকালে বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি ঢিলাঢালা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পূর্বযুগের ভাঙা আসরের দিনে যে দৃশ্য সজ্জা নৃত্য-গীতকে বিশেষ চমকপ্রদ করার প্রয়াস ছিল সেখানেও সামগ্রিক সঙ্গতি রক্ষার পরিকল্পনা ছিল না। ছিল দর্শক আকৃষ্ট করার চটকদার পন্থা। অনেকেরই হয়ত মনে আছে এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগে পার্শীথিয়েটার জমে উঠেছিল বাংলার মঞ্চে। কিন্তু আলোচ্য যুগের মঞ্চ ছিল আলাদা পথের অভিযাত্রী। সমগ্র অভিনয় যেন সুরবাঁধা ঐক্যতান। কোন একটি অংশের উপর বেশী গুরুত্ব দিলে ঐক্যতানের পক্ষে বাধা বলে বিবেচিত হত।

সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার আবার মুস্কিলও এই যেমন-তেমো অভিজ্ঞতাই হোক তার মধ্য থেকে দানা বেঁধে ওঠে কোন-না-কোন মত। প্রক্রিয়ার ফলে যে মতামতই ব্যক্ত হয়ে পড়ুক তা আমারই অভিজ্ঞতা লব্ধ, সুতরাং তার দায়িত্ব নেহাৎ আমারই।

তথাপি দু-চারজন অভিজ্ঞের সঙ্গে আলোচনাও করেছি। শ্রীপ্রবোধ গুহ ও একস্কালের প্রযোজক সুধীর গুহের সঙ্গে ত দীর্ঘ আলোচনাই হয়েছে। পূর্বেও কোন-কোন প্রখ্যাত শিল্পীদের মত মনোযোগ দিয়েই শুনেছি। এই সব আলোচনার মধ্য থেকেও সংগ্রহ করেছি তথ্য যার সাহায্যে আমার মত দানা বেঁধে উঠতে পেরেছে। আমার অভিজ্ঞতার মতকে নির্ভুল প্রমাণের প্রয়োজন অবশ্য এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু নয়। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলছি।

উনিশশো বাইশ, তার কিছুটা এপাশের কিছুটা ওপাশের কাল নিয়ে ছিল নবআন্দোলনের যাত্রারম্ভ। নাট্যমন্দির ও আর্ট-থিয়েটারের উল্লেখও আগেই করেছি। পূর্ববর্তী ভাঙ্গা আসরের যে অ-দিন তার ভুক্তভোগী ছিল মিনার্ভা মঞ্চও, সেখানেও নবধারার বার্তা নিয়ে এসেছিলেন রাধিকানন্দবাবু। এবং যতদূর মনে পড়ে নরেশ মিত্র মহাশয়ও আর্টথিয়েটারে যোগ দেওয়ার পূর্বে মিনার্ভায়ই যোগ দিয়েছিলেন। পূর্বেই বলেছি, আবারও কথাটা জানিয়ে রাখতে চাই যে নবযুগ আরম্ভের পূর্ব থেকে যে সকল শিল্পীরা মঞ্চে ছিলেন, এবং নবাগত শিল্পীরা, তাঁদের প্রতিজনকে মাপকোক করে আলাদা-আলাদা শ্রেণীতে নিশ্চিত ভাগ করা যায় না। দুই দিকেই এমন অভিনেতাও ছিলেন যাঁরা প্রত্যক্ষ প্রভাব ব্যতীতও অন্যদের অভিনয়কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু সামগ্রিক অভিনয়-ধারা।

মঞ্চের রাজ্যে নবজীবনের যে জোয়ার এসেছিল বিপুল সম্ভাবনার কল্লোলে তার জোর ছিল উনিশশো উনত্রিশ কি বড়জোর ত্রিশ পর্যন্ত। প্রতি সংস্কার ইতি-মধ্যেই শিল্পীদের স্থিতিকালে অনিশ্চয়তা এসে পড়েছিল। কোনো সংস্থার নিশ্চিত সংহতির উপরই নাট্যানুরাগীদের ভরসা আর ছিল না। আর্টথিয়েটার, কিছুকাল দুই মঞ্চ হাতে ও মনমোহন এক সংস্থাভুক্ত রেখে তাদের প্রভাবের প্রসারতা আর স্থিরতার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সংস্থার গঠনে, বরং তদ্বারা ভাঙ্গন লাগার পথই প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল। সংস্থা পূর্ব গৌরবে আর ফিরে যেতে পারেনি, অস্থির অবস্থা প্রায় তেত্রিশ সাল পর্যন্ত ছিল। নাট্যমন্দির যথাসাধ্য যত্ন নিয়ে তার নতুন আবাসস্থল কর্ণওয়ালিস মঞ্চে কবিগুরুর 'বিসর্জন' ও শেষ পর্যায়ে 'তপতী' পাদপীঠের সমুখে কিছু কালের জন্ম উপস্থাপিত রেখে ছেড়ে দিল বাংলার মঞ্চ। শিশিরকুমার তাঁর পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত সম্প্রদায় নিয়ে প্রায় বছর দুই আমেরিকায় কাটিয়ে বোধকরি উনিশশো বত্রিশে রঙমহল মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নিয়ে। খুব বেশীদিন সেখানেও নয়, এক দেড় বছর পরে এলেন স্টার মঞ্চে। দু' চার বছর 'বিরাজ বৌ' 'সরমা' 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ রেখে সম্প্রদায়ের বা আরও স্পষ্ট কথায় ঐতিহ্যের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলেন উনিশশো ছত্রিশ পর্যন্ত। 'শ্রীরঙ্গম'-এর আরম্ভত তার দীর্ঘকাল পরের ইতিহাস। নাট্যজগতের মঞ্চ তখন ঘুরে চলেছিল নতুন পরিস্থিতিতে।—কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়।

প্রখ্যাত শিল্পীরা অভিনয়ে যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার আকর্ষণ শিথিল হয়ে পড়ায়ই তাঁদের সংস্থার জীবনে এসেছিল অনিশ্চয়তা। নবপদ্ধতির ত্রুটিই কেবল সংস্থার জীবনে অনিশ্চয়তা আনেনি, পদ্ধতির পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সংস্থাকে দুর্বল করেছিল। এই পদ্ধতির অভিনয়ে পরিচালনা প্রযোজনার ক্ষেত্রে শৈলীর ঐক্য মৌলিক প্রয়োজন। এই দিকের বিচারে শিশিরসম্প্রদায় অনুকূল পরিবেশে ছিল। কেননা সেখানে একক নেতৃত্ব ছিল শিশিরকুমারের উপর। অন্য সংস্থায় তা ছিল না। সেই সব ক্ষেত্রে অভিনয়কৌশলের বিভিন্নতায় শৈলীর ঐক্যও যেমন রক্ষিত হত না। আবার ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলিও প্রায়শঃ বাঁধাসুরের পক্ষে সহায়ক হয় নাই। কিন্তু, একক নেতৃত্বের প্রভাবও প্রতিনাটকে, প্রতি চরিত্রে এবং প্রতিরজনীতে আশানুরূপ সাফল্যের পক্ষে সহায়ক হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। বিশেষতঃ, শিশিরকুমারের মত জ্যোতিষ্কের পাশে অন্য নটের প্রভা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভই মনে হত। বাঁধাসুরের পক্ষে উক্ত পরিস্থিতি কাম্য নয়। অথচ যে পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছিল তার পক্ষে বাঁধা সুর অপরিহার্য।—অবশ্য এই তৃতীয় ত্রুটি খুব বিঘ্নকর বলে গণ্য নাও হতে পারে।

লক্ষণীয় ত্রুটি ছিল অভিনয়ে বাচনরীতি ও অঙ্গভঙ্গীর আতিশয্য। কিন্তু, এই পদ্ধতির অভিনয়ে ভাবের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তির কারণে আতিশয্য আসা প্রায় অনিবার্য। এখানে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে মগ্ন হওয়ার প্রশ্ন নেই, প্রয়োজন হয় আবৃত্তির প্রতি অংশকে অর্থপূর্ণ করে তোলার, এবং ভাবপ্রকাশের মুদ্রাগুলি স্পষ্ট প্রকাশের। সুতরাং ক্রমশঃ অভিজ্ঞতায় উত্তরূপের অভিনয় দর্শকের চোখে শুধু আতিশয্য বোধ হওয়াই নয়, প্রাণহীন বোধ হতে আরম্ভ হয়েছিল। এমনকি এই পর্যায় সুঅভিনয় বুদ্ধির বিচারে অনেকক্ষেত্রে প্রশংসা পেলেও অন্তরে সাড়া তুলত না। আরও একদিকের ত্রুটিও ছিল। এই পদ্ধতির অভিনয় দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে তখন বেরিয়ে আসত সমালোচকের শ্রেণী, মোহাচ্ছন্ন দর্শকের দল নয়। ফলে, মঞ্চের প্রতি অন্ততঃ সাধারণ লোকের আকর্ষণ লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছিল।

কিন্তু এমন মত কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয় যা বাচন ও মুদ্রাশিক্ষা তথা অভিনয়শিক্ষা সার্থক অভিনয়ের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে। পূর্ববর্তী নাট্যাভিনয় নতুন পদ্ধতির অভাবে যে সামগ্রিক সাফল্যে পৌঁছাতে পারেনি তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, নতুন পদ্ধতির অভিনয় শিক্ষার সঙ্গে নাট্যচরিত্রকে অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ না করা পর্যন্ত অভিনয় কৃত্রিম অভিনয়ই থেকে যাবে। যা কাম্য নয়। আচরিত পদ্ধতির অভিনয়কে বলা যায় বিশ্লেষণাত্মক, ইংরেজিতে বলি analytical। তেমন অভিনয়ে হৃদয়ে সাড়া জাগে না। পূর্বযুগের ও আলোচ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সংশ্লেষণই প্রয়োজন, ইংরেজিতে যা synthesis। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হলেও উল্লেখ করতে দ্বিধা করব না যে বর্তমান যুগে নাট্যআন্দোলনে কাব্যপন্থারই রেখা লক্ষ্য করা যায়। পেশাদারী মঞ্চকয়টি এখনও প্রয়োজনীয় আঙ্গিকের উপর ভরসা স্থাপন করে চললেও তাদের বাইরে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তা সংশ্লেষণের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। সম্পূর্ণ আলাদা এক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে রবীন্দ্রপ্রতিভার উল্লেখ কোথাও

করিনি। কিন্তু, তাঁর পরিচালিত অভিনয় যে উপস্থিত পদ্ধতিরই নির্দেশ দিয়েছিল তা' এখনও স্পষ্টই স্মরণ করতে পারি। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রসঙ্গ মুলতুবী থাক।

ভাবছি সেদিনের সেই অভিনয় পদ্ধতির কথা। তার গতি বা তার প্রভাব শিথিল হওয়ার জন্য অনেকে অহেতুক দায়ী করেন ছায়াচিত্রকে। অভিনয়ে কৃত্রিম যে-প্রক্রিয়া তাও নাকি ছায়াচিত্রের দান। আমার ত তা মনে হয় না। ছায়াচিত্রের বহুল প্রসার যে সব দেশে সেখানে মঞ্চের মূল্য কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। বরং, ছায়াচিত্রে যে অভিনয় ধারা তা মঞ্চের অভিনয়কে বরং কাব্যরীতিরই নির্দেশ দিচ্ছে। রূপালী পর্দায় অভিনয়ে অভিব্যক্তি একরূপ অচল, স্বাভাবিকতা আনয়নের দিকেই তার লক্ষ্য। আলোচ্য যুগের অনেক প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা'ও রূপালী পর্দায় সমাদর পায়নি আতিশয্যতার কারণে আর অনেকে সযত্নে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন নতুন শৈলীতে। পর্দা মঞ্চের কিছু অনিষ্ট ঘটিয়েছে বলেত মনেই হয় না।

কেনইবা হবে? পর্দায় এমনধারার অভিনয়ও দেখেছি যা পূর্বে আলোচিত আদর্শনিষ্ঠাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ছায়াচিত্রে অভিনয়ের পক্ষে কৃত্রিম প্রক্রিয়া নাকি অপরিহার্য, এবং উক্ত কারণে অভিনয়ে ভাবাবেগ পরিহার্য বা অপ্রয়োজনীয়। পর্দার যা প্রত্যক্ষ ছবি তা' ভুল দেখার সামিল।—হবেও বা! এমন একটা আভাষ সত্য আমার মনেও যে না উঠেছিল তা' নয়। কিন্তু বেশী দিন তা পুষে রাখতে পারি নি। প্রথম ফাটল ধরালো 'পিকচার পোষ্ট' সাপ্তাহিক পত্রে লুই রেনারের একখানি ছবি। লুই রেনার ইতিমধ্যে 'গ্রেট জিগ্‌ফিল্ড' ও 'গুড আর্থ' চিত্রে অভিনয় দ্বারা দু'বার Academy পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সাপ্তাহিকে যা দেখেছি তা ছবি নয়, ফোটোর প্রতিলিপি। হাতে চিবুক রেখে তন্ময় হয়ে শুনছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর প্রিয় এক সুরকারের symphony—নীচে ছবির পরিচয়ে লেখা আছে, অভিনয়ে অবতরণের পূর্বে মনকে ভাবময় করে নিচ্ছেন।—কিন্তু, কেন? তাঁর মত অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর ভাব-প্রকাশের কলাকৌশল ও অভ্যস্তাধীন থাকারই কথা।—হয় পূর্ব বিশ্বাসে ফিরে যেতে হয়, না হয়ত উল্লিখিত সংবাদকে প্রচারের ছলনা বলেই ধরে নিতে হয়।—কিন্তু পরবর্তী সংবাদে তেমন সন্দেহের অবকাশও ছিল না। সংবাদটি স্পেন্সার ট্রেসি সম্বন্ধে। তিনিও Academy পুরস্কার দ্বারা বার দুই সম্মানিত হয়েছেন। এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনায় কথাটা ছিল, তাঁর জবানিতেই বলছি 'I never act, I live in the character.' শুধু স্পেন্সার ট্রেসিই নয়, আরও অনেক প্রখ্যাত শিল্পীই ব্যক্ত করেছেন অনুরূপ আদর্শ। মস্কো আর্ট থিয়েটারের ষ্টানিস্লাভস্কীর মতও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মনে পড়ে 'Double Life' চিত্রনাট্য। অভিনয়ে ঐ আদর্শের প্রয়োগ দেখাতেই যেন তৈরেরী হয়েছিল এই নাটক। নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল এই—মঞ্চজগতের এক প্রতিভাবান অভিনেতাকে 'ওথেলো' নাটকের নামভূমিকায় নামাবার জন্য অতি আগ্রহান্বিত ছিলেন এক প্রখ্যাত প্রযোজক। কিন্তু অভিনেতাকে রাজী করানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত স্বীকৃত হতে হয়েছিল তাঁর একান্ত আগ্রহে। কেননা, সুযোগ্যা স্ত্রীর আগ্রহ ছিল ডেস্‌ডেমোনার ভূমিকা অভিনয়ে। কয়েকটা রাত্রির

অভিনয় হয়েও গেল। কিন্তু অভিনয়ের পর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তেন অভিনেতা।—এল সেই চরম রাত্রি। অভিনয়ে ডেসডেমোনাকে গলা টিপে হত্যার দৃশ্য সে-রাত্রে অকস্মাৎ শেষ হল ডেসডেমোনারূপী তাঁর স্ত্রীর হত্যায়। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে অভিনেতা শুধু জানাতে চেষ্টা করেছিলেন যে এই আশঙ্কাই তাঁর মনে ছিল।—থাক না অভিনয়ন শেষ, তবু আদর্শের রূপায়ণে কোন অস্পষ্টতা নেই।

প্রবন্ধে সমাপ্তি টানার আগে এক শিলালিপির প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি। এক প্রাচীন রাজা কোন এক গুণী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেছিলেন শিলালিপিতে যার পরিচয় লেখা ছিল 'লুপদক্ষ' শব্দে। এই শব্দটির বর্তমানকালোপযোগী বা সংস্কৃত রূপ কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলেছিল অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক 'নাচঘরে' আমার তখন ছাত্রাবস্থা, Phonology ও নয়ই, কোনরূপ ভাষাতত্বই আমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে ছিল না। অনেকের মতে শব্দটা নতুন রূপ পেয়েছিল 'রূপদক্ষ', অর্থাৎ আর্টিষ্ট। কিন্তু আমার মায়া পড়েছিল 'লুপদক্ষ' শব্দটার উপর! নিজেকে লুপ্ত করে নব-নব চরিত্র রূপায়ণে যে দক্ষ তারই পরিচয়বোধক শব্দ এই 'লুপদক্ষ'। সোজা কথায়, ঐ পুরস্কৃত ব্যক্তি হয়ত ছিলেন কোন এক অভিনেতা। গুণগ্রাহী রাজা হয়ত এক অভিনেতাকেই পুরস্কৃত করেছিলেন। 'বহুরূপী' শব্দেও ত আছে অনুরূপ অর্থ। তার যদিই বা রূপদক্ষ বা আর্টিষ্ট বলতে চাই অভিনেতাও ত আর্টিষ্ট। অন্যান্য শ্রেণীর আর্টিষ্টের মত তারও আছে স্বরাজ্য—অর্থ স্বাতন্ত্র্য।

'নব-নাট্য আন্দোলন'—এ নামের শেষ হোক

। সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ।

মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এই বঙ্গদেশে মধ্যচিত্ত মানুষের প্রতাপ প্রবল। নদীয়ার যুবক নিমাই অতি-তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্ত ছিল, তাঁর কূটতর্কের প্রভাবে বহু পক্ক শাস্ত্রধারী ভূপাতিত হোত। সেই দুরন্ত নদের নিমাই বুদ্ধিঘাত পথে হেঁটে হেঁটে বহু ত্যাগ বহু তিতিক্ষার পরীক্ষার পর আপন চরিত্রে এক সমন্বয়ে সমাধান খুঁজে পেয়েছিলো। অথচ বাংলাদেশ—আজকের এই বাংলাদেশ—ঊর্ধ্ববাহু ন্যাকা এক ভাবগলা মানুষের চরিত্র এঁকেছে থিয়েটারে সিনেমাতে। এঁকে ঢের পয়সা পেয়েছে, কারণ এই-ই হোল আমাদের মনে চৈতন্যের ভাবরূপ। ন্যাকা চৈতন্যের।

ঈশ্বরচন্দ্রের পরাক্রান্ত বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব আমরা সবাই যেন একজোট হয়ে অনুরোধে অবহেলা ক'রে দয়ার সাগর বলে আর এক ভাবরূপ রচনা করেছি। আর এক প্রচণ্ড দৃষ্টান্ত, ৮ই তারিখে মে'র রবীন্দ্র-হত্যার সংকল্প গ্রহণ ক'রে গান গাই, নাচি আর নাটক মঞ্চস্থ করি বৎসরে বৎসরে।

কিন্তু আমরা তো একা নয়। মাঝে মাঝে কী জানি কেমন ক'রে অসম্ভব বীর্যবান্ সন্তানও জন্মেছে। যে মানুষ দৃঢ়চিত্ত, যে মানুষ বুদ্ধিমন্ত, নির্ভীকের মতো যে মানুষ লড়াই করেছে নিধাসক্ত ভাবাপ্লুত যতো তার পর-হতে-দূরতর স্বজনের সাথে।

এই দুই ধারা আছে। এই দুই ধারা বাঙালীর জীবনেতে সমান্তরাল স্রোতে ইতিহাস রচনা করেছে। আমাদের নাট্যানন্দ ইতিহাস—যেহেতু সংখ্যাগুরু মানবের চিত্তবিনোদন ক'রে বেঁচে যেতে পেরেছিল বলে—অবশ্য এ বাঙালীর সংখ্যাগুরু মানুষের ইতিহাস হোল, এই মধ্যচিত্ততার ইতিহাস। অমেয় শক্তিধারী গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে এলো শেষে "বিল্বমঙ্গল"-এর মতো ধর্মীয় নাটক। তখন এ শহরে ঠাকুর বাড়ীর মতো পদার্থ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নামধেয় কোনও এক সাহিত্যিক— ছেড়ে দিই তাঁর কথা, উনি তো মানুষ নয়, প্রকৃতির freak। [illegible] যেটুকু দৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের ছিল, সে স্বচ্ছতা আদপে ছিল না শ্রীঅমৃত বোসের। যা কিছু প্রগতিশীল আন্দোলন ছিল [illegible] ব্যঙ্গ ক'রে শ্যামবাজারী কষ্টিলোকে রসরাজ নাম নিয়ে অধিষ্ঠিত আছিলেন তিনি। আর আজও তাই-ঐতিহ্যের নাম নিয়ে তাঁকেও প্রণম্য বলে স্বীকৃতি জানাতে নবনাট্য আন্দোলনে বিচক্ষণ নেই কোনও।

অপূর্ব মিলনস্থল আমাদের এই জন্মভূমি, 'এই গঙ্গার মোহানা তীরে—'।

সংস্কৃতির বহমান ইতিহাসে দুই হয় মৌলিক বাস্তবকে ধারণা করতে গিয়ে অল্প কিছু লোক যতোই চিন্তাকে শোধন ক'রে বুদ্ধিদীপ্ত দর্শনের পথে হেঁটে যেতে প্রয়াস পাক না কেন তবু সেই আদিম অবস্থাকালে

অগ্নিকুণ্ড ঘিরে ব'সে সেই যে অজস্রবার একঘেয়ে একই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মানুষের দশাপ্রাপ্তি হোত, সেই বুদ্ধিহীন তমিস্রার আঁধারে গাহন করে দশাপ্রাপ্ত হ'তে চায় আজও এই প্রদেশের সংখ্যাগুরু লোক। তাদের বিচার নেই, বুদ্ধি দিয়ে বোধ নেই কোনও। অন্ধ গন্ধমূষিকের মতো শুধু অনুভবে অনুভবে অন্ধকার থেকে আরও ভিতে অন্ধকার খুঁজে খুঁজে চ'লে গিয়ে নিমজ্জিত হওয়া। এ জাতের কাছে বিজ্ঞানের বাণী মিছে, তর্কশাস্ত্রের বক্তৃতাও মিছে, সত্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বন্ধ ক'রে আকণ্ঠ মাতাল হওয়া, সত্য শুধু চক্ষু মুদে বাহু তুলে হরিবোল হরিবোল করা।

এই লবণাক্ত মৃত্যুস্পর্শ লেগে গেছে নবনাট্য আন্দোলনে। 'নবান্ন'-এ আরম্ভ যার 'রক্তকরবী'তে তার হয়েছে সমাপ্তি। আন্দোলন তাকে বলা যায় যে আনে নতুন কথা। আর সেই কথাটাকে বর্ণনা দেবার তরে আনে কোনও নবতর ভঙ্গী। 'নবান্ন' এনেছে সেটা। তার পূর্বে—ইতিহাস খুলে দ্যাখ—এমন নাট্যের কথা কল্পনা করেনি কেউ। নাটক নতুন তার, অভিনয় তেমনি নতুন, দৃশ্যসজ্জা চিন্তাও নতুন। বঞ্চিতের পক্ষ থেকে নাট্যমঞ্চে মুক্তকণ্ঠে সমাজের বিক্ষোভ বর্ণনা—এই তার প্রবল আরম্ভ। তারপর কতো চেষ্টা সুরু হোল। নাট্যবিদ্‌যশঃপ্রার্থী কতো লোক শুধু ঐ হাহাকারটুকু অন্তরে সম্বল ক'রে কতো লোমহর্ষক ঘটনার মাধ্যমে 'নবান্ন'-এর আবেদন ফোটাতে চেয়েছে। হয়নি সফল। কারণ কোনও নবতর দৃষ্টিভঙ্গী আসেনি কোথাও।

সেই চমকতা নিয়ে এলো 'রক্তকরবী'র উন্মোচন। তারও পূর্বে—খোঁজ নিয়ে দ্যাখ—এমন নাট্যের কথা চিন্তায় আসেনি কারো। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার যার ভাষা এতো দীর্ঘদিন ধ'রে অবোধের অর্থরিক্ত নিষ্প্রভ চোখের মুখোমুখি সাদা কাগজের মতো পুস্তকের তাকে তোলা ছিল, দেখা গেল তারই প্রতি শ্লোকে পুণ্যশ্লোক কবি সমাজের বঞ্চিতের পক্ষ থেকে কী নিপুণ চিত্র এঁকে মুক্ত কণ্ঠে নবজীবনের গান সোচ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। আবার চমক ভেঙে দেখলো সবাই,—নাটক নতুন, অভিনয় তেমনি নতুন, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা সমস্তই চমক লাগানো। বঞ্চিতের পক্ষ থেকে নাট্যবস্তু উপস্থাপনার যুগ হোল শেষ। চুয়াল্লিশ সালে বুঝি হয়েছিল 'নবান্ন', চুয়ান্ন সালেতে গেল 'রক্তকরবী'কে পাওয়া। ব্যাস, এই হয়ে গেল শেষ। নব-নাট্য আন্দোলন শুরু যার গণনাট্য থেকে, যারা অন্তরে সমাজকে ভালো ক'রে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছে তাদের দানের শেষ হয়ে গেছে আট বৎসরের আগে।

অথচ এখনই দেখি অলিতে গলিতে নব-নাট্য আন্দোলন ব'লে অজস্র ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে। এরা কারা? এরা আমাদের বাঙালী জাতির সেই অনাক্রান্ত দ্বিতীয় ধারাটি—যেটি হোল সংখ্যাগুরুপ্রিয়। এইবার আসরেতে নেমে নব-নাট্য আন্দোলনে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ক'রে অশ্লীল কুকথা ব'লে, বান ডেকে, কখনো বা অশ্রুপাতে, কখনো বা দ্বিজু রায়-রসরাজ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গাঁটছড়া বেঁধে,—আহা, কি বা অপরূপ বিবিরোধী ভক্তি আমাদের—পথে যেতে যে কোনও মন্দির দেখে ট্রামে বা বাসেতে ব'সে চট্‌ ক'রে চোখ বুজে মনে মনে প্রণামটা দিই, কে জানে কখন কোন্‌ ঠাকুরের হাতে চ'লে যাবে কোন এক বিশেষ দপ্তর—, এইভাবে নিষ্ঠাহীন স্বার্থভীরু চৌর চালনায় নব-নাট্য আন্দোলন কোথায় নেমেছে?

। উনচল্লিশ।

এখনো কি নব আছে কিছু? নাই থাক্, তবু এরা বাঁচবেই। এরাই যে বাঙালীর সংখ্যাগুরু জীবনের ধারা

এবাই তো নাটকে আবার এনেছে পুরানো সেই পেশাদারী অভিনয় ধারা। নতুন বাচনভঙ্গী স্বর প্রক্ষেপণের নতুন কারুকার্য্য কিংবা অভিনয়ে কোনও নব ডাইমেনশন কোথাও দেখিনা। সবই সেই পুরাতন কাপড়ুক থেকে ছিঁড়ে আনা লাগানো হবফ। সবই সেই আবেগভিত্তিক এক বুদ্ধিহীন অভিনয় ধারা। যেন, সঙ্গীতের আবেগেই গান গেয়ে ওঠা যায়, গলা সাধা শুধু অপব্যয় সময়ের চিত্রাঙ্কনে নব আন্দোলন নতুন কৌশল আনে, বেখাঙ্কণের এক নতুন পদ্ধতি, বর্ণসুষমার এক নতুন কাজন সাহিত্যের আন্দোলন সৃষ্টি করে নতুন শব্দের রাশি, সৃষ্টি করে অপূর্ব idiom। কই সেই আশ্চর্য idiom নবনাট্য নামধারী সৌখীন রঙ্গের ক্ষেত্রে।

রূপসজ্জা কই। কই কোনও আলোকের নতুন প্রয়োগ। নবান্ন ও রক্তকরবীর মঞ্চে যা কিছু হয়েছে শ্রেষ্ঠ তারই অনুকরণের পথে চলে আজ এ স্থূল মিছিল।

কাহিনী শুনেছি যখনি যখনি দেশে সমাজকে অধিনায়কের দৃষ্টি কঠোর থেকেছে তখনি তখন মঞ্চপট যৌনব্যভিচার খুব সংযত থেকেছে। এই নবনাট্য আন্দোলন সুরু হয়েছিল সেই পরিশুদ্ধ চিত্তক্ষেত্র হতে। অথচ আজকে! এ আমাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা -অনেক ক্ষেত্রেই এসব ব্যভিচার স্বাভাবিক ব'লে সহজে স্বীকৃত হয়। তবু এরা নব-নাট্য আন্দোলনে কর্মী ব'লে খ্যাত হবে? এদেরই পরিক হবে কাজ ক'রে যাবো আমি? ঈশ্বর বাঁচান। আমি জানি এরা ধ্বংস হবে সমস্ত যাদবের মতো। তখ আবার হবে নতুনের পালা। তখন আবার কিছু নতুন উন্মাদ শুভচিত্ত নাট্যের নামভাগ স্কন্ধে ব'য়ে নিয়ে যাবে যতোটুকু পারে। তারপরে শ্রান্তপেশী শ্লথ হলে আবার তখন বড়ো নতুন যাদব আবারো মুষল হাতে দাঁড়াবে আসরে।

তাই হোক। কিন্তু নব-নাট্য আন্দোলন আর নয়। এ পাপের এখানেই শেষ হোক। নবযুগ শুরু হবে নব নায়কদের সাথে।

মহলার প্রয়োজন কী?

॥ শম্ভু মিত্র ॥

সাধারণভাবে আমরা মহলা দিই কথাগুলো মুখস্থ করার জন্য এবং তারই আনুষঙ্গিক যে সমস্ত ক্রিয়া থাকে সেগুলোকেও অভ্যাস ক'রে নেওয়ার জন্য।

এছাড়া যেগুলো আবেগময় অভিনয়ের দৃশ্য সেগুলো যাতে দর্শকদের বিচলিত করতে পারে তার জন্য সেইসব দৃশ্যের মূল অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিজের আবেগ প্রকাশের কয়েকটা প্রয়োজনীয় কৌশল অভ্যাস ক'রে রাখেন। আর বাকিটার জন্য নির্ভর করেন অভিনয়-কালীন ইন্‌স্‌পিরেশনের উপর।

এর ফলে অভিনেতা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিনয়ের কথা ভাবেন, অর্থাৎ তাঁর আবেগের প্রকাশে কী ক'রে দর্শককে মুগ্ধ বা মোহগ্রস্ত করবেন সেইটাই প্রধান লক্ষ্য থাকে। আর সেইজন্য নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করাটা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না। অথচ নাটকের সত্য প্রকাশ পায় চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কে—, হয় সংঘাতে নয় প্রেমে।

আমাদের দেশে পূর্বে অভিনেতারা প্রায় সকল কথাই সোজা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলতেন। যেন, পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে সে অসম্পৃক্ত। ক'জে কাজেই একজন নট যখন আবেগভরে বক্তৃতা ক'রে যাচ্ছেন তখন অপর নটটি যা ইচ্ছে করতে পারেন, এমন কি—পুরাণো যাত্রায় হোত শুনেছি—একটান তামাকও খেয়ে নিতে পারেন।

এতোটা আজকাল করা হয় না বটে, কিন্তু তারজন্য মূল দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও তফাৎ হয়নি। এখনও তাই স্থির লক্ষ্য থাকে দর্শকদের হাততালির ওপর।

এবং এই হাততালি পাবার উপায়টা কী? হয়তো কাঁধ shrug করার একটা কায়দা, বা ভ্রূ তুলে একটুখানি নিস্তব্ধ থেকে হঠাৎ ঠমক দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা। আর নয়তো কান্নার উচ্ছ্বাস। অর্থাৎ হয় কায়দা নয় সেন্টিমেন্ট।

এর ফলে খুব বুদ্ধিধর্মী নাটকও অভিনেতাদের হাতে সেন্টিমেন্টাল হয়ে যেতে পারে। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাষা অনেকের মুখে ন্যাকাপনার মতো শোনায়।—অথচ সংনাট্য প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য বুদ্ধির মার্গে। এবং সেটার জন্য প্রয়োজন চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, ও পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্পষ্ট ক'রে স্থাপন করা। কারণ নাটকটাই তো ঐ সম্পর্কের মধ্যে। হ্যামলেটের তার পিতার সঙ্গে সম্পর্ক, তার মাতার সঙ্গে সম্পর্ক, ওফেলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক—এই নিয়েই তো নাটক। সেই সম্পর্কে ফাটল ধরলো বলেই তো হ্যামলেটকে আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবনের মানে আবার

নতুন ক'রে ভাবতে হোল। সেটা তো খালি সেন্টিমেন্টের প্রদর্শনে প্রকাশ পায় না, সেটা প্রকাশ পাবে সমগ্র নাট্যের মধ্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের ছন্দোবদ্ধভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার ওপর।

এই ছন্দোবদ্ধতার আজকাল একটা মোটা মানে তৈরী হয়েছে, যার নাম টীমওয়ার্ক।—কঠোর মিলিটারী নিয়মানুবর্তিতায় প্রত্যেকটা অভিনেতাকে চালিত করা যায়। তাতে বাইরে থেকে মনে হতেও পারে যে সমস্ত নাট্য যেন ঘড়ির কলকব্জার মতো অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে হয়ে গেল। এমন কি প্রশংসাও হ'তে পারে যে, টীমওয়ার্ক ভালো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এটা আমাকে তৃপ্ত করে না, মোটা দাগের মনে হয়।

আমার মনে হয় এ পার্থক্য বোঝার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে কোন্ নাট্যাভিনয়ে ডিসিপ্লিন বাইরে থেকে আরোপিত, আর কোথায় বা সেটা অন্তর্নিহিত।

সেই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য আসে যদি সব কয়টি অংশ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝে।

এই পারস্পরিক সম্পর্কটাই প্রকাশ করতে হয় অভিনেতাদের। যেমন ধরা যাক্ ওথেলো। সে যে ডেসডেমোনার প্রেমে একেবারে আপ্লুত সেটা যদি প্রথম দিকে প্রকাশ না পায় তাহ'লে শেষ দিকে সন্দেহে উন্মাদ হওয়ারও যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ওথেলোর অভিনেতাকে স্পষ্ট ক'রে প্রমাণ করতে হবে যে ডেসডেমোনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী। কিন্তু সেটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট ওথেলোর সঙ্গে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট ডেসডেমোনার সম্পর্ক নয়। যে লোক ওথেলো সেজেছেন তাঁর সঙ্গে যে-নারী ডেসডেমোনা সেজেছেন নাট্যের মধ্যে তাঁদের দুজনের কী সম্পর্ক? কারণ, দর্শক তো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য দিয়েই নাটকের চরিত্রগুলো উপলব্ধি করবে।

এইখানে একটা কথা বলা হয়তো খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেক লোক আছেন যাঁরা অভিনয় দেখতে যান নিজের একটা কল্পনা নিয়ে, এবং সেই কল্পনার সঙ্গে না মিললে বড়োই ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি শিল্পসম্ভোগ করতে যান স্বচ্ছদৃষ্টি নিয়ে, তিনি ভাবেন না তাঁর কল্পনার ওথেলো রূপ পাচ্ছে কিনা, তিনি দেখতে চেষ্টা করেন সেই অভিনেতার মধ্যে দিয়ে কেমন ওথেলো প্রকাশ পাচ্ছে।

সেই যে ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশ করবার ক্ষমতা, সেইটাই শিল্পীর।

কিন্তু তিনি যখন মহলা দেবেন তখন দুজন ডেসডেমোনার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের ভিন্নরূপ প্রকাশ পাবে।

ডেসডেমোনা যদি পূর্ণবয়স্কা যুবতীর মতো একটু গম্ভীর হয়, আয়ত দুটি চোখে যদি দৃষ্টি গভীর ও অচঞ্চল হয়, তাহলে তার সঙ্গে প্রেমে পড়বে এক ওথেলো, আর ডেসডেমোনা যদি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ ক'রে থাকে, যদি তার চোখ কেবলই ওথেলোর কাছে আশ্রয় খোঁজে, তার ওপর নির্ভর করতে চায়, যদি সে ডেসডেমোনা মাতৃহীন অবস্থায় বড়ো হয়েছে ব'লে সামাজিক ব্যবহারে অপটু হয়, তাহলে তাকে ভালো লাগবে আর এক ওথেলোর।

নাটকের বাঁধা ছকের মধ্যেই এমনি বহু মুক্তির জায়গা আছে। যেমন কাপড়কে যদি খুব নিকটে এনে বিবধিত ক'রে দেখা যায় তাহলে কাপড়টা জালের মতো হয়ে যায়। লেখা নাটকও তেমনি খুব আলগা একটা জালের মতো। তার মধ্যে ঘটনার ছক থাকে, কিন্তু সেটা ঘটতে পারে অজস্র ভঙ্গীতে।

একটি মেয়ের একদিন উপলব্ধি হোল যে তার সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই সে মানুষ হিসাবে তার নিজের পূর্ণতা অর্জন করতে গেল। এই বক্তব্য অজস্রভাবে প্রকাশ করা যেত। কিন্তু ইবসেন লিখেছেন 'এ ডল্‌স্ হাউস'। আমাদেরই বাংলা দেশের একজন খ্যাতনামা নাট্যকার একদিন বলেছিলেন যে 'এ ডল্‌স্ হাউস' নাটকে ডাঃ র‍্যাঙ্ক-এর চরিত্রটি অকারণ আনা হয়েছে, ওর বা ওর অসুখের কাহিনীটা এ নাটকে অসংলগ্ন। তিনি লিখলে নিশ্চয়ই ভালো একটা নাটক লিখতেন, কিন্তু ইবসেনকে এই গল্পটা বলবার জন্যেই ডাক্তারের চরিত্রটি আনতে হয়েছে।

তেমনি যে অভিনেতৃ সম্প্রদায় এ নাটক অভিনয় করবেন, বা যে নির্দেশক এ নাটকের প্রযোজনা করবেন তাঁদের হাতেই এ নাটকের বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাবে।

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে যে নোরা প্রকাশ পায় তার মিথ্যাভাষণের ধরণ একরকম। আর এক নোরা হয়তো আর এক রকমে মিথ্যা বলবে। এবং তাইতেই অনেক তফাৎ হবে।

মিথ্যাভাষণের উদ্দেশ্য হোল অপর পক্ষকে বিশ্বাস করানো। তাই আবার এক একজন লোকের কাছে এক একরকম ভাবে মিথ্যা ব'লে থাকি, এবং সেই বিভিন্নতা নির্ধারিত হয় সম্পর্কের বিভিন্নতা থেকে। এবং সেই সম্পর্ক নির্ধারিত হয় চরিত্রগুলোর পটভূমিকা থেকে। এবং সেই পটভূমিকা প্রকাশ পায় অভিনেতাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের উপরে। সেই বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে ও বিকর্ষণে চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক গঠিত হয়, যে সম্পর্ক আবার নাটকের অবধারিত ঘটনাগুলোকে অনিবার্য ক'রে তোলে।

সেই সম্পর্কের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা, তাকে স্পষ্টভাবে নিজেদের চেতনায় স্থাপন করা, এইটাই হোল মহলার উদ্দেশ্য। মাত্র সংলাপগুলো বা ক্রিয়াগুলো মুখস্থ করার জন্য নয়।

অভিনেতার কাজ হোল অন্য চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝানো। নাটকে কেবল তার ইঙ্গিত থাকে, সেটাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট করা ও ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ করতে পারাটাই অভিনয়। ছেলে মারা যেতে মা কাঁদলো। এটা একেবারেই একটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন। এর দ্বারা দর্শক অভিভূত হয় না। কিন্তু বিশেষ একটি ছেলেকে বিশেষ একটি মা ভালবাসে, তার ভালবাসার ধরনটাও একটি বিশেষ ধরন, সেই ছেলে মারা যেতে মা কাঁদবার আগেই দর্শক ফুঁপিয়ে উঠবে মায়ের কষ্টের কথা ভেবে, কারণ তারা যে স্বচক্ষে দেখেছে এই মা কতো ভালবাসতো সেই ছেলেটিকে।

নাট্যকার অনেক অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন আনতে পারেন তাঁর লিখিত চরিত্রে, কিন্তু অভিনেতার কাজ সেটাকে কংক্রীট ক'রে প্রকাশ করা। রক্তকরবীর নন্দিনী হ'তে পারে একটা আইডিয়া কিন্তু যে

অভিনেত্রী তাকে সর্বাঙ্গে ধারণ করতে পারবে, তাকে নিজের সর্বাঙ্গ দিয়েই প্রকাশ করতে পারবে, তার কাজটাই অভিনয়।

এবং সেই কাজটা জীবন্ত হয় কেবল কথাগুলো ব'লে নয়, জীবন্ত হয় কিশোরের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, অধ্যাপকের সঙ্গে কী সম্পর্ক, রাজার সঙ্গে কী সম্পর্ক এমন কি নাটকে অনুপস্থিত রঞ্জনের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক—এইগুলো মানবিক সংস্কারে প্রকাশ করতে পারলে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। নাট্যাভিনয়েও তেমনি প্রত্যেকটি চরিত্রের ব্যবহার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সেই সম্পর্কের প্যাটার্নটা স্পষ্ট তৈরী করা গেলে যে টীমওয়ার্ক দেখতে পাওয়া যায় সেটা বাইরে থেকে আরোপিত সামরিক নিয়মানুবর্তিতা নয়।

আমাদের লক্ষ্য যদি হয় এমন একটা নাট্যাভিনয় যেখানে প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাদেরই সম্পর্ক থেকে নাটকের সংঘাত উদ্ভূত তাহলে ডিসিপ্লিন বাইরের থেকে না এসে আমাদের বোধসঞ্জাত হবে আর তাতেই সুষমা প্রকাশ পাবে। সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে বোঝবার জন্যই মহলা।

এবং এই সৃষ্টিক্ষেত্রে যে কর্মযোগ চলে সেটা নাট্যকারেরও পরিধির বাইরে। এইখানেই অভিনয় শিল্প হয়ে ওঠে, নইলে কেবল মুটের কাজ হোত।

ম্যারিওনেট্‌ ও মানুষ

॥ কুমার রায় ॥

'—নিজেকে কখনো একলা অনুভব ক'রেছো—রাত জেগে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থেকেছো,—একলা ঘরের মধ্যে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরে কাউকে আর্ত হাহাকার করতে শুনেছো,—দেখেছো তার সারা শরীরের থরথরানি?—কল্পনা কর সেই মানুষ রাতের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে আলো দেখতে পেলো,—আলোময় আকাশের দিকে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। তার পর সেই আত্মমুহূর্তে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সংকল্পবদ্ধ দৃঢ় পদক্ষেপে সবার অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল পথে। তখন দেখা হল ক্ষিপ্ত জনতার সঙ্গে, সেই মানুষ কী করে তার অনুভূতিকে, উপলব্ধ সত্যকে, তার ছটফটানিকে প্রকাশ করবে?—তোমার অভিজ্ঞতায়, কল্পনায়, এই কষ্ট, এই বেদনা উপলব্ধ হয়ে থাকলে তবেই তোমার মধ্যে দিয়েই সেই মানুষটিকে দেখতে পাব। তখন দেখবে অহেতুক চেঁচাতে হচ্ছে না—গলার শির ফুলিয়ে, আবেগকে টুথপেষ্ট এর মত টিপে বের করতে হবে না, কারণ সে লোক মিথ্যাচারণ করছে না, সে তার নিজের কথা ব্যক্ত করছে—নিজেরই বেদনাকে ভাষা দিচ্ছে।'—নির্দেশক তার অভিনেতাকে বোঝাচ্ছেন একটা দৃশ্য—সেই সূত্রেই কথাগুলি বলছেন। তার মধ্যে কল্পনাকে ধাক্কা দিয়ে, তাকে সক্রিয় করে সৃষ্টিশীল ক'রে তোলার প্রয়াসে নিযুক্ত তিনি।'—এতো মেঠো বক্তৃতা নয়, সেখানে তোমার বোধ, তুমি, তোমার যথার্থ আবেগ এগুলোর সঙ্গে কথাগুলো সম্পর্কশূন্য হলেও কাজ চলে যাবে। সেখানে শুধু শব্দের ঝঙ্কারে শ্রোতার মনে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। সেখানে কথাগুলোর ওপর একটা ঝোঁক দিয়ে শ্রোতাকে উত্তেজিত করাটাই তোমার কাজ; তুমি পেশাদার বক্তৃতাবাজ হতে পার, রাজনৈতিক নেতাদের হাতে কলের পুতুল হয়ে বাঁচাতেই তোমার সার্থকতা; ট্রেনের ফেরীওয়ালাদের মত। এখানে শিল্পী হিসেবে তোমার কাজ তোমার ভেতরটাকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ মানুষটাকে দেখতে চাই, শুধু কথা নয়, —নাট্যকারের সংলাপ অনিবার্য হচ্ছে যে অনুভবক্ষম মনে সেই মনের অধিকারী ব্যক্তিটিকে দেখতে চাই।..লোককে ধোঁকা দেওয়া কাজ নয়—নিজের আবেগকে প্রকাশ করা—নিজের গভীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়াটাই কাজ।'—মহলা চলছিল, নির্দেশক অভিনেতাকে কলের পুতুল করতে চাননি—চেয়েছেন শিল্পী হিসেবে সার্থকতার পথে চালনা করতে। সে যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে। সর্বগ্রাসতন্ত্রের একনায়ক নন—সৃজন সমবায়ের যথার্থ কর্ণধার তিনি। স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান, নটসমবায়ের একাত্মবোধ তাঁর লক্ষ্য।

এর থেকে সম্পর্ক নির্ণীত হয় নির্দেশক ও অভিনেতার মধ্যে। থিয়েটার শিল্পের দুটো বৈশিষ্ট্য

এই সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করছে। প্রথমতঃ এ তিলোত্তমাশিল্প নটনরবায়ের একাত্মবোধ থেকে উৎপন্ন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এ প্রযোজনার মূল হল অভিনেতা,—অর্থাৎ মানুষ। নির্দেশকের শিল্পসাধনায় আর পাঁচটা শিল্প-স্রষ্টার-উপাদানের সামিল বলা হলেও সে তার আপন অধিকারেই স্রষ্টা। গোলমালটা বাধল বোধহয় এইখানেই। অখণ্ড অভিনয়শিল্পে—কে শিল্পী ? নির্দেশক যদি দাবী করেন যে তিনিই একমাত্র শিল্পী থিয়েটারের, বাকী আর সব উপকরণমাত্র এবং তাঁকেই সব উপকরণগুলো একত্র সংকলন করতে হয় একটা সমগ্র শিল্প সৃষ্টি করতে তবে এই অভিনেতাকে নিয়ে, এই প্রাণবান উপকরণ সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অরাজকতার প্রশ্ন উঠিয়ে সেটা যে অখণ্ড শিল্পসাধনার পরিপন্থী—তা বলতেই হয়। নাট্যকারের নাটক, চিত্রশিল্পীর মঞ্চসজ্জা, সাজ পোষাক, এই বিভিন্ন উপকরণগুলি বিভিন্ন শিল্পীর সৃষ্ট বস্তু মাত্র এবং এই বস্তু গুলিই নির্দেশক তাঁর প্রযোজিত নাটকের আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু অভিনয় শিল্পীর সৃষ্ট শিল্প, প্রাণহীন বস্তুপর্যবাচ্য নয়—তা মানুষটার সঙ্গেই যুক্ত। কাজেই যদি মেনে নেওয়া হয় যে পরিচালকই একমাত্র শিল্পী থিয়েটারে—তা হলে তাঁর শিল্প উপাদানকে শুধুমাত্র উপাদান হয়েই থাকতে হবে এ দাবী উঠবেই। অভিনেতা যে মারিওনেট্ জাতীয় কলের পুতুল মাত্র তাও স্বীকার করতে হবে।—তখন সেটাই নটশিল্পের আদর্শ বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু আমি অভিনেতা—আমি মানুষ—আমি আপন অধিকারেই স্রষ্টা, শুধু উপকরণ মাত্র নই—তার চেয়েও বেশী কিছু। এ আমার দম্ভ নয়—এ আমার যথার্থ অহঙ্কার। আমি কী করে ভাবব যে পরিচালকের হাতে সূতোর বাঁধন আমার নিয়ন্ত্রক, আমি কী করে মানব যে আমি পুতুল নাচের পুতুল মাত্র।

'পুতুল নাচের' পরিচালক স্বাভাবিক ভাবেই পুতুল-নটের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করতে পারেন। বলতে পারেন যে 'পুতল-নট' সমগ্র সাজ সজ্জার অধীন থাকতে বাধ্য। শৃঙ্খলার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এ শৃঙ্খলা কোনও ক্রমেই জাহাজের নাবিক আর ক্যাপটেন্ এর সম্পর্কের সূত্র ধরে বিচার্য্য নয়। আমি তো বিদ্রোহী নই—যে শৃঙ্খলার নামে আমার হাতে দড়ি পড়বে। আজকের থিয়েটারে নির্দেশক তো অনস্বীকার্য্য বাস্তব। তাঁর ভাবনা, তাঁর চিন্তা, যুক্তি, নাটকের মূল বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য এবং এই অখণ্ড শিল্প মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ-প্রচেষ্টার সঙ্গে কী ভাবে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, সুর যুক্ত হবে—এ সব আলোচনার তো আমিও অংশীদার। একটা অরাজক ব্যষ্টির জন্ম দিতে আমি তো চাই না—আমি নাটকের মূল সুর এবং পরিচালকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমার বোধকে মিলিয়ে একটা চরিত্রকে বুঝতে উদ্বুধ। সে অঙ্গীকার তো করেছি,—যৌথ শিল্পের আত্মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

একজন ভাস্কর বা একজন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে থিয়েটারের-শিল্পী পরিচালকের তফাৎটা স্বীকার করতেই হবে। প্রাণহীন উপকরণ দিয়ে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী তাঁদের মনোগত বাসনাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে রূপ দিতে পারেন এবং সেই শিল্পমাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় ঘটে। কিন্তু থিয়েটারের শিল্পীর (?) প্রধান উপকরণ প্রাণহীন বস্তু নয়—মানুষ, তাই এ শিল্পের প্রকাশও

জটিল। এবং যে যাই বলুক অভিনয় শিল্পই নাট্যপ্রয়োগের প্রধান অঙ্গ। পাদ-দীপের প্রভাবগুলো ভেতরে এবং বাইরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র হল অভিনেতা। অনগ্রতম্বী পরিচালককে দেখতে পাওয় যায় 'মারিওনেট্' এর খেলায়। কিন্তু অভিনয় শিল্পে নটের ব্যক্তিস্বরূপই নাটককে সঞ্চরণশীল ক'রে তোলে কারণ সে ব্যক্তিস্বরূপের সারতত্ত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমত বিস্তারণ ও সংকোচনের অনন্য ক্ষমতা। নট তার অন্তরের সমবেদনাকে, অঙ্গলীলায় প্রতিমূর্ত করে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করে। থিয়েটারে পরিচালক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সুরকার প্রত্যেকে দর্শকের কাছে অপ্রত্যক্ষ ভাবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন নটের মাধ্যমে। 'পিকাসো'র ছবির উপকরণ—রং, তুলি, ক্যানভাস, কোনওটা বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প নয়, ওগুলো উপকরণ বস্তুই—তাই তাঁর একক-সৃষ্ট শিল্প বিচারের সময় ওগুলো আত্মপ্রকাশের প্রশ্ন ওঠে না। যেমন কোনও অবুঝ শ্রোতার বিটোফেনের 'পিস্তুর-সিম্ফনি' ভাল লাগে কেননা তার মধ্যে কোকিলের কুহু রবের অনুরূপ সুর বর্তমান—এ উদাহরণ এক্ষেত্রে অর্বাচীন মনের পরিচায়ক। কেননা থিয়েটারের সঙ্গে এগুলি তুল্য মূল্য নয়। প্রযোজকের অনন্যতন্ত্র যদি দাবী করে যে নাট্যশিল্পও ওই রকম উপকরণ নিয়ে একক সৃষ্টি তবে অবশ্যই 'স্রষ্টার উপকরণ হিসেবে জ্যান্ত মানুষ ব্যর্থ—কারণ সে নিয়ত পরিবর্তনশীল'—এরকম প্রলাপের প্রশ্রয় দিতেই হবে। তার কারণ নাট্যশিল্প যে কতকগুলি শিল্পের সমন্বয়ের ফলে এক জটিল শিল্পরূপ এ সত্যকে তাঁরা অস্বীকার ক'রে পরিচালক নামক একমাত্র শিল্পীর আ'ইডিয়া'কে, একটিমাত্র আবেগের ডিজাইন্ বা প্যাটার্নকে রূপায়িত করাই একমাত্র লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরিচালক সুরশিল্পী বা ভাস্করের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন না। থিয়েটার শিল্প যে প্রধান রূপ পরিগ্রহ করে তা ঐ রকম একটিমাত্র প্রত্যক্ষ বা একক মাধ্যমের ফল নয়। থিয়েটার শিল্পে মঞ্চকার একজন শিল্পী, তিনি কাজ করেন মঞ্চচিত্রের নিজস্ব মাধ্যমে। থিয়েটারের কাজে তাঁর যোগ তাঁর নিজস্ব শিল্পের শিল্পী হিসেবে। আলোক-শিল্পীও—আর এক জাতের শিল্পী। পরিচালক নিজেও নিশ্চিত কোরেই আর একজন শিল্পী। অভিনেতাও শিল্পী। তার মাধ্যম ভিন্ন এবং নির্দিষ্ট। তার ব্যক্তিত্ব, দেহ এবং কণ্ঠস্বর মাধ্যমের অন্তর্গত। এই অখণ্ড-শিল্পের মধ্যে যুক্ত থেকেও সে স্বতন্ত্র,—নইলে যে তার শিল্পী সত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। এই সব কারণেই এ শিল্প জটিল,—জটিলতার মধ্যেই এর মুক্তি। হয়ত এই কারণেই 'বিশুদ্ধ শিল্প' বলতে যা বোঝায় (স্থাপত্য এবং সংগীত) তার থেকে এ ভিন্ন। অভিনেতা এবং অভিনয় হল মাধ্যম ; উপকরণ নয়। এই মাধ্যমেই নাটকের চরিত্র তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপান্তরিত হচ্ছে—থিয়েটার শিল্পে। নাট্যকারের লেখা নাটক, চরিত্র, পরিচালকের নির্দেশ—এগুলো হলো অভিনেতার উপকরণ। কিন্তু যে অভিনেতা একটা মানুষকে রূপ দিচ্ছে সেও নিজে মানুষ। নাদির শা'র ভূমিকাভিনেতা শিশির ভাদুড়ী মশাই নাদির শা'র মতই মানুষ। শিল্প আর স্বভাব। স্বভাব থেকে শিল্পে কখন উত্তরণ ঘটছে? কোনটা মাধ্যম আর কোনটা উপকরণ? বিভেদী করণের পন্থা সহজ নয়। যদি সহজ করতে হয়, যদি 'বিশুদ্ধ শিল্পের' অবতার নামে অভিনেতাকে মৃতের সঙ্গে নিজেকে সমতুল্য জ্ঞানে স্রষ্টার মালমশলা হিসেবে বাঁচতে হয় তবে

পরিচালক 'পুতুল নাচ' বা 'মারিওনেট' এর মাধ্যমে নিজের আইডিয়াকে প্রকাশ করার প্রয়াসে নিযুক্ত থাকলেই পারেন। জীবন ঘটিত আবেগ-দম্ভ-গর্ব সম্পন্ন মানুষ নিয়ে কারবার করবার প্রয়োজন কী? জীবনের, মননের এ অপচয় কেন?

যদি এই হয় যে সুতোয় বাঁধা পুতুল কুশীলবেরাই অবশ্য শিল্প সাধনার অনুগামী এবং মানুষের সমগ্র নাট্যবোধ এদের মধ্যেই প্রথম রূপ পেয়েছিল এবং সেই হেতুই আজকে থিয়েটারে রেনেসাঁ আনবার জন্য কলের পুতুলকে নটশিল্পের আদর্শ করে তার অনুবর্তন বাঞ্ছনীয় তবে প্রথম প্রশ্ন উঠবে: প্রাথমিক আদর্শ বিবর্তিত হল কেন? পুতুল থেকে মুখোশধারী মানুষ, তার থেকে বৈশিষ্ট্য বর্জিত স্বল্প কটি চরিত্র; এবং তারও পরে আজকের নাটক, অসংখ্য জটিলতা—অসংখ্য চরিত্রের রূপায়ণ হল কেন? হয়ত নাট্যকারের একাধিপত্য, কোনও বিশেষ অধ্যায়ে অভিনেতার স্বৈরাচার, পটশিল্পীর দৌরাত্ম এ নটসমবায়ের গণতন্ত্রের মূলে ধাক্কা দিয়েছে তবু প্রযোজক নির্দেশকের অনন্ত আধিপত্যের ফলে যদি নাট্যকার এবং অভিনেতার মৃত্যু দাবী করা হয় শুধুমাত্র পরিচালকের আইডিয়াকে প্রকাশ করতে, পরিচালকের একটা প্যাটার্নকে রূপ দিতে তা হলে তা আরও মারাত্মক হবে। ভবিষ্যতের থিয়েটার শিল্পী (?) যদি শুধু Action, Scene এবং Voice-এর মাধ্যমে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি সম্ভব করবেন বলে সঙ্কল্প করেন তবে অন্য কোন অনুরূপ শিল্প সম্ভব হলেও হতে পারে—কিন্তু থিয়েটার শিল্প,—যা নাট্যকার, অভিনেতা প্রমুখ শিল্পীর সমবায়, তার থেকে প্রতারিত হবে।

এঁরা যবদ্বীপের ছায়াবাজীকে সাক্ষী মেনে কিংবা প্রাচ্যের প্রাচীন নাট্যকলার অনুদেশে নটের মুখ মুখোসে ঢেকে তার আবেগ সমুখ স্বয়ংশ অঙ্গচালনাকে সমগ্রতার খাতিরে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রণ করার কথা ওঠাতে পারেন। এদের ভাবগতিক দেখে এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় নেই যে এঁরা লিখিত নাটকের পাত্রপাত্রীর উপরে আরোপিত চরিত্র বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী নন। তাই এঁরা অষ্টাদশ শতকের ভেনিসের নাট্যরীতি 'কোমেদিয়া-দেল-আর্তে'র আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেই নাটকের মানুষেরা ছাঁচে ঢালাই। অভিনেতারা হার্লিকুইন, কলাম্বাইন, কবিরাজ, দুরাচার ইত্যাদি—এবং তারা বৈশিষ্ট্যহীন; বন-গড়া সংলাপ তারা আবৃত্তি করত। অর্থাৎ মানুষ নিয়ে কারবার করলেও তার ব্যক্তিত্বকে বর্জন করতে হত—ব্যক্তিগত ভাব ব্যঞ্জনাকে কড়া অনুশাসনে বাঁধতে হত—এই হল তাঁদের আদর্শ। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এদের বিবাদ অভিনেতার সঙ্গে নয়—অভিনের নাটকের সঙ্গেই। নাটকহীন, অভিনেতাহীন এদের প্রয়াস সৈন্যদলে নিয়োজিত হলে—সেনাদলের 'রোড্ মার্চ' নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হত। কারণ এ ধরণের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সৈনিকের পদক্ষেপ একটি তারে বাঁধা, প্রত্যেক সৈনিক নটের মুখ একই সর্বজনীন মুখোশে ঢাকা। এদের মুখে মননের চিহ্নমাত্র থাকবেনা এবং এদের বিশুদ্ধ প্রয়োগ শিল্পের রস গ্রহণের অন্তরায় হবে না।

অথচ আমি অভিনয়কে শিল্পজ্ঞানে একাজে নেমেছি। যদি দাবী করা হয় যে আমার অনায়াস বিচরণ ঘটবে জীবনের সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে—ক্রিকেটের মাঠ থেকে মনুমেন্টের পাদদেশে; দর্শন থেকে

বিজ্ঞানের সাহায্যে ; চাতুড়ী থেকে হারমোনিয়ামের সুরে ; দাবার ঘুটির চাল থেকে পুঁটনিকের চলনে পুলকিত হবার অবকাশ থাকবে আবার, তবে আমি মঞ্চের নাট্ বল্টু হয়ে থাকব কেন পরিচালকের তাঁবেদারী করতে। অথচ এসব জ্ঞানের প্রয়োজন অভিনেতার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এবং বিকাশের জন্যই। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে অভিনেতার বোধকে বাড়াবার জন্যেই। কেননা গভীরভাবে জীবনকে জানা গেলেই মহত্তর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব।

যদি অভিনেতা সৎশিল্পী হন তবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সচেতনতা এবং বোধকে নিয়োজিত করবেন একটা চরিত্রকে রূপ দেওয়ার জন্যে। এবং এক অভিনেতা থেকে অন্য অভিনেতার পার্থক্যটা ধরা পড়ে এই বোধের তারতম্য অনুসারেই। নির্দেশকের সঙ্গে তার আদর্শ সম্পর্ক হবে—নির্দেশকের সহযোগে তার ভাব এবং ভাবনাকে মিলিয়ে নিয়ে চরিত্র সৃষ্টি। অভিনীত নাটকের সামাজিক এবং আদর্শগত ব্যাখ্যা এবং চরিত্রায়ণ নির্দেশক অভিনেতার মধুর সম্পর্কের মধ্যে একটা পথেই চালিত হবে। মহলার সময় নির্দেশক নির্দেশ দেবেন তাঁর শিল্পীকে। সে নির্দেশ কখনো বা ব্যাখ্যা কখনো বা দেখিয়ে দেওয়া। এই নির্দেশগুলি অভিনেতার জীবন ঘটিত অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দেখতা সত্যকে মনে করিয়ে দেবে অভিনেতাকে—কিংবা কল্পনার আশ্রয় নেবে সাহিত্য থেকে। ফলতঃ নির্দেশ আর অভিনেতার অভিজ্ঞতা, কল্পনা এ দুয়ে মিলে মিশে একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার সৃষ্টি করে। নির্দেশকের অনুরোধ, নির্দেশ যান্ত্রিকভাবে মেনে নেওয়ার চেয়েও অভিনেতা আরও কিছু সংযোগ করলেন। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগালেন। এইভাবে পরস্পরের আদান প্রদানে মহলার কাজ এগিয়ে যায়। এই-ভাবেই পরিচালকের সৃজন প্রতিভা অভিনেতার শিল্পসৃজনে বাসা বাঁধে। তাই তিরস্কার শুনি মহৎ নির্দেশকের কাছে—'তোমরা কি কেবল আমার দেখান উপাদানকেই অনুকরণ করবে? তাই যদি কর তাহলে তো যারা টিকিট কেটে তোমাদের দেখতে আসবে—তারা বলবে যে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার কল্পনার পরশ লাগুক অভিনীত চরিত্রে।' জীবনবোধ এবং অভিজ্ঞান এরই উপর নির্ভর করছে কল্পনাশক্তি। জীবনের নানান অভিজ্ঞতার জারক রসে মজলে তবেই অভিনেতার কল্পনার প্রসার ঘটে। থিয়ালিটির সঙ্গে পরিচয় অভিনেতার জীবনে অবশ্যই ঘটা চাই।

অভিনেতার অভিব্যক্তিকে স্বভাবসিদ্ধ করে তোলা, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান ক'রে তোলা, জীবনের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা এবং সবার ওপরে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তার সৃষ্টচরিত্র শিল্প হিসেবে প্রকাশমান কিনা—এই লক্ষ্য রাখাই পরিচালকের শিল্প সৃষ্টি-সহায়কের ভূমিকার যথার্থ গুরুত্ব। এবং এই কাজে কখনো তিনি হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন - কখনো বিস্তারে আলোচনা করছেন, ব্যাখ্যা করছেন। আর অভিনেতা যখন সেই সূত্রে অনুশীলন করছে নবসৃষ্টির জন্যে—তখন নির্দেশক পুষ্প বিলাসীর মত কান পেতে ফুলের কেয়ারীতে প্রথম প্রাণ সঞ্চারের সাড়া শোনবার আগ্রহ নিয়ে উদগ্রীব অপেক্ষায় বসে আছেন। এবং এদের পরস্পরের দূরত্ব, পরস্পরার অবয়েবা, হাবভাব সংকল্প, দৃশ্য সংস্থাপন, আলোর ব্যবহার ইত্যাদির উপাদান সংগ্রহ করেন নাটকখানির পরিণত রূপের জন্য।

॥ উপসংহার ॥

অভিনয় যে শিল্প, তাই এ শিল্পের রূপকার প্রয়োজন। 'পুতুল' শিল্প-সৃষ্টির রূপকার হতে পারেনা। অভিনয়টা শিল্প না হয়ে থিয়েটারে যদি পরিচালক-শিল্পীর প্রকাশই শিল্প হয় তবে তার উপকরণ নাটবস্তু-সদৃশ পাত্র-পাত্রীর জন্যে শিল্পীর দরকার কী? হয়—শিল্পী নয় এমন মানুষের আমদানী করা হোক কিংবা কলের পুতুল। শিল্পীরা আসবেন কেন থিয়েটারে। অভিনেতা হিসেবে যারা শিল্পীশ্রেষ্ঠ, তাঁরা যদি মঞ্চে অভিনয় মাধ্যমে তাঁদের শিল্প প্রকাশ না করতে পারেন তাহলে তাঁদের সার্থকতা কোথায়? অথচ নাটকে নট-দর্শক সংযোগ-বাহিরেকে থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ কেবল উপকরণ হয়েই থাকবে। যে রহস্যময় সৃষ্টিপ্রবাহ দর্শক অভিনেতাকে সংযুক্ত করে দেয় সেটা কী করে তৈরী হচ্ছে?—নাট্যকারের দেওয়া সংলাপ ও পরিচালকের ব্যাখ্যা এ সবকে ছাপিয়ে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের, অভিজ্ঞতার, কল্পনার ছোঁয়ায় একটা তৃতীয় গুণের উদ্ভব ঘটবে অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে—সেটাই অভিনেতার নিজস্ব সৃষ্টি এবং সেটা শিল্প। এই সৃষ্টিকে সহায়তা করছে সজ্জা, আলো, রেখা। এরই ভোক্তা দর্শক। এরই আকর্ষণে শিল্পী আসেন অভিনয়ের আসরে—নিজেকে মুক্ত করতে, নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজেকে ভূমিকার সাযুজ্যে বিলীন করেই নয়—নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেও—tutto ricordare o tutto dimenticare।

প্রত্যেক বড় অভিনেতার আবেগ এবং প্রকাশ ভঙ্গীমার অভিনবত্ব থাকবেই। এই অভিনবত্ব তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্যই সম্ভব। শিল্পীতো নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না তিনি প্রকাশ করবেন। বাইরের অবয়ব এবং পৃথিবী সম্পর্কে বোধের তারতম্য থাকে বলেই নাট্যকার বর্ণিত চরিত্র বা পরিচালকের নির্দেশ মত অভিনেতা মিশে যেতে পারেন না।

যদিও মহান শিল্পীদের সম্পর্কেই এসব কথা তবু তাঁরাই থিয়েটারে অভিনয়ের আদর্শ। এইসব ব্যক্তি স্বরূপের আবেগ প্রবাহ দর্শকের কল্পনায় গিয়ে ঠেকে এবং এইটাই নিকষ যার সাহায্যে অভিনয় তথা থিয়েটারের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্ভব। একটা তৃতীয় গুণের উদ্ভবের ফলে একই নাটকের একই চরিত্র দুই ভিন্ন শিল্পীর হাতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে দর্শকের আস্বাদনের বৈচিত্র্য ঘটায়। মারিওনেট্ হলে সেটা সম্ভব হয় না অর্থাৎ এদিক থেকেও দর্শক বঞ্চিত হল। এ শিল্পের পক্ষে তা হত মহা বন্ধ্যার যন্ত্রণা স্বরূপ। তাই যখন সারা বার্ণহার্ড ও এলিওনোরা দুজের অভিনয়-বিবরণ শুনি তখন অবাক বিস্ময়ে অভিনয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। এই শিল্পকে থিয়েটার থেকে নির্বাসিত করার কথা কল্পনা করা যায় না এবং অনেক পাগলের পাগলামী প্রচেষ্টাতেও এর বিনাশ নেই। রাসিনের শ্রেষ্ঠ নাটক, ট্র্যাজিডির নিদর্শন 'ফেদ্র্'-এর নাম ভূমিকার এই দুই মহৎ শিল্পীর অভিনয় দিক্‌দর্শক হ'য়ে আছে। প্রত্যেকের নিজের যুক্তি অত্যন্ত যথার্থ এবং প্রখর হওয়া সত্ত্বেও তা স্বতন্ত্র। বিবরণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি চেতনায় বিস্ময়কে সাবলিমিটিতে পৌঁছে দেয়।—"সপত্নি পুত্র ইপোলিতের প্রতি আসক্ত হয়ে রাণী ক্রোধে অপমানে জর্জরিত, মিথ্যা অভিযোগের সাহায্যে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে স্বীয় উচ্চণ্ড প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির তর্পনে উদ্যত হয়েছে, ট্র্যাজিডির অবসান তার প্রাণপাতে। সারা বার্ণহার্ডের পরিকল্পনায় 'ফেদ্র্' একটি বিশালাক্ষী চল চঞ্চলা রমনীর মূর্তি পরিগ্রহ করত, তার মধ্যে প্রত্যাখ্যাত প্রেম হিংসার নৃশংস শিখায় প্রজ্জলিত হয়েছে। প্রবঞ্চিত স্বামীকে ক্রোধান্ধ করে তোলার জন্য তার সুচিন্তিত বক্তব্যে কোনো ফাঁক নেই। সারাথ আবেগমুখর বাকচাতুর্যে 'ফেদ্র্'

যেন জ্বালাময়ী রুদ্রাণীতে পরিণত হত। কেবল রাজ্য শাসনে সমর্থ নয়, নিজের অদৃষ্টকে উদ্দাম হৃদয়ের মর্জিমতো চালানোর শক্তিও সে রাখে। সারার অভিনয় যে উৎকর্ষে গিয়ে পৌঁছত, তা সফোক্লিসের যোগ্য। যেমনি আরণ্যিক, তেমনি মহিমময়, তেমনি নির্মম। সে 'ফেদ্র্' সংরক্ত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি রাণীর মতো রাণী।"

"এই দৃশ্যে দুর্ঘেকে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হত যেন গভীরতম দুঃখের সংস্পর্শে এসেছি, এ দুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের দুঃখ, আত্মগ্লানির দুঃখ। তার সন্নিধি থেকে কিসের একটা সুরভিশ্বাস নির্গত হত, সে যেন ভবিতব্য পীড়িত নিরাশ নিঃসহায় নারীত্বের পরিমল। ইপোলিতকে নির্বাসনে পাঠানোর চক্রান্ত প্রেমার্তের দুর্বলতায় অভিষিক্ত হয়ে উঠত। মনে হত যে সে সর্বনাশা প্রলয়ের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দয়তার ভান করা ··· তার চুর্ণ মস্তিষ্কে শুধু এই সংকল্পের বিবর্তন চলত যে যার জন্য সে এত দুঃখ পেয়েছে, সেই প্রেমকে উচ্ছেদ করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। কিন্তু তা সত্বেও সেই অনাথা ম্রিয়মান নারীর মধ্যে রাণীকে হারানোর কোনো উপায় থাকত না··· ।"

★ ★ ★

ব্যক্তিত্ব, শিল্পীচিত্তের রাগাভিশয্য, অভিনয় রীতির উৎকর্ষ, স্বরসাধনার সিদ্ধি ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি— এগুলিই হচ্ছে নাট্যামোদের মুখ্য সহায় এবং নটের সংবেদন ও অভিপ্রায় উক্ত রীতিতেই এসে পৌঁছয় পাদপীঠের এপারে।

এ অপূর্ব সৃষ্টি পুতুলের দ্বারা সম্ভব নয় এ কথা বলবার আর প্রয়োজন নেই। তবু মারিওনেটের সূত্রকার অভিমেধাবী অকারী নাট্যবিশারদ গর্ডন ক্রেগকে স্টানিস্লাভস্কির বিশ্লেষণ ধরে বোঝবার চেষ্টা করি। স্টানিস্লাভস্কি বলেছেন যে যদিচ ক্রেগ কলের পুতুলের প্রবর্তনা কামনা করেন, তবু তিনি দেখেছেন যে, অভিনেতার মধ্যে প্রতিভার সামান্যতম আভাসে গর্ডন ক্রেগ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। মারিওনেটের কল্পনাটা অভিনেতার প্রতিভার স্বীকৃতির পথে বাধা হয় নি কখনো। তখন তাঁর উৎসাহ, চাঞ্চল্য প্রায় ছেলেমানুষের মত প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু যে মুহূর্তে কোনও অভিনেতার মধ্যে লেশমাত্র প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যেতনা তখনি ক্রেগ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন এবং মারিওনেটের স্বপ্ন দেখতেন। স্টানিস্লাভস্কির ধারণা যে যদি প্রতিভাহীন অভিনেতার দল—ক্রেগের নিজের তৈরী মারিওনেটের দলের বদলে তাঁর দলে সালভিনি, দুজে, য়ারমোলোভা বা শালিয়াপিন প্রভৃতি প্রতিভাধর শিল্পী থাকতেন তবে গর্ডন ক্রেগ খুশী হয়ে কাজ করতে পারতেন।

কিন্তু মারিওনেটের স্বপ্ন আজও স্বপ্নই থেকে গেছে। যদি কোনও আধুনিক কৃতকর্মা পরিচালক অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে, মননকে নিশ্চিহ্ন করতে মারিওনেটের ভূতকে আবারো জাগাতে চান তা হলে এ বলা ছাড়া উপায় নেই যে ভগবান, এ থিয়েটারের ভবিষ্যতের প্রতি তুমি দৃষ্টি রেখ।

মহলা প্রসঙ্গে

॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় ॥

মহলা ফাঁকি দিয়ে ভাল অভিনয় করা যায় না এ সত্যটা জানা সত্বেও মহলা ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি কেন যে মাঝে মাঝে ভিতর থেকে চাড়া দিয়ে ওঠে এটা ভাবনার কথা।

দেখা গেছে ঠাণ্ডা মাথায় মহলা দিতে পারেন যাঁরা মহলার সুফল তাঁদের বেলায় ফলে বেশী। মনের প্রশান্ত অবস্থায় তাঁরা যা কিছু মহলায় অভ্যাস করেন তা মনের গভীরে গেঁথে যায় আর তাঁদের প্রতি দিনের অভ্যাসে যে চরিত্রগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলো হয় সেইরকম স্পষ্ট। কিন্তু আমাদের মত অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মহলা দিতে উঠলে আমাদের সমস্ত শান্তশীলতা কোথায় হারিয়ে যায়--বাড়তি উত্তেজনা অনুভব করি—কি রকম একটা অস্থিরতার মধ্যে প'ড়ে ভেবে কাজ করার মত মানসিক অবস্থার বাইরে গিয়ে পড়তে হয়—শেষে ধৈর্য্য হারিয়ে মনের এলোমেলো গতির হাতে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হই। মন তখন হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে তার কাজ কর্মের সঙ্গে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার কাজের পদ্ধতি মিলছে না সে সব সত্বেও নিরুপায় হ'য়ে এই রকম বিশৃঙ্খল উন্মাদনাকে Inspiration ভেবে মার খাই। এই দুষ্ট Inspirationএর আসা যাওয়ার পথও কোন নিয়ম মেনে চলে না তাই আমাদের মত কিছু লোকের মহলা প্রত্যেকদিন এক এক রকম হয়—যেদিন আমাদের অস্থিরতা যে দিকে ছোটে আমাদের মহলাও সেদিন সেই রকম হয়। এ অভ্যাসের কোন চেহারা নেই। চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতি এসব মনের তলায় থিতিয়ে বসে একসাথে মিশে কোন পূর্ণ চরিত্র গঠন করার অবকাশ পায় না। আমরাও বিরক্তির সঙ্গে ভাবি যে পরিমাণ পরিশ্রম হ'লো সফলতার মাপ কাঠিতে সে পরিমাণ পারিশ্রমিক মিললো না। এ ভাবনা মারাত্মক, একে অবিলম্বে ঠেকান দরকার কারণ আমাদের ভুলটা দেখিয়ে দিতে সাহায্য না ক'রে এ শুধু হতাশা আনে, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। দিনের পর দিন মহলার সঙ্গে যুক্ত থেকেও মহলা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে এই সংশয়। মুক্তির মধ্যে Art এর কাজ করা যায় বন্ধনের মধ্যে নয়। আমাদের এই ধরণের মহলায় মুক্তির অনুভূতি কখন আসতে পারে না কারণ আমরা তো আমাদের উন্মাদনার হাতে বাঁধা প'ড়ে ছটফট্ করি মহলায় অহরহ—নিজে মন থেকে যা চাইনা তাই ক'রে ফেলি যে বন্ধনের মধ্যে প'ড়ে তার সীমানায় মুক্তি কখনও আসতে পারে! শিল্পের ক্ষেত্রে একজায়গায় থেমে থাকা অসম্ভব—এখানে হয় এগিয়ে যাওয়া নয় পেছিয়ে পড়া—আমাদের কাজের অনির্দিষ্ট পদ্ধতি এগিয়ে চলাকে আটকে দিয়ে পিছিয়ে পড়ার দরজা খুলে দিয়েছে আর আমরাও অজান্তে পরিশ্রম করছি পেছিয়ে যাওয়ার দিকে। মনের গতি

বিধির চাবিকাঠিটি শক্ত ক'রে ধ'রে আমরা যদি আমাদের কাজের ধরণ পাল্টে পিছিয়ে যাওয়ার পথটা একবার বন্ধ করতে পারি তাহলে আর ভাবনা নেই Artই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে কারণ মাঝখানে তো আর পথ নেই।

আমাদের কাজ অভিনয় নিয়ে। অভিনয়ের বড় কথা পরিপূর্ণ ক'রে মানুষ দেখাতে পারা। নিতান্ত ছোট্ট ঘটনার মধ্যেও মানুষ কেমন ক'রে এমন এমন কাজ করে, কথা বলে যাতে তার ধরণটা সম্পূর্ণ হ'য়ে ফুটে ওঠে সেগুলো'র দিকে দৃষ্টি রেখে যত ছোটই হোক যে কোন চরিত্রকে ঐ রকম 'মানুষ' ক'রে দেখাতে পারার উপায় বার ক'রতে মহলায় মন দিতে পারলে হতাশ হওয়ার সংকট থেকে বাঁচতে পারা যাবে।

আমাদের ভুল ক'রে চলার বাকি এখনও নেই। কাজ করার পাশে পাশে কাজ কতটা হ'লো তার যাচাই করার অভ্যাস নেই বলেই ভুলটা ধরা পড়ে না—ভুল পথে চলা হয়ে যায় বেশী। আমাদের নানান ভুলের মধ্যে এও একটা যে আমরা মহলায় কেবলমাত্র যে যে চরিত্রগুলি আমরা নিজেরা অভ্যাস করছি তাদের চিন্তা নিয়েই মশগুল থাকি পুরো নাটকের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র কোথায় বা কেনই বা তাদের নাটকে আনা হয়েছে এ চিন্তা আমাদের প্রায় থাকেই না। ফলে সহ-অভিনয় যা করি সেটা কোন অর্থে পৌঁছায় না। একাধিক চরিত্র একজায়গায় এলে তবেই সহ-অভিনয় থেকেই প্রকাশ পায় কার সঙ্গে কোথায় মিল আর কার সঙ্গে কার কোথায় গরমিল। আসলে প্রত্যেক চরিত্রই তো এক একটা স্বতন্ত্র মানুষ, স্বতন্ত্র মন—এখানে কারুর কোন কথা বা কাজ ফেলা যাবার নয় সমস্তই প্রত্যেকের মনে বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে যেগুলোর প্রকাশেই তাঁদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে তো কেউ কেবলমাত্র একলা ব'লে মনে করতে পারে না। নাটকের কেন্দ্রীয় চিন্তাধারা কী এবং সেটাকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্যে কে কোথায় কি করছে কেমন ক'রে করছে এ সমস্তই সকলকে মিলিয়ে ঠিক করার। চিত্রকলার বেলায় দেখা যায় শিল্পী কোন কিছুকে একটি বিশেষরূপে প্রকাশ করার জন্যে তারই পাশাপাশি এমন সব আলাদা জিনিষ বা আলাদা রঙ সুকৌশলে ব্যবহার করেন যা'তে ক'রে ঐ ঈপ্সিত জিনিষটির রূপ ও রং অদ্ভুত ভাবে খুলে যায় ফলে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে সে সামনে বেরিয়ে আসে—তাকে দেখবার জন্যে চোখ ফেলতে যাওয়ার আগেই সে চোখের সামনে এসে হাজির হয় ঠিক তেমনি ক'রে কোন একটি চরিত্রের আগে আগে আরও বিভিন্ন চরিত্র এনে ফেলে সেই কোন একটি চরিত্রকে বা তার কোন একটি বিশেষ অবস্থাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে চাওয়া নাটকেও হ'য়ে থাকে। এখানে পুরো নাটক না জানলে কোন চরিত্র কি রঙ এর চাহিদা মেটাচ্ছে সেটা ধ'রতে পারা যাবে না এবং এই অবস্থায় চরিত্রের রূপ দিতে গেলে ভুল হবেই। তাই আগে এই রঙ ঠিক করার কাজটি ক'রে তারপর সেই চাহিদা মেটাতে পারা যাবে কিসে সেটা ঠিক করা চাই। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে মহলায় যা যা করা হবে অনেক আগে থেকে সেই চিন্তাগুলো ঠিক ক'রে

রাখা দরকার—এক মহলা থেকে আর এক মহলা পর্যন্ত মাঝখানের ফাঁকটুকু ভাবনা চিন্তা ঠিক করার জন্তে রেখে—প্রত্যেক দিনের মহলায় সেগুলো কাজে ফেলে যাচাই ক'রে চলা বোধ হয় ভাল।

নাটকে আমরা দেখি চরিত্রগুলির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে ঘটনা। যেমন ঘটনা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ বিভিন্ন চরিত্রের মনগুলি দর্শকদের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপ নিচ্ছে। তাহ'লে ঘটনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের চরিত্রগুলির ওঠানামার সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ধাপে ধাপে। এখন প্রতিক্রিয়াগুলো যত খাঁটি করা যাবে ঘটনার মধ্যে চরিত্রগুলি তত পূর্ণাঙ্গ চেহারা পাবে। প্রতিক্রিয়া খাঁটি হবে তখনই যখন স্রষ্ট চরিত্রের মনটি ঘটনাগুলিকে একেবারে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারবেন। নাট্যকারের লেখা ঘটনাগুলোকে বিশ্বাস করতে অভ্যাস করা প্রত্যেক মহলার দরকার—এ অভ্যাস পাকা হ'লে যথেচ্ছ সহ-অভিনয় ক'রে ফেলার ভয় থাকবে না।

সাধারণত: আমরা মহলা অভ্যাস করি ফাঁকা ঘরে বড় জোর অভিনেতার হাতের লাঠি বা সামনের টেবিলটি থাকে মহলার সময়—এর মধ্যেই কিন্তু অভিনেতাকে যে স্থানে ঘটনা ঘটছে তার একটা ছবি কল্পনায় এনে রাখতে হয়। যদি কোন ঘরে ঘটনা ঘটতে দেখান হয় তা হ'লে সে ঘরের অবস্থাটা কি রকম তার আন্দাজ ঠিক রাখতে হয়। নইলে মঞ্চে অভিনয়ের সময় হঠাৎ স্থানটির দৃশ্যরূপ মনে কোন প্রশ্ন জাগাতে পারে এবং ফলে অমনোযোগী হয়ে পড়ার সুযোগ থেকে যায়।

নাটকে যদি দেখান হয় যে সেই স্থান চরিত্রটির সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই প্রথম সে এখানে এলো তা হ'লেও ঘরখানির চেহারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ক'রে রাখতে হয়। নচেৎ অসুবিধে হতে পারে—চরিত্রটি যে ব্যবহার দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইবে যে জীবনে এই সে প্রথম এখানে এলো তার বেলায় আন্দাজের হাতে গিয়ে পড়বে সে। তা ছাড়া অনেক সময় যেমন দেখা যায় দরজা রয়েছে কেউ সেটা ব্যবহার না করে Winge এর ভিতর দিয়ে এলো বা চলে গেল—মহলার সময় ঐ দরজার কথাটা সব সময় মনে রাখলে নিশ্চয় ঐ ধরণের ভুল কেউ করতেন না। তাছাড়া Set এর ছবি এবং যাবতীয় খুঁটিনাটি আসবাবপত্রের কথা চোখের সামনে এনে মহলা দিতে চেষ্টা করলে কল্পনা শক্তি বাড়ানো'র কাজও মহলার মধ্যে দিয়ে হতে পারে।

মুস্কিল অনেক। একেবারে গোড়া থেকে কেমন ক'রে নিজের বোধকে ফাঁকি দিয়ে আর এক বদগুণ আমাদের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছে—তা হ'লো সব কিছু বাদ দিয়ে নাটকের সংলাপগুলোকে আঁকড়ে থাকা। মানুষের বাঁচাটা কেবলমাত্র কথা বলায় নয়। বরঞ্চ একটি দিনের সমস্ত ভাবনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং নানান জিনিসের প্রতি মনের প্রতিক্রিয়াগুলিকে যদি একলা ধ্বনির সাহায্য নিয়ে হুবহু বর্ণনা করার চেষ্টা কেউ একবার ক'রে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এবং মানবেন যে মানুষের জীবনের সব কিছুকে প্রকাশ করার মত সম্বল অবস্থা এখনো শব্দ-ভাণ্ডারের হয়নি। এরপর যদি

তিনি ভাষাতীত সেইগুলি কি যা অহরহ সাহায্য করছে কোন প্রতিবেশীর মনটিকে তাঁর সামনে মেলে ধরতে বা ভাষাতীত কি কি দিয়ে তিনি নিজের মনটিকে খুলে ধরছেন প্রতিবেশীর কাছে তার হদিশ করতে যান তাহলে চোখে পড়বে অসংখ্য ইঙ্গিত—মানুষের ভাব প্রকাশ যার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। এ অনুসন্ধিৎসা অভিনেতাকে দারুণ সাহায্য করবে। ইঙ্গিতের হাতিয়ার ছড়িয়ে আছে যাবা অঙ্গে 'কথা'র মত সে প'ড়ে নেই মাত্র কয়েকটি যন্ত্রের হাতের মধ্যে—তাই সব সময় কাজে 'ইঙ্গিত' 'কথা'কে ছাপিয়ে গেছে। এই যদি হয় তা হ'লে মঞ্চে যে মানুষগুলি বাঁচছে তারা কেবলমাত্র কথার উপর নির্ভরশীল হবে কোন যুক্তিতে? এত কথার উদ্দেশ্য কিন্তু কখনই নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপকে স্থানচ্যুত করা নয়। এ শুধু আমাদের নিজেদের সতর্ক থাকার জন্যে স্মরণে রাখার চেষ্টা যে সংলাপকে আর সবার ভাগ কেড়ে নিয়ে একালসেঁড়ে হ'য়ে দাঁড়াতে দেওয়া চলবে না। সুতরাং মহলা দেব দৃষ্টি রেখে—কথা যেন মানুষকে ছাপিয়ে যেতে না পারে বা বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায় ভিতরটিকে সামনে এনে দেখাবার পথে, আর সমস্ত শরীর দিয়ে নানান ইঙ্গিত ভেবে বার করবো চরিত্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে। কথা বলা ফুরিয়ে যায় যদিবা ইঙ্গিত ফুরোবে না—তাই সবসময়ই ঠিকমত ভেবে উঠতে পারলে নতুন নতুন ভঙ্গীমার ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যাবেই। এক অভিনেতা বহু চরিত্রকে সৃষ্টি করতে পারবেন বুদ্ধিমানের মত এর ব্যবহার করতে পারলে। যাই হোক সংলাপকে সীমানা লঙ্ঘন করতে না দিলেও তার সীমানার মধ্যেই তাকে তার যথার্থ স্থানটি দিতে হবে—নইলে অঙ্গহানি হবে। কারণ দর্শকমনে নাট্যবস্তুটিকে সঞ্চারিত করার কাজে পরস্পরের কথোপকথন যে অনেক সাহায্য করবে সে কথা তো ভুললে চলবে না। এই কথোপকথনকে এমনই ক'রে তুলতে হবে যাতে কখনই কারুর মনে এ ধারণা জন্মাতে না পারে যে ও শুধু থিয়েটারের স্বার্থে বলা, যে মানুষগুলি বলছে তাদের জীবনের সঙ্গে ওর কোথাও আসল যোগ নেই। সুঅভিনয়ের বেলায় মঞ্চে মিথ্যে কথা বলা একেবারেই চলে না। আগের কথার পুনরুক্তি করেই আবার বলা দরকার যে মঞ্চে যা বলা হবে সেটাকে এমনভাবেই বিশ্বাস ক'রে নেওয়া চাই যাতে কখনই মনে হবে না চরিত্রের পেছনে অভিনেতাকে এর জন্যে কোন বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে—এমনই হওয়া চাই যেন চরিত্র তার নিজের তাগিদে ব'লে ফেলছে। চরিত্রের মুখে কথাগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে সংলাপের পিছনে নাট্যকারের কালি কলমের কথা মনে না প'ড়ে মঞ্চে মানুষটি খাঁটি হয়ে উঠবে। এরপর লক্ষণীয় যাতে কথার সঙ্গে ভঙ্গিমার, নড়াচড়ার একটি ভাবগত ঐক্য রেখে চলা যায়। যে অনুভূতির অনিবার্য ফল স্বরূপ যে সংলাপ আসছে তার সঙ্গে ঐ অংশের হাঁটা চলার ধরণও অনুরূপ অনুভূতি-সঞ্জাত না হ'লে দুটোই বরবাদ হয়ে যাবে। এটা ঘটতে যাতে না পারে তার জন্যে প্রত্যেক মহলায় সতর্ক থাকতে হবে। মঞ্চে কথার ভাবের সঙ্গে দেহের ভাব পরিবর্তন করা প্রতিদিনের অনুশীলন ব্যতিরেকে করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য এবং অনির্ভরযোগ্য। যদিও ব্যবহারিক জীবনে এইসব জিনিষই আমরা অনেক সময় ক'রে থাকি নির্ভুলভাবে কোন মহলা না দিয়েও, ঠিক যেমন দৈনন্দিন সাধারণ কথা বলার সময় আমাদের গলার স্বরে আমরা অনেক কিছু প্রকাশ করি যা মহলার সময় বা অভিনয়ের সময় গলায় আসে না, স্বাভাবিক গলার আওয়াজ তখন বেঁকে চুরে কোথা থেকে থিয়েটারের ভুতুড়ে গলা বেরিয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটাকে একটা কৃত্রিম চেহারা দিতে চায়।

একে আটকান একমাত্র মহলার সময় স্বাভাবিক প্রক্ষেপণ বাড়িয়ে তার মূল চেহারার স্বরূপটিকে ঠিক রেখে ব্যবহার করতে পারার চেষ্টায় সম্ভব। গলার প্রক্ষেপণ ক্ষমতা বাড়ান'র চেষ্টা প্রত্যহ করতে হবে মহলার বাইরে—এ নিজের পদা'র অন্ধকার পথে পথে নিজেরই গলার ধরণ আবিষ্কার ক'রে চলা। এসব যত কথা বলা হ'লো সবটাই কিন্তু সমস্তটা'র অংশমাত্র। এ কেবল মহলা দিতে গিয়ে নিজে যেখানে যেখানে আটকে যাই তার পথ বের করার উপর চিন্তার ব্যায়াম। আসলে যত কথাই বলা যা'ক আর যত বিভাগের উল্লেখই করা যাক না কেন কাজ করার বেলায় সমস্ত মিলিয়ে এক ক'রে নিতে হবে। বিভিন্ন বিভাগগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে গিয়ে যদি সবাই স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশ পেতে চায় বা পেয়ে যায় তাহলে সব মাটি। এই একীকরণে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'লে ফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে—সৃষ্ট চরিত্রটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে জন্ম নেবে মঞ্চে। মহলা'য় মনে হবে না কোন দাসত্বের দাবী মেটাচ্ছি—মুক্তির আনন্দে নিজেকে সমস্ত দ্বিধা'র হাত থেকে মুক্ত ক'রে মহলাকে ভালবাসতে পারবো—তাকে ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি জাগবে না। ঠাণ্ডা মাথায় মহলা দিতে গিয়ে মাথা গরম করতে হবে না।

এ না হ'লে আবার মহলা ফাঁকি দিয়ে ভাল অভিনয় করা যায় না জানা সত্বেও মহলা ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি কেন যে মাঝে মাঝে ভিতর থেকে চাড়া দিয়ে ওঠে এটা ভাবনার বিষয় হ'য়ে উঠবে।

বাংলা সাহিত্যে নাটক নেই *

॥ অভিজিৎ সেন ॥

'বাংলা সাহিত্যে নাটক নেই' কথাটা উন্নাসিকের ঔদ্ধত্য বলে অনেকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কেউ বা বলেছেন: এই সব ইংরেজী নবিশের দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতা ক্ষমার অযোগ্য। কেউ বা বলেছেন, এদের 'দূর থেকে গড় করি'।

শুনে বিস্মিত হই না। কেননা, এই সব সমালোচনা, ব্যবসায়ীদের আস্তিক্যবোধ তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের আগ্রহজাত। কিন্তু যাঁরা একসময়ে নাট্যআন্দোলনে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন তাঁদের মুখেও যখন এঁদের কথারই প্রতিধ্বনি শুনি তখনই বিস্ময় বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। কারণ, এই আন্দোলন পোস্টার ফেস্টুন মিছিলের আন্দোলন নয়, মনুমেন্টের তলায় বা টাউন হলে সভা করেও এর সূত্রপাত নয়। এর সূত্রপাত নাটককে লোকেদের চিন্তার জগতে। যা আছে তা অতুলনীয়, যা হচ্ছে তা অনেক বাপ্ঠাকুর্দার পিতামহের বিয়েতেও হয়নি, এমন মনোভাব নিশ্চয়ই নতুন কোনো চিন্তা-বিপ্লবের অনুকূল নয়। বরঞ্চ কিছু নেই কিছু হচ্ছে না—সত্যিকারের কিছু মহৎ সৃষ্টি হওয়া দরকার, এই অভাববোধজাত আগ্রহ থেকেই নাট্য-আন্দোলন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

নাট্যইতিহাসের প্রবক্তারাও যখন আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে এই পথেই মহৎ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখছেন (অবশ্য কথাটাকে 'আন্দোলন' বলতে তাঁদের বাধছে) তখন আন্দোলনের 'শরীক'দের মুখে ঐতিহ্যস্তুতি ও পুরোনো নাটকের প্রশস্তি একটু যেন কেমন 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ' বলে মনে হচ্ছে না?

সমালোচকরা বলেন, এলিজাবেথিয় নাট্যাদর্শের ছাঁচে ঢেলে বাংলানাটককে বিচার করে নাটক নেই বলা উন্নাসিকতা, দেশের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নাটক হতে পারে না।

কথাটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমত কোনো ছাঁচের কথা না তোলাই ভালো। কেননা, নাটক মহৎ সৃষ্টি হয় তার নিজস্ব গুণে, ছাঁচের জন্য নয় (যদিও আমরা ঐ এলিজাবেথিয় ছাঁচেই হাত-মক্সো করেছি গত শ'খানেক বছর ধরেই) কিন্তু ঐতিহ্যটা কী বস্তু? সংস্কৃত নাটক? না যাত্রা? এক থেকে এগারো শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের হিন্দু অভিজাতদের দ্বারা চর্চিত সংস্কৃত নাটকের ফসিল টেনে বার করে আমরা তো বহু নাটক করেছি ১৯শতকে—আড়াইশো বছরের পুরোনো লৌকিক

---

* এ প্রসঙ্গে উনিশ পৃষ্ঠায় ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের 'বাংলা নাটকের সাফল্য' প্রবন্ধটি ও দ্রষ্টব্য।

নাট্য ধারা যাত্রা'ও তো এদেশের নাটকে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তবু ভালো নাটক যে আমরা লিখতে পারিনি, একথা কি মিথ্যে ?

আমাদের দেশে ছোট বড় গল্প এবং কাব্যেরও একটা ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক গল্প উপন্যাস কাব্য যা বিশ্বসাহিত্যে গর্বের সঙ্গে তুল্য তা ইংরেজী সাহিত্যের অনুসরণেই গড়ে উঠেছে, ঐতিহ্য ধরে নয়। নাটকও সেইভাবেই সুরু হয়েছিল, কিন্তু সার্থক হয়নি। গল্প উপন্যাস কাব্যের বেলায় যা সম্ভব হ'লো, নাটকের বেলায় তা হলো না কেন, এটা কি পণ্ডিত মশাইদের ভেবে দেখা উচিত নয়। শুধু ঐতিহ্য ঐতিহ্য করে গদগদ হয়ে থেকে পুরোনোদের প্রতি নিরালম্ব শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যেতে পারে কিন্তু তাতে নতুন সৃষ্টির পথে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার যাঁরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অন্য কারুর চেয়ে একটুও কম নয়, একথাটা গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া দরকার। ঈশ্বরচন্দ্র, তারাচরণ, যোগেন্দ্র চন্দ্র, রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শচীন্দ্রনাথ, মন্মথ রায়—এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ—বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ক'টি স্মরণীয় নাম। এঁরাই যে আমাদের আজকের যুগে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথকে এই আলোচনার বাইরে রাখাই বোধহয় ভালো। কেননা, পৃথিবীর প্রথম সারির নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর নামও যে এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য, একথাটা এখনো আমাদের অসম্পূর্ণ উপলব্ধির। তাঁর তত্ত্ব ও কাব্যপ্রধান রূপক নাটক শ্রব্য, দৃশ্য নয়, এই উদ্ভট মতবাদ এখনো সম্পূর্ণ অনুচ্ছিন্ন। তাছাড়া পেশাদার মঞ্চমুখী নাট্য প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর নাটকের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, না আকৃতিতে না প্রকৃতিতে (রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মালিনী এবং চির কুমার সভা ও শেষরক্ষার কথা মনে রেখেই বলছি)। তাঁর প্রথমদিকের তিনখানি নাটকে তথাকথিত এলিজাবেথিয় ছাপ থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর কয়েকখানি নাটক পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিচ্ছিন্নভাবে একক এবং অনন্য। সুতরাং পৃথকভাবে আলোচ্য।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পথ দেখালেন সংস্কৃত নাটকের বাংলা করে, হাতে ধরে তিনি বাংলাভাষা লিখতে শেখালেন। রামনারায়ণ-পড়া শেকস্পীয়র-পড়া এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য-পড়া এক 'ইয়ং বেঙ্গল' এক পঞ্চাংক নাটক লিখে ফেললেন, তার নাম 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২)—রীতিমত এক ট্র্যাজেডি। এতে নান্দী আছে, সূত্রধার আছে, সংস্কৃতরীতিতে দীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে, পয়ার ছন্দে সংলাপ আছে, মৃত্যু আছে, হত্যা আছে, মৃত্যুকালেও নায়িকার কাব্যে বিলাপ করে মৃত্যু আছে। কিন্তু লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটি পড়ে তার লেখা পড়লে মনে হবে তিনি পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু নাট্যলেখক নন। 'ভদ্রার্জুন' ও 'ইয়োরোপীয় নাটক-প্রায়' করে লেখা হলো বলে লেখক গৌরচন্দ্রিকা করেছেন। ইনি সংস্কৃত প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন কিন্তু ভর্তা-কবিগানমূলত যমক অনুপ্রাস মেশানো পয়ার ও ত্রিপদী

ছন্দে রং তামাশা করার চেষ্টা। এতে ভণিতা, নান্দী আবার আছে। মহাভারত থেকে সুভদ্রা ও অর্জুন প্রসংগটি নিয়ে ভদ্রার্জুন লেখা—গল্পটা নিজের নয়। দৃশ্যগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, নাটকীয় গতিনেই, শেষের দিকে একেবারেই ঢিমেতেতালায় দূতমুখে ঘটনার বর্ণনা মাত্র, নায়ক নায়িকা (ভদ্রা ও অর্জুন ?) এবং এবং অন্যান্য চরিত্রও (সত্যভামা, বলরাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি) একেবারেই অপরিস্ফুট, কিছুটা উদ্ভট। অর্জুন সুভদ্রাকে দেখেই তার হাত ধরে যখন বলেন 'মন্মথ বানানলে আমার বক্ষস্থল দগ্ধ করিতেছে, এসো স্পর্শ করে শীতল হই' আর সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা বিগলিত হয়ে সখীর গায়ে ঢলে পড়ে বলেন: 'অর্জুনে হেরিয়া আজি প্রাণ বুঝি যায়' তখন সমস্ত ব্যাপারটাই ন্যাকানেকির লীলাখেলা বলে মনে হয়। এক বছরে লেখা এই দুখানি আমাদের প্রথম নাটক। সুতরাং এদের স্থান শুধু ইতিহাসের সংখ্যা গণনার তালিকায়, অন্য কোথায়ও নয়।

আমাদের প্রথম অভিনীত নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। চড়কডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে (মার্চ, ১৮৫৭) দুবার, পাথুরিয়াঘাটায় গদাধর শেঠের বাড়ীতে একবার এবং চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের বাড়ীতে আর একবার এই নাটকের অভিনয় হয়। প্রত্যেকবার ছ থেকে ন'শো দর্শক এই নাটকের অভিনয় দেখেছেন—তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে সুরু করে বহু বিখ্যাত লোকও ছিলেন বলে তখনকার দিনের খবরের কাগজ 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' থেকে জানা যায়। তখনকার দিনের এক সামাজিক কুপ্রথা নিয়ে লেখা এই নাটকখানির প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকরা অনেকদিন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি বলেও বোঝা যায়। এইদিক থেকে এবং প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটক এবং অল্পবিত্ত জনসাধারণকে প্রথম থিয়েটার দেখার আনন্দ দেবার নাটক হিসেবে এর মূল্য অনেকখানি। কিন্তু এখানি নাটক নয়, আসলে লঘু গুরু ভাষায় লেখা রঙ্গ ব্যঙ্গ ভরা কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র—। মূল গল্পাংশ অতিসামান্য এবং কোনোরকম বাঁধুনি নেই তাতে—বিচ্ছিন্নভাবে নানাচরিত্র এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের গল্প বলে যাচ্ছে। যা বল্‌বেন বলে ঠিক করেছেন নাট্যকার তা তিনি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলাবেনই, মানাক আর নাই মানাক, নাটকে প্রাসঙ্গিক হোক আর নাই হোক। লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—ইংরেজী শিক্ষিত নন। অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—'বিচিত্র নাটকীয় উপাদান থাকা সত্বেও নাট্যকার তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।..... ঘটনাবর্ণনা নাটক নহে, ঘটনা সংগঠনই যে নাটক রামনারায়ণ পাশ্চাত্য নাটকের এই আদর্শটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, সেই জন্য সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী বর্ণনার উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন।' কিন্তু আসলে এখনি সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী কোনো রচনাও নয়। কেন না, এতে ঐ নান্দী সূত্রধার নটী আছে আর স্থানে অস্থানে প্রচণ্ড সংস্কৃতবহুল ভাষার ছটাই আছে। নায়ক নেই, নায়িকা নেই, কাহিনী বিন্যাস নেই, কোনো বিশেষ রসপ্রাধান্য নেই। সুতরাং কোনো কোনো চরিত্রের মুখে প্রথম লঘুভাষার ব্যবহার দেখে আলালী ও হুতোমী ভাষার অগ্রদূত বলে যতই তাঁকে উচ্চাসন দিই না কেন, 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র লেখক দশ বারো খানা নাট্যচিত্রই লিখেছেন,

একখানিও নাটক লেখেননি। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে অবশেষে বলেছেন, 'নাটক হিসাবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর'।

রামনারায়ণের পর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনি রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদের ভার নিয়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালার রাজাদের সংস্পর্শে এলেন। তখন ইনি সদ্য মাদ্রাজ প্রত্যাগত বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ আদালতের কেরাণী মাত্র, কলকাতার নিজস্ব বন্ধু মহল ছাড়া একেবারেই অপরিচিত। ইনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যে তাঁদের ফরমাস মত তাঁদের মঞ্চব্যবস্থা এবং অভিনেতাগোষ্ঠির (প্রধানত: কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) মর্জি মাফিক নাটক লিখতে সুরু করলেন। 'রত্নাবলী'র মঞ্চসাফল্য দেখে তিনি লিখলেন শর্মিষ্ঠা'। পড়লে মনে হবে কোনো সংস্কৃত নাটকেরই পঙিক্ত বাংলার অনুবাদ পড়ছি। তিনি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে লিখেছেন, পাছে লোকে কোনো বিধর্মী, ইংরেজীনবিশের লেখা বলে মনে করে। কাজেই 'শর্মিষ্ঠা' আর যাই হোক আলোচনার মত কোনো নাটক হলো না।

গ্রীক পুরাণের 'য়্যাপল্ অব্ ডিস্কর্ড'-এর ভারতীয়করণ করলেন মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকে। কিন্তু সংস্কৃত প্রভাব এড়াতে পারলেন না, গল্পটি এমন কায়দা করে ছকে এনেও শেষপর্যন্ত একেবারে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা করে ফেললেন—শচীদেব বদলে অম্বিকার আশ্রয়ে পদ্মাবতী ইন্দ্রনীলের মিলন। আরো কিছু সংস্কৃত নাটকের খণ্ড চিত্রও বিক্ষিপ্তভাবে এসে পড়লো এর মধ্যে, যাতে করে একে আধুনিক সমালোচক পণ্ডিতেরাই বলছেন, 'নিকৃষ্টতর রচনা মধুসূদনের'। এদিক দিয়ে তাঁর পরবর্তী নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সমালোচকেরা প্রায় এক বাক্যে এর প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, এই আমাদের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি।

প্রথমত আমাদের উপন্যাস নাটকে তথ্য-সূত্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হলেও টডের রাজস্থান ইতিহাস কিনা সেবিষয়ে সংশয় আছে (কৃষ্ণকুমারীর ঘটনা ওখান থেকেই নেওয়া)। দ্বিতীয়তঃ কোনো রকম ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া গল্পকে সংলাপ-সূত্রে দৃশ্যবন্ধনে বাঁধলেই সেটা ঐতিহাসিক নাটক হয় কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে।

কিন্তু এহ বাহ্য।

জীবনশিল্পী মধুসূদন। অদৃষ্টপূর্ব দক্ষতায় সম্পূর্ণ নতুন ছন্দে এক মহাকাব্য রচনা করলেন, যার Tragic Grandeur আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেললো। ঠিক একই সময় তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। (মেঘনাদ বধ, কৃষ্ণকুমারী ও ব্রজাঙ্গনার রচনাকাল একই বছর—১৮৬১)। Epic কাব্য এবং Tragedy সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সে যুগে অন্য কারো চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু তবু—তিনি নিজে বলা সত্ত্বেও—কৃষ্ণকুমারীকে Tragedy বলে মেনে নেওয়া যায় না, এমন কি সার্থক নাটক হিসেবেও না।

সার্থক ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিয়ে অবশ্য তর্কের শেষ নেই। এমন কি, য়্যারিস্টটল্ যা বলেছেন তার শব্দার্থ নিয়েও গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। য়্যারিস্টটল্

Hamartia কথাটা ব্যবহার করেছেন ট্র্যাজিক নায়কের পতন কি সূত্রে হবে তাই বোঝাতে গিয়ে। ঐ কথাটাকে কেউ বলেছেন, Bad shot, কেউ বলেছেন Error, কেউ বা Sin, কেউ বা Offence ও বলেছেন। কেউ আবার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, গ্রীক সমালোচক এই কথাটি দিয়ে Intellectual Error বোঝাতে চেয়েছেন—আর একজন বলেছেন—ও হচ্ছে Moral Flaw। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে সাফ বলে গিয়েছেন, কথাটার অর্থ মোটেই অত সুনির্দিষ্ট নয়। Prattein or Praxis কথাটাকে অনেকেই To act অর্থাৎ কাজ করা অর্থে তর্জমা করেছেন। Prof. Margoliouth বলেছেন, কথাটার একটা intransitive implication আছে যাতে করে To fare এই রকম অর্থ দাঁড়ায়। তাহলে কিন্তু ট্র্যাজিক নায়কের সংজ্ঞাই বদলে যায়—অর্থাৎ তিনি কী করছেন সেটা নয়, তাঁর প্রতি কী করা হচ্ছে অর্থাৎ তার ভাগ্যে কী ঘটছে তারই ওপর নায়ক হিসেবে তাঁর গুণাগুণ নির্ভর করবে। ঠিক এই ভাবেই eudaimonia (সুখ? মহৎ জীবন? না, Blessedness?), Katharsis (ভাব পরিশুদ্ধি? না, Purgation?), Anagnorisis and Peripeteia (পরিচয় ও ভাগ্যবিপর্যয়? না, Discovery ও Peripety?), Zoon (জন্তু? না, ছবি?) প্রভৃতি শব্দের নানা অর্থ হওয়ায় অনর্থ সৃষ্টি হয়েছে। Platoর চ্যালের গ্রহণ করেই খৃষ্ট জন্মের তিনশো তিরিশ বছর আন্দাজ আগে য়্যারিস্টটল্ যা লিখেছিলেন তার খবর পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেউ জানতো না (একটি সংক্ষিপ্ত আরবী ভাষা এবং তার থেকে করা একটা লাতিন ভাষ্যের অস্পষ্ট আন্দাজ ছাড়া)। ১৫০৮ সালে যে অসম্পূর্ণ গ্রীক পুঁথি প্রথম মুদ্রিত হয় তাই য়্যারিস্টটল্-এর Poetics—এটা তাঁর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত 'নোট্‌স'-ও হতে পারে। কিন্তু যাই হোক, ট্র্যাজেডি বিচার করতে গিয়ে আমরা বিল্রান্তিকর ইংরেজী তর্জমায় পাওয়া এই Poetics-কেই সাক্ষী মানি, যদিও আধুনিক নাট্য-জগৎ থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই য়্যারিস্টটল্ বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন।

মধুসূদনের 'কৃষ্ণ কুমারী'কে যাঁরা প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি বলেছেন, তাঁরা ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন—'দুই বিপরীত ধর্মী আদর্শের পরস্পর সংঘর্ষের দ্বারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া নাট্যকাহিনীর এক করুণ পরিণতি যখন অনিবার্য হইয়া উঠে তখনই যথার্থ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়।' ট্র্যাজেডির গ্রীক-গুরু কিন্তু এর চেয়ে আরো অনেক বেশী বলেছেন।

প্রথমত ধরা যাক, এর নায়িকা কৃষ্ণকুমারীর কথা। ট্র্যাজেডীতে পুরুষ চরিত্রই নায়ক হবে, গ্রীক গুরুর এই নির্দেশের ব্যতিক্রমও হতে পারে যদি সে নায়িকা লেডি ম্যাকবেথ, ইফিজেনিয়া, মিডিয়া বা ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার এর মত দৃঢ় পৌরুষসম্পন্না নারী হয়।[১] কোমল স্বভাব দুর্বলচিত্ত ও নিঃসঙ্গ জীবনের বিবাদে বিষন্ন এই কৃষ্ণা কি কোনো মহৎ ট্র্যাজেডির নায়িকা হবার উপযুক্ত? নিহত হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা যে শ্রেয় বলে মনে করে ট্র্যাজিক নায়িকার Heroic Grandeur তার মধ্যে নেই। তবে কি এ নাটকের নায়ক রাজা ভীমসিংহ? ভীমসিংহ শেক্সপীয়রের King Lear-এর অত্যন্ত অক্ষম অনুকরণ। এই অনুকরণটা

১ The central figure of all great Tragedies will be a man or else a woman who like Lady Macbeth or Iphiginia or Media has in her temper some adamant qualities and severity of purpose not ordinerily associated with typically faminine.—Nicoll. P157

শেষদিকেই বেশি প্রকট। কিন্তু কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পর রাজা লীয়রের উন্মত্তভাবে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ আর ভীমসিংহের অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ আচরণে যে পার্থক্য তা মূল চরিত্রগত – পারিপার্শ্বিকতার যে অনিবার্যতায় লীয়র এই অবস্থায় পৌঁছলেন ভীমসিংহের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। লীয়রের চরিত্রের দৃঢ়তা, পৌরুষ, স্থৈর্য ও মহত্ত্বের সঙ্গে এই ভীরু দুর্বলচিত্ত অক্ষম রাজার কোনো চারিত্রিক আত্মীয়তাই ঘটেনি। এমন কি এই নাটক সম্পর্কে অভিনেতা কেশববাবুকে লিখিত পত্রে মধুসূদন ইউরোপীয় নাটকের যে "Lofty passion" এবং "Heroism of Sentiment"-এর কথা বলেছেন ভীমসিংহের চরিত্রে তার কিছুমাত্র নেই। মেঘনাদ বধের রাবণ চরিত্রের সেই বিশালতা, সেই তেজদৃপ্ত হাহাকার বজ্র সংঘাতক্ষুব্ধ দৈবলাঞ্ছিত পুরুষকারের সেই মহনীয়তার কোনো ছায়ামাত্র এখানে নেই। ভীত সন্ত্রস্ত নির্গুণ এক কাপুরুষ এই ভীমসিংহের মধ্যে স্বভাবপুত আত্মসম্মানবোধ বা বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব নাই, তার নিজস্ব কোনো কার্যের ফলে বা রাবিস্তত্ত্ব বর্ণিত Error-এর জন্য ও এই নাটকের বিষাদান্ত পরিণতি ঘটেনি। তারজন্যে কোনো Katharsis সৃষ্টি হয় না, Pity বা Terror সৃষ্টি হয় না। সুতরাং তিনি যদি এই নাটকের নায়ক হন (সম্ভবত তাই) তবে এটা কখনোই ট্র্যাজেডি নয়। নাটকের অন্য চরিত্র যেমন বলেন্দ্র অসম্পূর্ণ ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড, অহল্যা অনাবশ্যক, বিলাসবতী অস্বাভাবিক, মদনিকা অতি-পুরুষ, তপস্বিনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ সৃষ্টি। অনাবশ্যক কাব্যভারাক্রান্ত শিথিলগতি ঘটনা ও চরিত্রের দ্বন্দ্বে দীন এই নাটকখানি নাটক হিসাবেও সার্থক নয়।

মাইকেলের পর তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র এবং তার শ্রেষ্ঠ নাটক : 'নীল দর্পন'। একশো দু'বছর আগে (১৮৬০) 'কেনচিৎ পথিকেন অভিপ্রনীতম' এই গুপ্তনামের আড়ালে যিনি এই নাটক লিখেছিলেন তাঁর পরিচিত সাহিত্যিক নাম দীনবন্ধু। দীনবন্ধু সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা লিখেছেন তার বেশি আজ পর্যন্ত কেউ লেখেন নি। তবে ডাঃ সুশীল দে মশাই প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে নীল দর্পনের যে "সাদৃশ্য" দেখেছেন তা একেবারেই ভ্রান্ত। শ্রদ্ধা এক জিনিষ, আর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে অতিশয়োক্তির বিড়ম্বনা অস্বস্ত। বংকিমচন্দ্র তা করেন নি। অথচ দীনবন্ধুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বোধ হয় কারোর চেয়েই কম ছিল না। আসল কথা 'নীল দর্পনে নাট্যকার নাটকের গঠনের দিক দিয়ে 'কুলীন কুলসর্বস্বের' চেয়ে খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেন নি—একে বস্তু-জোড় জুড়ে গঠিত বা প্রচলিত ঘটনাবলীর নাট্যচিত্র বলা যায়—তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়।

প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই হরিশ্চন্দ্রের' হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং নীল দর্পনের দু'বছর আগে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলালে' নীলকরদের অত্যাচারের নানা কাহিনী লোকের মনকে নীলের বিরুদ্ধে বিষিয়ে করে তুলেছে। দীনবন্ধু ঐসব থেকে সাহায্য নিয়েছেন। ঘটনার মিল আছে এমন কি ভাষারও মিল আছে। আর্চিবল্ড হিলস্ এবং কৃষক কন্যা হরমণির ঘটনাই রোগ-ক্ষেত্রমণির ঘটনা। কাজেই নীলদর্পনের ঘটনাচিত্রনে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার চেয়ে (যার কথা আমরা খুব বেশি শুনেছি) সমসাময়িকদের কাছে তাঁর ঋণের পরিমাণই বেশি।

তাঁর রুচি সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা গেছে, যা বংকিমচন্দ্র স্বীকার করেন নি এবং আধুনিক নাট্যসমালোচকরা'ও না। আমরাও করি না। ত্রুটী ওখানে নয়। আসল ত্রুটী নাটকের গঠন এবং পাত্রপাত্রীর সংলাপ যা একে নাট্যচিত্রের বেশি ওপরে উঠতে দেয় নি। নাট্যঘটনায় কোনো বাঁধুনি নেই, দ্বন্দ্ব নেই, এক দৃশ্যের পর অপর দৃশ্য অপরিহার্যভাবে আসে না। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর চরিত্র যেভাবে এসেছে যেভাষায় কথা বলেছে তার মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিকতা থাকলেও নাটকের নায়ক (যদি বিন্দুমাধবকে নায়ক বলা যায়) এবং তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র অত্যন্ত অস্বাভাবিক আড়ষ্ট ক্রিয়াহীন এবং মানসিক দ্বন্দ্ববর্জিত অকারণে অস্থানে আড়াই তিন ইঞ্চি লম্বা সংস্কৃত সমাসবদ্ধ বাক্য বা পয়ার ছন্দের নিকৃষ্ট কবিতা তাদের মুখে। দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। বহু পঠিত আলোচিত ও অভিনীত এই নাটকের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। পড়ে পড়ে মারখাওয়ার একটানা দুঃখের কাঁদুনি থাকলেই সেটা সার্থক বিষাদান্তক নাটক হয় না, ট্র্যাজেডি তো না-ই। অ্যারিস্টটল্ বলেছেন—'Tragedy is essentially an immitation not of persons but of action and life.. ......they do not act in order to portray the characters, they include the characters for the sake of action.... ...a Tragedy is impossible without action। নীলদর্পনের কোনো চরিত্রে এই Action নাই, নাটকেও না। এর আন্তিক বিষাদ-পরিনাম কোনো চরিত্রের চারিত্রিক ত্রুটী বা ভ্রান্তির জন্যে নয়। সেই জন্যে এর শেষ দৃশ্যে একেবারে মড়ার শোভাযাত্রা দেখেও মনে কোনো দাগ কাটে না। সরলতার গলার পা দিয়া সাবিত্রীর নৃত্যাকরণ, পরমুহূর্তে 'শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম', জ্ঞানোদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মূর্চ্ছা ও মৃত্যু এবং সর্বোপরি ঠিক এই চরম মুহূর্তে গোটাতিনেক শবদেহের সামনে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাধবের মুখে "বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিততানে প্রস্ফুটিত বনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ মন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়" ইত্যাদি সংলাপ বা পয়ারে বিলাপান্তর উপবেশন—শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে নাটকখানিকে একেবারেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। দৃষ্ট বা পঠিত বা শ্রুত তথ্যের ওপর যেখানে নাট্যকার রং চড়াতে গেছেন সেখানে তা বিকৃত অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচার দেখানোর আগ্রহে তিনি পারম্পর্যহীন ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন, আর কোনো দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। কোনোকালেই এই নাটক ঠিক যেমন আছে তেমনি করে অভিনয় করা হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং যে অতি-নাটকীয় দৃশ্যটার শ্লীলতা প্রভৃতি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সেইখানেই হাততালিও যে পড়েছে সবচেয়ে বেশি, এটা আমাদের অভিজ্ঞতা। বস্তুত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাট্যচিত্রের শিল্প ও রসপরিণতি উদ্দেশ্যচেতনার দ্বারাই সীমাবদ্ধ থাকে। এই জন্যেই ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বোধহয় বলেছেন: "নাটক হিসেবে নীলদর্পণের ত্রুটী অনেক। উদ্দেশ্যমূলক রচনা মাত্রই চিত্রের দিক দিয়া একটু অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে।......... উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের মূল্যও সাময়িক।' বংকিমচন্দ্র সার্থকভাবেই Uncle Tom's cabin এর সঙ্গে নীলদর্পণের তুলনা করেছেন। মিসেস্ ষ্টোর সাহিত্য ও শিল্প গুনে নিকৃষ্ট এই চাঞ্চল্যকর উপন্যাসখানি আমেরিকা থেকে দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছিল আর 'নীলদর্পনে' এদেশ থেকে 'নীলকরনিকর' উচ্ছিন্ন হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে একথা অবশ্য স্বীকার্য।

দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্র। মাঝখানে অবশ্যি থাকেন জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু কেন বোঝা যায় না, নাট্য ইতিহাসকারবা এঁর কোনো মৌলিক প্রতিভা ছিল বলে স্বীকার করেন না। সে কি তাঁর বাইশখানা অনুবাদ নাটকের জন্যে? কিন্তু অনুবাদ ছাড়া আরো ৮।৯ খানা মৌলিক নাটক ও তাঁর আছে তো? কৃষ্ণ কুমারীকে যাঁরা ট্র্যাজেডি বলেছেন, অশ্রুমতী বা সরোজিনীকে তাঁরা তা বলেন নি কেন, ঠিক বোঝা যায় না। যাই হোক, পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে এর প্রভাব কিন্তু অসাধারণ—গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথেরও পথিকৃৎ জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, এই মৌল্য তথ্যটুকু স্মরণ রাখা ভালো।

স্বর্গত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বাংলা রঙ্গালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করে বলেছেন: তিনি অন্ন দ্বারা ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।...সেইজন্য তিনি Father of the Native Stage—ইহার খুড়ো জ্যাঠা আর কেহ কোনোদিন ছিল না।' [বঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর] কথাটা মিথ্যে নয়। তখন একাদিক্রমে পাঁচশো ৩ শ' রাত্রি ধরে কোনো নাটক অভিনয় কল্পনাতীত ছিল। একখানি নাটকের উদ্বোধনের পরদিন থেকেই পরবর্তী নাটক তৈরী করতে হতো। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ দিয়ে যাত্রা শুরু করার সময় (১৮৭২) গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এলেন না। তারপর যখন এলেন তখন থেকেই পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রকৃত যাত্রারম্ভ। তখন থেকেই তিনি একে পিতার মতই লালন করেছেন—অভিনয় করে, অধ্যক্ষতা করে, ম্যানেজারি করে এবং নাটক লিখে। তিনি নাটক লিখেছেন, ৭০।৭২ খানা, তার মধ্যে জনা এবং প্রফুল্লই তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটক বলে বিঘোষিত। কথাটা চোখ বুজে মেনে নেবার আগে একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করে দেখা যাক।

'জনা'কে শেক্সপীয়র প্রভাবিত নাটক বলে উল্লেখ করা হয়। আমরা কিন্তু এতে কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের একখানি যাত্রাপালা ছাড়া বেশি কিছু দেখিনি। নীলধ্বজ বা প্রবীরার্জুন যাত্রা পালা আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে। সুতরাং জনাকে একারণে "দেশীয় পাত্রে বৈদেশিক রস" পরিবেশনের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করার সার্থকতা কোথায়? 'জনা'র চরিত্র? স্বামীপুত্র শোকে 'ক্ষিপ্তা' মারগারেট (Richard III) আর পুত্রশোকে ক্ষিপ্তা জনার মধ্যে সাদৃশ্য শুধু ক্ষিপ্ততায়। এর বিদূষকের সঙ্গে স্যার জন ফলস্টাফের (Henry IV) সাদৃশ্য যাঁরা আবিষ্কার করেছেন তাঁদের পাণ্ডিত্য হয়ত প্রখর, কিন্তু জনার অতিনাটকীয় অতিপৌরুষের আচরণকে মারগারেটের আচরণের সঙ্গে তুলনা করা চলে কি? বরঞ্চ মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' থেকেই যে এই 'জনা' চরিত্রটি এসেছে, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় সহজে। বীরাঙ্গনায় জনা নীলধ্বজকে বলছেন, নগরে রণশঙ্কা কেন মহারাজ?

'..... কোন হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে,
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে?

জনা নাটকেও জনা নীলধ্বজকে বলছেন, নগরে মহোৎসব মহা আয়োজন কেন মহারাজ?

……… কার অভ্যর্থনা হেতু?
বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার?
কিংবা রাজা, সাজিছে বাহিনী
পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে?

তাহার অভিনয়ও লক্ষ্যণীয়। 'জনা'র শেষ দৃশ্য লক্ষ্য করলে এর যাত্রাধর্মিতাও সুস্পষ্ট হবে। ভীষণ বীরবিক্রমে অস্বাভাবিক আস্ফালনের পর জনা'র গঙ্গাজলে ঝম্পপ্রদান দেখে আমাদের মনে যদি কোনো দুঃখ হয় তা ট্র্যাজিক মহিমার মহান দুঃখ নয়, একটা লোককে ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে দেখলে যা হয় সেই অপঘাতমৃত্যুর দুঃখ। কিন্তু নাটক এখানেই শেষ নয়। জল থেকে অকস্মাৎ জাহ্নবী দেবীর উত্থান ও অর্জুনকে অভিশাপ প্রদান এবং কৃষ্ণের সংলাপে প্রদর্শিত উজ্জ্বল দৃশ্যে কৈলাস শিখরে হরপার্বতীর পুত্রসহ প্রবীর এবং গঙ্গাগর্ভে মকরবাহিনী ভাগীরথীর পাশে জনা'র চামরব্যজন এবং নীলধ্বজের সংলাপ "অজ্ঞান তিমির বিনাশন জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন"—দিয়ে নাটক শেষ। এ নাটক যাত্রাধর্মী পেশাদারী থিয়েটারের প্রথম যুগের একেবারে নিজস্ব ব্যবসায়িক নাটক—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকও তাই।

তাঁর অসামান্য কীর্তির স্তম্ভ তাঁর সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'। 'প্রফুল্ল' কিন্তু প্রফুল্লর নাটক নয়, যোগেশের। নামটি সর্বাংশে অসার্থক হলেও বলা যায় 'What's in a name?'

বহু নাটক (উপন্যাসের নাট্যরূপ, গীতিনাট্য ও পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসন) লেখবার পর টাবে 'সরলা' নামে একখানি সামাজিক নাট্যচিত্রের সাফল্য দেখে মালিক পক্ষের পীড়াপীড়িতে 'প্রফুল্ল' লেখা হয় (অপরেশ বাবুর রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নাটক লেখার ইচ্ছা গিরিশচন্দ্রের ছিল না, "নিতান্ত বাধ্য হয়ে Out of sheer necessity" তিনি নাটক লেখেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন [গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য, ১৮ পৃঃ]। যদিও বা নাটক লিখলেন, সামাজিক নাটক লিখতে একেবারেই তিনি চান নি, একে বলেছেন: 'নর্দমা-ঘাঁটা'। যাই হোক শেষ পর্যন্ত যে নর্দমা তিনি ঘেঁটেছেন তা কলকাতার এক বিশেষ এলাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর্দমা মাত্র—এর বাইরে তাঁর দৃষ্টি যায় নি। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত লোকেদের অন্তর্দ্বন্দ্বও তাঁর নাটকে নেই—নেই কোনো বিদ্রোহের চিত্র। একই ঘটনা একই চরিত্র যেন ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর সব সামাজিক নাটকে। যোগেশ, হরিশ, করুণাময়, প্রসন্ন, কালীকিংকর, উপেন্দ্রনাথ প্রিয়জনের প্রতারণায় বা আঘাতে আহত, অসংবদ্ধ-প্রলাপী এই সব গৃহকর্তাদের মধ্যে আত্মীয়তা লক্ষ্যনীয়। হয় তিনি এদের চেয়ে মহৎ কোনো সংগ্রামী চরিত্র দেখেন নি, নয়ত এই ধরণের চরিত্র অভিনয় করতে তিনি নিজে ভালোবাসতেন—এই দুটোর যেকোন একটা বা দুটোই হয়ত সত্য। 'প্রফুল্ল' থেকে যে একটানা কান্নার সুর সুরু হলো, তাঁর সবগুলো সামাজিক নাটকেই সেই একই সুরের প্রতিধ্বনি।

প্রবীন নাট্যইতিহাসকার হেমেন দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এবং আরো কয়েকজন

প্রাচীন এবং আধুনিক বিজ্ঞ সমালোচক 'প্রফুল্ল'কে সার্থক ট্র্যাজেডি বলেছেন। দাশগুপ্ত মশাই আরো একটু এগিয়ে একেবারে একে ইবসেনের 'যেকোনো নাটকের সঙ্গে তুলনীয়' বলে উল্লেখ করেছেন। ডাঃ সুকুমার সেন একে "গিরিশচন্দ্রের আদর্শ ট্র্যাজেডি" বলে আবার বলেছেন "সম্পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটক" তবে সঙ্গে সঙ্গে এ ও বলেছেন যে অতিরিক্ত রং ফলানো না হলে এখানি "প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি হইতে পারিত"। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'প্রফুল্ল'কে ট্র্যাজেডি বলে স্বীকার করেননি এমনকি, শিল্পসৃষ্টির দিক থেকেও উন্নতধরণের কোনো রচনা বলে স্বীকার করেন নি। তিনি নাটকখানি নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলেছেন—'ইহার মধ্য দিয়া যেমন অবস্থাগত কোনো বৈপরীত্য দেখান সম্ভব হয় নাই, তেমনি অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম দ্বারা ঘটনাতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবারও চেষ্টা করা হয় নাই। ইহা একটানা দুঃখের পাঁচালী মাত্র। অতএব এই কাহিনীর মধ্যে নাট্যগুণ কিছুই আশা করা যায় না।...... গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা সামাজিক নাট্যরচনার প্রতিকূল ছিল।' (বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪২৩-৪২৭)। এর ওপর অবশ্য মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে যাঁরা ইবসেনের নাম করেছেন এই প্রসঙ্গে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া দরকার, শ্রদ্ধাপ্রকাশ করতে গিয়ে যাঁরা হাস্যকর অতিশয়োক্তি করেন তাঁরা নিজেরা শ্রদ্ধা হারান এবং শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় করে ফেলেন। বস্তুত নাটক হিসাবেই 'প্রফুল্ল' অসার্থক, কারো সঙ্গে তুলনার কথা না তুলেই একথা বলা যায়। সমস্ত নাটকখানি কয়েকটি অবিশ্বাস্য অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের ভারে অনাবশ্যকভাবে ভারাক্রান্ত। ব্যাংক ফেল হওয়ার যে বাহ্যিক ঘটনা থেকে এই শোকান্ত নাটকের সূত্রপাত সেইটাই অত্যন্ত দুর্বল। কদিনের মধ্যেই ব্যাংক আবার টাকা দিতে সুরু করবে জানা গেল। যোগেশ ব্যাংকে যেতে গিয়েও যেভাবে শুঁড়ির দোকানে ঢুকে পড়লেন তাতে মনে হবে নাট্যকার যোগেশকে ব্যাংকে যেতে দেবেন না বলেই ঠিক করেছেন। যোগেশ মদ্যপায়ী নাটকের সুরু থেকেই—মাতাল হ'লো ব্যাংক ফেলের খবর পেয়ে। আর তার পর থেকে শেষ পর্যন্ত সে শুধু মাতাল নয়—ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় ক্লীব। একটা লঘু এবং নিবার্য ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তারই ওপর যে ঘটনার জাল বোনা হল তার ভিত কাঁচাই রয়ে গেল। মত্ত অবস্থায় সব বুঝেও রমেশকে দলিল সই করে দেওয়া, জ্ঞানদার বুকে লাথি মেরে টাকা কেড়ে নেওয়া এবং তার পথে পড়ে মরা, যোগেশের ঠিক মৃত্যুকালে উপস্থিতি, নিরপরাধ সুরেশের জেলে পাথর ভাঙা, তার জন্যে দাদার মাতলামি বৃদ্ধি, মা'র পাগল হওয়া, যাদবের মুখে প্রায় অন্তিমকালে প্রৌঢ়সুলভ সংলাপ, শেষলগ্নে প্রফুল্ল-হত্যা, মার ছুটে এসে পতন ও মৃত্যু এবং একেবারে সবশেষে যোগেশের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলার জন্যেই আসা—এ সমস্ত ঘটনাগুলোই যেন অবিশ্বাস্য সাজানো ব্যাপার বলে মনে হয়—। এই সব অতিনাটকীয় ঘটনার পেছনে বিশ্বাস্য কোনো কারণ নেই, যুক্তিহীন অশ্রুর বন্যায় নাট্যকার সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, নায়ক হিসেবে যোগেশ তার জীবনের শোচনীয় পরিণামের জন্যে কতটুকু দায়ী? তার নিজের কোন্ Tragic Error-এর জন্যে এই বিষাদ-পরিণাম? এটা রোধ করার জন্যে সে নিজে কী করেছে? তবে কি সে নিষ্ক্রিয় নায়ক? অর্থাৎ গোড়ায় Hamartiaর যে অন্তর সংজ্ঞার কথা বলেছি (more acted upon, than acting), তাই? এই সূত্র

ধরেই কোনো কোনো বিজ্ঞ আধুনিক সমালোচক বলেছেন, 'Passive Hero' বলে একরকমের ট্র্যাজিক হিরো আছে, এই যোগেশ সেই জাতের। এঁরা সাক্ষী হিসেবে Lear এবং Hamletকে এনে হাজির করেন। কিন্তু লীয়র-এর প্রসঙ্গে—সকলেই যাকে নির্বিচারে উল্লেখ করেন সেই—নিকল সাহেব বলেছেন—"...his rejection of Cordelia is an action that takes its rise directly from his own character and temper and it is the immediate cause of his future sufferings." (Theory of Drama-P149), যে লীয়র নাটকের 'initial motive-power' জুগিয়েছেন, যার ভুলের অন্তর্দাহে শেষপর্যন্ত তিনি ক্ষতবিক্ষিত তাকে যোগেশের মত নিষ্ক্রিয় বা ক্লীব বলে কল্পনা করা একটু কষ্টকর নয় কি? আর Hamlet? যার তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব ও সুগভীর চিন্তাপ্রবণতা প্রতি-মুহূর্তে তাকে বাধা দিয়েছে "to take arms against a Sea of Troubles", শেষ দৃশ্যে যে প্রচণ্ড আত্ম-শক্তির পরিচয়ও দিয়েছে সে নিষ্ক্রিয় নায়ক? এই দুটি ট্র্যাজিক নায়কের কোনো ছায়ার ছায়ামাত্রও যোগেশের চরিত্রে থাকলে 'প্রফুল্ল' হয়ত সার্থক হতে পারত নাটক হিসেবে।

এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রমেশ অতিরিক্ত শয়তান—যার শয়তানীর কোনো উদ্দেশ্য নেই, সুরেশের ঘটনাটিই অবিশ্বাস্য—তার অকারণ ওঃখভোগও কোনো সহানুভূতির উদ্রেক করে না—কাঙালী ও জগমণি অস্বাভাবিক, মদন ও অবাস্তব এবং জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল অপরিস্ফুট চরিত্র।

গিরিশচন্দ্র পেশাদার রঙ্গালয়ের জনক ও প্রতিপালক হিসেবে দর্শকের চাহিদা মেটাতেই নাটক লিখেছেন। তখন ধর্মোন্মাদনার যুগ। ক'জেই তাঁকে ধর্মমাহাত্ম্য প্রচার করবার নাটক লিখতে হয়েছে। জালজুয়াচুরি, মামলামোকদ্দমা, প্রতারণা, শঠতা'র সঙ্গে হত্যা মিশিয়ে তাঁকে সামাজিক নাটক লিখতে হয়েছে। দেশাত্মবোধের জোয়ার এলে সিরাজকে হিরো করে স্বদেশী নাটক লিখতে হয়েছে। এমনকি, কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষেও যেমন, মহারাণীর হীরক জুবিলী বা মৃত্যু উপলক্ষেও তেমনি তাঁকে কলম ধরতে হয়েছে। এত বেশি নাটক আর কেউ লেখেন নি। সার্থক নাটক লেখা যে তাঁর দ্বারা অসম্ভব ছিল তা নয়। কিন্তু দর্শকের চাহিদা ও রঙ্গালয়ের ক্ষুধা মেটাতেই তিনি নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছেন—গভীর অন্তদৃষ্টি দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে সর্বাংশে সার্থক করে তোলবার দুর্লভ অবসরই তিনি পান নি। শুধু বাঙালীর নাট্যচেষ্টার ইতিহাসে তিনি একাই একটি যুগ এবং গৌরবময় যুগ।

—এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত।

গিরিশচন্দ্রের ধারা অনুসরণ করে এলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল। ক্ষীরোদপ্রসাদের ছেচল্লিশখানি নাটকের মধ্যে 'প্রতাপাদিত্য' ও 'আলমগীর' শ্রেষ্ঠ বলে বিজ্ঞাপিত। এ দু'খানিই ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু দু'খানি নাটকেই দেখা যায় শুষ্ক ইতিহাসের হলেও চমকদার উৎকল্পনায় তোড়ে ইতিহাস আরব্যোপন্যাসে পরিণত। 'প্রতাপাদিত্য' নাটক হিসেবে 'আলমগীর'এর চেয়ে নিকৃষ্ট। এর অসম্ভব ঘটনা সংস্থাপন, অস্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি ও নাট্যশৈলী নাট্যকারের ব্যর্থতা'র সাক্ষী। যুগের হাওয়া'য় পাল

তুলতে গিয়ে স্থানে অস্থানে স্বদেশী বক্তৃতা, হিন্দুমুস্লিম মিলনের বাণী, বক্তার মুখ দিয়ে বৃটিশ বিরোধী প্রচার—এসমস্তই কৌশলে দর্শক আকর্ষণের বহুমুখী চেষ্টামাত্র। এই সম্পূর্ণ অসার্থক নাট্যপ্রচেষ্টার গৌরব যতো কম করা যায় ততোই ভালো।

স্বর্গত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসামান্য অভিনয় প্রতিভার গুণে যে ক'খানি ব্যর্থ নাটক মঞ্চে সার্থকতা লাভ করে 'আলমগীর' তাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর এই নাটক নিয়েই শিশিরকুমার পেশাদার রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করেন। নাটকখানিকে নাটক না বলে বিপুলকায় বিশৃংখল এক দৃশ্যপঞ্জী বলাই বোধ হয় সঙ্গত। অবান্তর ঘটনা, অকারণ চরিত্রের অবাঞ্ছনীয় ভীড়ের মধ্যে প্রধান হলো দু'টী গল্প : উদিপুরী রূপকুমারী আর আলমগীর-রাজসিংহ।

নাট্যকার নিজেই কতকগুলো দৃশ্য তারকা চিহ্নিত করে বলে দিয়েছেন, এগুলো বর্জন করলেও নাটকের "সৌন্দর্য বা রসহানি হবে না।" তাহলে নাটকের "সৌন্দর্য এবং রসহানি" করবার জন্যে কষ্ট করে এগুলো লিখেছিলেনই বা কেন? ডাঃ সুকুমার সেন এই জন্যেই বোধ হয় বলেছেন : 'ঘটনার ভীড় ও ভূমিকার বাহুল্য না থাকিলে নাটকটী উৎকৃষ্ট হইত।' আমরা আর একটু বেশি বলি : তার সঙ্গে আরো কিছু থাকলে তবে এখানি নাটক হতো। অনেকে (বিশেষ করে ভাদুড়ীমশাই-এর অভিনয় দেখবার পর) এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীরের চরিত্র চিত্রণকে নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখি, আলমগীর সারা নাটকে খালি 'আমি আলমগীর, আমি আলমগীর' বলে একটা অসার দম্ভ প্রকাশ করে চলেছে, আসলে সে ভীরু, কাপুরুষ ('এক একদিন একটা মশার গানেও শিউরে ওঠে')। এই বিপর্যস্ত মনোবিকারের রোগীর নাকি দুটো সত্তা আছে, একটা ঘুমালে অন্যটা জাগ্‌লে জাগে। মনোবিজ্ঞান দ্বারা অস্বীকৃত এই ধরনের ego-centric চরিত্র একেবারে থিয়েটারী ঢং-এ রং করা। শেষকালে পরাজিত হতমান, পর্যুদস্ত অথচ মৃত্যুপথযাত্রী আলমগীরকে দিয়ে রাজসিংহকে আলিংগন করিয়ে নাট্যকার ঐতিহাসিক উৎকল্পনার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেও তিনি থিয়েটারী হাততালি পেয়েছেন সুলভেই। এই অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের অসংবদ্ধ প্রলাপ আমাদের মনে হাস্যরসের সৃষ্টি করে, সহানুভূতি নয়, শ্রদ্ধাও নয়।

কবিরা নিরঙ্কুশ। নাট্যকারও হয়ত বা। নইলে বীরাবাঈ মেবার ছেড়ে রূপনগরে এলেন, ভীমসিংহ জয়সিংহ এলেন আলমগীরের কাছে, রূপকুমারী এলেন উদিপুরীর শিবিরে, ঔরংজেব আলিংগন করলেন রাজসিংহকে—এমন সব অবিশ্বাস্য ঘটনা এ নাটকে এলো কি করে? এলো কি করে বীর-করুণ-হাস্য প্রভৃতি রসের ছড়াছড়ির মধ্যে দেশপ্রীতি, পতিভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, প্রভুভক্তি, কর্তব্য-পরায়ণতার এত নাটুকে সমারোহ? এলো কি করে জাতির দুর্দিনে "মহাত্মার" আবির্ভাবের কথা, সত্য, ত্যাগ, আত্মবল ও শুদ্ধির কথা, জাতীয় নবজাগর গানের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এত বক্তৃতা?

স্মরণ করি অপরেশচন্দ্রকে : 'Sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূল মন্ত্র হইয়া নাট্য-সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছেন যে সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনা অবলম্বন করিয়া বাংলার নাট্যশালা উদর পুরণ করিয়াছে, মনের খোরাক কিছুই আহরণ করিতে পারে নাই।'

('রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর'—১৩৮)

এ কথা ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে সত্য, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও। দুজনেই পেশাদার নাট্যশালার দিকে চেয়েই নাটক লিখেছেন, গিরিশচন্দ্রের মত রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক 'সাজাহান' এবং 'চন্দ্রগুপ্ত'—'নূরজাহান' নহে। 'নূরজাহান'কে যাঁরা মিডিয়া, লেডি ম্যাকবেথ, ক্লাইটেমনেস্ট্রা প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে একে একেবারে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সমপর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন তাঁদের নাট্যতত্ত্বজ্ঞান ও নাট্যবিচারবুদ্ধি মোহগ্রস্ত। এই নাটক-খানিকে আমরা আদৌ আলোচনার যোগ্য মনে করি না। 'সাজাহান' নাটকখানিতে বহু চরিত্র, বহু ঘটনা—কাহিনী এবং উপকাহিনী। সুতরাং বহু অবান্তর বিষয়ের ভীড় স্বভাবতঃই এর মধ্যে এসে পড়েছে। নাটকের নাম 'সাজাহান'—কিন্তু সাজাহান এর মুখ্য চরিত্র নন, তিনি নিষ্ক্রিয় অসহায় দর্শক মাত্র—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর একই অবস্থা। সুতরাং নামটি অসার্থক। এ নাটকের নায়ক কুটচরিত্র ঔরংজেব—নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অত্যাচারী, কপট এক শয়তান। মাঝে মাঝে সে খোদার নাম মুখে এনেছে, কিন্তু তাতে তার কপটতাই প্রকাশ পেয়েছে। তার বিবেক-দংশনও ক্ষণস্থায়ী, শেষ দৃশ্যে তার আত্মসমর্পণ জাহানারা ও জহরতের মত দর্শকদের কাছেও কপট বলে মনে হবে।

কোনো কোনো সমালোচক সাজাহানকেই নায়ক এবং ঔরংজেবকে প্রতিনায়ক বলে উল্লেখ করে বলেছেন, সাজাহানের জীবনের করুণ পরিণতিই এই নাটকের ট্র্যাজেডি এবং তিনি প্রথম দৃশ্যে দারার হাতে রাজ্যাধিকারের প্রতীক পাঞ্জাটী তুলে দিয়ে যে ভুল করলেন, তারই ফলে ভ্রাতৃবিরোধ এবং এই নাটকের সমস্ত বিষাদকরুণ ঘটনা। কথাটা কি সত্য? বিরোধ কি আগেই বাধেনি? জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে ক্ষমতা দিয়ে সাজাহান কি 'ভুল' করেছেন? না দিলে কি পরবর্তী শোচনীয় ঘটনাগুলো ঘটতো না? আমাদের এই পাঞ্জা দেওয়া ব্যাপারটীকে আদৌ কোনো ট্র্যাজিক ভ্রান্তি বলে মনে হয় না। আসলে এই বহু-ঘটনা-বিম্বিত নাটকে নাট্যকারের ইতিহাস-অনুবর্তিতাই নাট্য-গঠনকে দুর্বল করেছে এবং এই সময়কার যাবতীয় ঘটনা দেখাতে গিয়ে নাটকীয় রসকৌতুহল বিনষ্ট হয়েছে। তাঁর বক্তৃতাধর্মী সংলাপে ভাষার নূতন ঐশ্বর্য—গদ্যে কাব্যের বর্ণচ্ছটা—কিন্তু তাতে শুধু প্রধান চরিত্রগুলোকে ভারাক্রান্ত এবং অস্বাভাবিক করেই তুলেছে। ভাবের বন্যায় ভাষার ঝংকারে একটী যুক্তিবাদী প্রজ্ঞাবান কবি মন যেন নিজের অজ্ঞাতে সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে—ঔচিত্যকে অস্বীকার করেছে। 'সাজাহান' সাজাহানের ট্র্যাজেডি নয়। প্রথম দৃশ্যে তাঁর যে অবস্থা শেষ দৃশ্যেও তাই। শুধু ঔরংজেব এসে নতজানু হয়ে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করলো আর তিনি মার্জনা করলেন। এ ট্র্যাজেডি নয়, ভালো মেলোড্রামাও নয়।

'সাজাহানে' দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন ইতিহাসকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তেমনি তার ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। হিন্দুদের ইতিহাসের উপাদান কম। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, সেলুকস,

য়্যান্টিগোনাস, নন্দ, মুরা, সেকেন্দার প্রভৃতি চরিত্রের ইতিহাস যে নেই তা নয়। কিন্তু নাট্যকার নিজের কল্পনার রং মিশিয়ে এবং কিছুটা কিংবদন্তী আশ্রয় করে এইসব চরিত্রকে ইতিহাস পুরাণ থেকে সরিয়ে এনেছেন অনেকখানি। অবশ্য যদি নাটক সার্থক হয় তবে নাট্যকারের এ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধে না। কিন্তু নাটক হিসেবে 'চন্দ্রগুপ্ত' সাজাহানের চেয়েও অসার্থক। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেরও নামকরণ অসঙ্গত হয়েছে, চাণক্যের প্রাধান্য দেখে সহজেই একথা মনে হবে। চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রটির কোনো নিজস্ব শ্রী নেই, চাণক্যের হাতের পুতুল এই চরিত্রটির চারিত্রিক গঠনের ত্রুটী উপেক্ষনীয় নয়। হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের মিলনের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাটকে তৈরী করা নেই—শুধু উভয় দেশের মিলনের জন্যে একটী সরলা পার্বত্য মেয়ের সহজ হৃদয়বৃত্তিজাত প্রেমকে উপেক্ষা করে এটা যেন ইতিহাসের দাবীতে এবং খানিকটা গল্পের জোরে প্রক্ষিপ্ত। ছায়া অকারণে উপেক্ষিতা।

এই নাটকের প্রধান কাহিনী হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য-মুরার গল্প—সেলুকস-য়্যান্টিগোনাস হেলেনের গল্পটী এবং ছায়া চন্দ্রকেতুর ব্যাপারটী এর উপকাহিনী। গ্রীক নাট্যরীতি এবং এলিজাবেথিয় নাট্যরীতি অনুসারে উপকাহিনী যে কেবলমাত্র ঘটনা সৌসাদৃশ্যে মূল কাহিনীকে অনুসরণ করবে তা নয় তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণেও সাহায্য করবে। এর উপকাহিনী চটী চন্দ্রগুপ্তর কাহিনীকে সাহায্য করেনি, একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেনি—গতিতে সাহায্য করেনি। শেষ দৃশ্যে সকলকে এনে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাটা কষ্টকল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত মনে হয় এই জন্যে যে এর জন্যে কোনো পুর্বপ্রস্তুতি নেই নাটকে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রধান চরিত্র চাণক্য সুস্থ স্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ নয়। প্রথম প্রবেশ থেকেই তাকে প্রকৃতিস্থ মনে হবে: [কুশ ছেঁড়া এবং 'প্রভাতের সর্বাংগে ঘা, পুঁয পড়ছে', 'হে সুন্দরী বীভৎসতা' প্রভৃতি সংলাপ স্মরণীয়]। সমাজ, রাষ্ট্র ও ঈশ্বরকে সে মানে না, ব্রাহ্মণ্যবোধ তার টনটনে কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মে আস্থা নেই—এক হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ নরঘাতী এই ব্রাহ্মণের দর্প ও অহংবোধ অসামান্য।

ইতিহাসের কুটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ ও সমাজনীতিবিদ কৌটিল্য এ নয়। এ ডি, এল, রায়ের বিশেষ সৃষ্টি—তাঁর রোমান্টিক ভাবলুতার অতিনাটকীয় নাট্যচরিত্র। এই রকম একটি চরিত্রের কন্যাস্নেহের মেলোড্রামাটিক অভিব্যক্তি সত্যি বলে বিশ্বাস করা যায় শুধু কোনো শক্তিমান অভিনেতার অভিনয়-গুণে (প্রেয়সী'র সঙ্গে কথা বলাটাও শুধু অভিনেতার ব্যাখ্যা'তেই অর্থময় হয়)। এই নাটকে কাত্যায়ন আর একটি ব্যর্থ সৃষ্টি। এই কাত্যায়ন কি বৈয়াকরণ কাত্যায়নের প্রেতমূর্তি! পানিনি নিয়ে এর রসিকতা কি সমাচীন? এর সাত ছেলেকে নন্দ খুন করেছিল কেন? তার পর একেই বা আবার মন্ত্রী করলো কেন? ভীরু, বিশ্বাসহন্তা, কিছুটা নির্বোধ এই চরিত্রটিকে দিয়েই নন্দকে হত্যা করানো হলো চাণক্যের হুকুমে। মঞ্চে এভাবে হত্যা অনুষ্ঠান অসঙ্গত। কিন্তু ততোধিক অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক এবং অনৈতিহাসিক কাত্যায়নের চরিত্রটি। মুরার চরিত্র যেভাবে এসেছে তাতে তাকে যেন সুসমঞ্জস চরিত্র বলে মনে হয় না। সেলুকস গ্রীক

সেনাপতি বা সমগ্র এসিয়ার গ্রীক সম্রাট নন, একটি বাঙ্গালী বাপ মাত্র—এন্টিগোনস কষ্টকল্পিত নাটুকে চরিত্র, নামটি ছাড়া ইতিহাসের সঙ্গে এ চরিত্র একেবারেই সম্পর্ক শূন্য। হেলেন ও ছায়া অসম্পূর্ণ। এ নাটকের ভাষাও "প্রধূমিতা প্রজ্জ্বলিতা প্রবাহিতরক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভাবভঙ্গি"র সঙ্গে "এরণ্ডের আস্বাদ, উর্ণনাভের ত্বক"-এর এক অনাস্বাদিতপূর্ব ব্যঞ্জন। শিথিলবদ্ধ কয়েকটি কাহিনীর এই নাট্যগ্রন্থনে এতগুলি মারাত্মক ত্রুটী একে ভালো নাটকের পর্যায়ে উন্নীত হতে দেয়নি।

দুর্বল অসার্থক নাটকও অভিনয়গুণে দর্শকমন জয় করে নেয়, এর প্রমাণ আমাদের দেশে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এর ফল হয়েছে কিন্তু উল্টো। মঞ্চসফল নাটকমাত্রেই যে অসাধারণ নাটক, আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝেছি এবং শ্রদ্ধাবশতঃ সত্যভাষণে বিরত থেকে বা বিপরীতভাবে বলা যায়, অযোগ্যকে যোগ্যতার প্রশংসা দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের পর যোগেশচন্দ্র। তাঁর দিগ্বিজয়ী নাটক 'দিগ্বিজয়ী' এবং 'সীতা'—প্রযোজনাগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়গুণেই কেবল সার্থক, এর চেয়ে একটুও বেশি কিছু নয়। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' আর্ট থিয়েটারের বিজয়বৈজয়ন্তী, কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রেণীর অভিনেতার অভিনয়, সাজপোষাক ও দৃশ্যপটের অভিনবত্বে প্রচণ্ডভাবে মঞ্চসফল। নরনারায়ণ, প্রিয়া, কিন্নরী, বঙ্গে বর্গী, দেবলাদেবী, মিশরকুমারী, কারাগার, মীরকাশিম, গৈরিক পতাকা, সিরাজউদ্দৌলা, স্বামীস্ত্রী, তটিনীর বিচার, পি. ডব্লিউ. ডি, মাটির ঘর, দুই পুরুষ, ডোলা মাষ্টার এবং এই রকম আরো বহু নাটকের নামকরা যায় যা গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল-এর নাট্যরচনার ধারাকে অবলম্বন করেই এগিয়ে এসেছে এবং মঞ্চে অভিনয়গুণে বা অন্য কারণে প্রচণ্ডভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌খানিকে সার্থক নাটক বলা যাবে ?

সেইজন্যে পেছনদিকে তাকিয়ে সত্যি কথাটা বলাই ভালো : বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের ভালো নাটক, নাটক হিসেবে সার্থক নাটক আজ পর্যন্ত একখানাও লেখা হয়নি। এবং এই সত্যস্বীকৃতির সূত্র ধরে এর কারণ অনুসন্ধান করা উচিত এবং তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করা উচিত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি কারণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

> 'একশত বৎসরের অধিককালের সাধনায়ও বাংলাসাহিত্যে যে আজ পর্যন্ত একখানিও সার্থক নাটক রচিত হইতে পারে নাই .....তাহার মূলে বাংলা রঙ্গমঞ্চও কোনোদিক দিয়া জড়িত কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। নাটক যখন রঙ্গমঞ্চের অধীন হইয়া পড়ে, রঙ্গমঞ্চ নাটকের অধীন হয় না তখন যে নাটকের মধ্যে ত্রুটী দেখা দিবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।'

[বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম—২১-২০পৃঃ]

আমাদের মনে হয়, এটী ছাড়া অন্য কারণও আছে। কিন্তু সে পৃথক প্রসঙ্গ।

●

নবনাট্য : নবরীতি

॥ শ্যামল ঘোষ ॥

['নবরূপকার' 'সমকাল' নাট্য-সংস্থার নব প্র.ব.প.-প্রধানরূপে [illegible] ; প্রধান 'সমকালী' তাঁর নিজস্ব নাট্য-প্রযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখছে

ইতিহাসের মাপকাঠিতে প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান এই তিন ভাগে কালকে পরিমাপ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগের অজ্ঞতা যেমন মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসজনিত বর্বরতায় আশ্রয় নিয়েছিল বর্তমান যুগ তাই মধ্যযুগের কাছ থেকে যাবতীয় ভুলের মাশুল সুদে-আসলে আদায় করে নিয়েছে। বাংলা নাটকেও এই তিন যুগ স্পষ্ট। প্রাচীন কালের বাংলা নাটক কিছুটা উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলেছে। তদানীন্তন নাট্যলোকের প্রধান ব্যক্তিরা দেশের আপামর জনসাধারণকে আনন্দ দেবার চেষ্টাই করেছেন ; ফলে বুদ্ধিবৃত্তি বিশ্লেষণার প্রভাব স্বীকৃতি পায়নি। শিল্পবোধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ করলেও প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্থূল। আদিম মানুষের মনেও 'নার্সিসাস্ কমপ্লেক্স্' ছিল—লতাপাতা উল্কি ইত্যাদিতে নিজেকে সাজানোর চেষ্টা—অথচ এর পেছনে তাদের যেমন কোনো সচেতন শিল্পজিজ্ঞাসা ছিল না, প্রাচীনকালের বাংলা নাটকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগীয় চিন্তাতে কিছু ধারণা এবং বোধ স্পষ্ট হলেও সচেতনতা একক্ষেত্রেও অপরিচ্ছন্ন। এরও পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমান যুগে সমস্ত রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটল। শিক্ষা সম্পর্কে এলো সচেতনতা কিছু নতুন বোধ এবং ভাবনা এতকালের অ-সংস্কৃত চিন্তা এবং কর্মকে পরিশুদ্ধ করতে লাগল।

নবনাট্য আন্দোলনে 'নব' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গেলে বর্তমানকালই আলোচনায় প্রাধান্য পাবে। বর্তমান অর্থাৎ আধুনিককালে মূল যে ভাবনাগুলো যুগকে চালিত করল তা মোটামুটি এইভাবে বলা যাচ্ছে।

(১) মানবিক মর্যাদা স্থাপন।

(২) প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী।

(৩) বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার।

। বাহান্তর ।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে এই তিনটি সত্যে বিশ্বাসী মানুষ সচেতন মনন এবং কর্মে যে যুগ সৃষ্টি করল তা-ই 'নব' বা নব্যযুগ।

যেহেতু 'নাট্য' শব্দটি বলতে মূলতঃ নাট্যসাহিত্যকে বোঝায়, তাই উপরোক্ত শর্তগুলি যে নাটক বা নাট্য বস্তুতে সচেতন অবস্থায় থাকে তাকেই 'নবনাট্য' বলা চলবে।

এবং শিল্পের ক্ষেত্রে 'আন্দোলন' হচ্ছে নতুনতর কোন চিন্তাদর্শ বা শিল্প-সামগ্রীকে উদ্ভাবিত করার চেষ্টা এবং প্রচলিত চিন্তার ও শিল্পের ধরাবাঁধা রূপের মধ্যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটানোর চেষ্টা।

এই হ'ল 'নবনাট্য আন্দোলন' শব্দের আক্ষরিক ব্যাখ্যা।

এখন দেখা যাক বাংলা দেশের নাট্যচর্চা কবে থেকে পূর্বোক্ত শর্তগুলো মানতে শিখেছে।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তীকালে শিশিরকুমার এক নব্য রীতির প্রচলন ঘটান যা মূলতঃ প্রয়োগকর্মের মধ্যেই সীমিত থেকে যায়। নাটকে পূর্ব উল্লিখিত শর্তগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল কারণ সমসাময়িক নাট্যমণ্ডলে সচেতনতার অভাব। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীকে বিতাড়নের দিকে তৎকালীন নাট্যকারদের সম্মিলিতশক্তি নিয়োজিত হবার ফলেই হয়তো, স্বরাট চিন্তায় নিজেদের শিল্পকর্ম বিচার করতে পারেননি। তবু তারই মধ্যে দীনবন্ধু-মাইকেল তখনও অম্লান। যেহেতু আন্দোলন কদাপি একক্ষসিদ্ধ নয়, তাই দীনবন্ধু-মাইকেলের সচেতনতাও কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি, অথচ নবনাট্য আন্দোলনের বীজ ওইখানেই প্রথম আবিষ্কার করা গিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষাংশে বাংলাদেশের গণজীবনে এক ক্রান্তিকর অধ্যায় দেখা দিল। তথাকথিত রোমান্টিসিজ্‌মে মগ্ন হয়ে থাকতে মন চাইল না। যে কোন শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এক নতুন বোধ কাজ করেছে। এখানেও তাই ভিন্নতর জীবন-বোধের তাগিদে নতুন পথ বেছে নিলেন তৎকালীন নব্য-শিল্পী-সমাজ। আধুনিকতার পূর্বালোচিত শর্তগুলি মেনে নিয়ে লেখা হল নতুন নাটক, তার প্রয়োগ-কর্মে এল নতুনতর পদ্ধতি। মুখের চারপুরু রং তুলে ফেলে একেবারে আসল মানুষটাকে দেখাবার চেষ্টা চলল। প্রতিষ্ঠা হল প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারলিজ্‌মের। (যদিও তখন রিয়্যালিজ্‌ম বলে এটাকে চালান হয়েছে) এর প্রতিষ্ঠাতা প্রগতি লেখক শিল্পীসংঘ প্রবর্তিত ভারতীয় গণনাট্যসংঘ। অবহেলিত সাধারণ মানুষ এই নাটকে তাদের সঠিকভাবে চিনতে পারল। বলাবাহুল্য বাংলাদেশে এই সময় থেকেই নবনাট্য আন্দোলনের আরম্ভ।

এই গণনাট্যসংঘের নাটক এবং প্রযোজনা বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যেই আশ্চর্য মর্যাদা পেল এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এ সময় কোন রাজনৈতিক দল এই শিল্প ও জন-সমর্থনপুষ্ট নাট্যকে দলটিকে তাদের বিশেষ রাজনৈতিক নীতি প্রচারের হাতিয়ার করে তুলল। ফলে কিছুকালের মধ্যেই গণনাট্যসংঘ স্থূল প্রচারবাদী যন্ত্রে পরিণত হল। মুক্তির পাখির তখন যন্ত্রণার খাঁচায় ডানা ঝাপটানো ছাড়া উপায়ান্তর রইল না।

॥ তিয়াত্তর ॥

শিল্পের অন্বেষা মুক্তি। শিল্পের তাগিদেই মুক্তির সন্ধানে গণনাট্যসংঘের কিছু কর্মী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলো। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এক কোষ থেকে বহুকোষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ভিন্ন ভিন্ন নামে আলাদা আলাদা নাট্যগোষ্ঠি গড়ে উঠলো, অন্যপথে মূল লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা চলতে লাগল।

নতুন কিছু সংগঠন গড়ে উঠল সত্যিই, কিন্তু তারাও গণনাট্যসংঘ প্রবর্তিত নব্যরীতির বাইরে নতুন কিছু করতে পারল না। শুধুমাত্র একটি উপকার লক্ষ্য করা গেল নাটকগুলো উক্ত রাজনৈতিক দলের উগ্র প্রচারকার্যে নিজেদের প্রকটভাবে জড়াতে দিল না। ফলে ভবিষ্যতে এদের কাছে কিছু শিল্পসম্মত প্রয়োগকর্ম আশা করা গেল। গণনাট্যসংঘ থেকে বেরিয়ে আসা বা ঐ আদর্শে অথবা কর্মপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হওয়া দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তারা নিজেদের এক বিশেষ গোষ্ঠি বা বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী এই ধরনের একটা নামে চিহ্নিত করতে চাইল। ফলে তখন থেকেই প্রায় 'নবনাট্য আন্দোলন' কথাটার প্রচলন।

প্রকৃত শিল্পীকে চেনা যায় যত না তার শিল্পকর্মে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর শিল্প সচেতনতায়। 'নবনাট্য আন্দোলন' শব্দটা চালু করার পিছনে কোন রকম শিল্পসচেতনতা কাজ না করায় এর কর্মপদ্ধতিতে এক বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শুধুমাত্র এক নতুন শব্দের মোহে আকৃষ্ট হবার ফলেই নাট্যশিল্পক্ষেত্রে এক বিভ্রান্তিকর চেহারা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি অপরিণত বালকের নামের পূর্বে শ্রীশ্রীলশ্রীযুক্ত মহিমার্ণব ইত্যাদি যোগ করে তার সংগে উক্ত মর্যাদাসুলভ ব্যবহার সুরু করলে খুব অল্পকালের মধ্যেই তাকে যেমন অকালপক্কতায় পেয়ে বসে, বর্তমান কালের নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটল না। কবুল করতে দ্বিধা নেই এই শব্দের মোহে আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশের প্রায় যাবতীয় সিরিয়াস এবং মরশুমী নাটুকে দল নিজেদের বুকে সেই লেবেল এঁটে নাটক করার নামে, নাট্য-আন্দোলন করার নামে যা ইচ্ছে তাই বলতে লাগল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণা ইত্যাদি আরো কিছু চটকদার শব্দ দিয়ে নিজেদের ব্যর্থ প্রযোজনার দুর্বলতা ঢাকার প্রচেষ্টা চলল এবং এখনও যা প্রায়ই চলছে। প্রথম কথা, উদ্দেশ্যহীনতার উপর ভিত্তি করে কোনো পরীক্ষা চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যে পরীক্ষায় শতকরা একশো ভাগই অকৃতকার্য হয় সে পরীক্ষার প্রয়োজনই বা কি আর তার সার্থকতাই বা কোথায়? মনে হয় নবনাট্যকর্মীদের আজ সে কথা বোঝবার সময় এসেছে।

যাই হোক এই তথাকথিত আন্দোলনকারীরা আবার বলা বাহুল্য অচেতনভাবেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। (১) প্রাচীনপন্থী (২) নব্যপন্থী। প্রাচীনপন্থীর দল যা কিছু পুরোনো তা-ই ক্লাসিক এমনি এক বিশ্বাসে কিছু মধ্যযুগীয় চিন্তাদর্শে অনুপ্রাণিত নাটকের গতানুগতিক রীতির প্রযোজনায় ব্যস্ত রইল। বলা বাহুল্য এখানেও কোন ধ্রুবচিন্তা কার্যকরী হল না। নবপন্থীরা তবু ভিন্নতর পদ্ধতিতে কিছু নতুন ধরনের প্রযোজনা করল। কিন্তু সকলের চিন্তার ক্ষেত্রে সাযুজ্যের অভাব থাকায় ইতস্ততঃ কিছু ভাল প্রযোজনা বা নাট্যরচনা হলেও গোষ্ঠিবদ্ধভাবে কোন মতবাদ প্রকাশ করতে পারল না। কাজেই নাট্য আন্দোলন শুধু মাত্র নামেই রয়ে গেল, ব্যাপকভাবে নাটকাভিনয় এবং নাটকদর্শন ভিন্ন সুপরিকল্পিত কোন চেহারাই পেল না। বলা বাহুল্য এতে প্রায় হালআমলের কথাও রয়েছে।

। চুমাস্তর ।

প্রশ্ন উঠতে পারে এমন কেন হল। যেখানে শিল্পের তাগিদে নতুনতর পথে সিদ্ধিলাভের সন্ধানে নবান্নটিকে দলের সৃষ্টি বলে সেখানে এই ছবিপাক ঘটল কেন। আমার মনে হয় এর কারণ হিসেবে বর্তমান যুগটাকেই দায়ী করা যায়। একটু ঋজু দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই আধুনিক যুগলক্ষণ স্পষ্ট হবে। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণেই আধুনিক যুগকে বিশৃঙ্খলতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। সমস্ত নীতিবোধ প্রায় বিধ্বস্ত। সুস্থির চিন্তায় কোন কাজ করার মত ধৈর্য নেই। ফলতঃ যে দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী শিল্পকর্মে তার প্রতিফলন ঘটবেই।

গন্ধর্বের নাট্য প্রযোজনাও বলাবাহুল্য সর্বাংশে এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে নি। তবে সচেতন-ভাবে সে যুগলক্ষণ ধরবার চেষ্টা করেছে এবং সেটা তার প্রযোজনায় স্পষ্ট। 'নবনাট্যের' পূর্ব উল্লিখিত শর্তগুলিতে সে দৃঢ়বিশ্বাসী। ফলে তার নাট্যনির্বাচনও উক্ত কক্ষপথেই ঘুরছে।

ইতিহাসের জটিল এবং দুরূহ অধ্যায়গুলি অনায়াসেই বর্জন করেই বলা যায় যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রেই 'থিম' সন্দেহাতীতভাবেই প্রবীণ এবং প্রতি ক্ষেত্রেই 'ফর্ম' বা কারুকর্মে তা নবীনে রূপান্তরিত হয়।

নাটক নির্বাচনের প্রতি ক্ষেত্রেই গন্ধর্ব পূর্ব-আলোচিত নবনাট্যের বিবিধ শর্ত সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয়ে নাটক নির্বাচন করেছে। এবং সেক্ষেত্রে নাট্যকারও নবাগত হলে নাটক গঠনেও কিছু নবত্ব সম্পাদন করা গিয়েছে। অনুগ্রথিত নাট্য-আঙ্গিকের ওপর জোর দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে নি। সেক্ষেত্রে এবং সাধারণ ভাবেও মঞ্চসজ্জা, দীপচিত্রণ, আবহসংস্থান এবং অভিনয়ের ধারাকে ভিন্নরীতিতে পরি-চালনের দিকে প্রয়োগ-প্রধানকে জোর দিতে হয়েছে। গন্ধর্বের প্রায় প্রতিটি নাটকে প্রয়োগকর্মের দায়িত্ব বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের উপরেই থাকায় ফলে তার দায়-দায়িত্বও বলাবাহুল্য তার ওপরেই বর্তাচ্ছে।

আমার অর্থাৎ গন্ধর্বের নিজস্ব প্রয়োগরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়ার আগে সবিনয়ে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার যে গন্ধর্বের কোন প্রযোজনাই জনপ্রিয়তার সেই ধাপে পৌঁছতে পারেনি যাতে অনায়াসেই যে কোনো নাটকের যে কোনো অংশ থেকেই উক্তি দিয়ে আমাদের প্রয়োগরীতি বোঝানো যাবে। কিছু সীমিত লোকের মধ্যেই ভাল লাগা মন্দ লাগার ব্যাপারটা ঘটেছে। তাই 'বহুরূপী'র মত সর্বজনবন্দিত নাট্য পত্রিকায় ওই ধরনের উক্তি দিয়ে বাচালতার চেষ্টা করব না বরং আমাদের প্রয়োগ-রীতি প্রসঙ্গে নিজস্ব ভাবনা ও কর্মের কিছু রেখাচিত্রণ দিতে পারলে মনে হয় অনেকাংশে কার্যকরী হবে।

আই. পি. টি. এ-আন্দোলনকালে খাঁটি মানুষটাকে চেনার জন্য, জানার জন্য নাট্যশিল্পে যে অন্বেষণ চলেছিল এবং যে পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তাকেই আমরা পূর্বে 'স্বাভাবিকতাবাদ' বা প্রকৃতিবাদ আখ্যা দিয়েছি। অর্থাৎ যেমনটি—ঠিক তেমনিই। তারও পরবর্তীকালে বর্তমানের যে যুগলক্ষণ আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়েছে, তাতে লক্ষ্য করা গেছে সব কিছুতেই এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলা। তার কারণ হিসেবে এখন পর্যন্ত এই কথা বলা চলে যে বর্তমান সমাজ জীবন এক আশ্চর্য জটিলতার দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করছে। চিন্তার আচরণে এ যুগের মানুষ জটিলতার নাগপাশে নিজেদের এমনভাবে বেঁধে ফেলেছে যেখান থেকে সেই আসল মানুষটিকে মুক্ত করার মত বিশল্যকরণী প্রস্তুত নেই। যেহেতু নাটক যুগের দর্পণ,

সমাজের দর্পণ, তাই আমাদের নাট্যপ্রযোজনাতেও সেই জটিলতা ধরা পড়বে তাতে আশ্চর্য্য কি ? এবং পড়েছেও। প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখ করা দরকার পাশ্চাত্যে ইতিমধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু নব্য-রীতির পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় এদেশের শিল্পক্ষেত্রেও তার ছায়া পড়েছে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বদেশীয় নব্যরীতির নাট্যপ্রবাহে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। নির্দ্বিধায় বলা চলে গন্ধর্বও তা থেকে মুক্ত নয়। তাই খাঁটি মানুষটাকে আবিষ্কার করার জন্ত তাকে ভিন্ন রীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। খাঁটি মানুষটাকে চেনার জন্ত নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম যুগে অর্থাৎ আই পি. টি. এ-আন্দোলনকালে মুখের চাকপুরু রং তুলে ফেলতে হয়েছিল একথা প্রথমেই বলা গিয়েছে ; তার পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানে তাই আমরা মনে করেছি জটিল যুগের সেই খাঁটি মানুষটাকে দেখবার জন্ত প্রয়োজন বোধে তার মুখে আরও ছ'পুরু রং মাখানো দরকার। মানসিক জটিলতা বোঝানোর জন্ত দরকার হলে সাত রং-এর সাতটা আলো তার মুখে ফেলতে হবে। তার পরিবেশের জটিলতা প্রকাশের প্রয়োজনেই মঞ্চ তথাকথিত বাস্তবানুগ করলে চলবেনা, সত্যের তাগিদেই তাকে সাঙ্কেতিক হতে হবে অথবা প্রতীকী। মঞ্চে সময়কে টাইমপিসে বাঁধার দিন ফুরিয়েছে সে কালান্তিগ্ এ কথা প্রমাণের জন্ত যা প্রয়োজন তা করতে হবে ; নাটক গঠনেও ঘটনা-সংলাপ ইত্যাদিও বাঁধাধরা পথ মেনে চলবেনা, জটিলতা প্রকাশের জন্ত ভিন্নপথ তাকে গ্রহণ করতে হবে।

যদিচ বাইরের দিকে আজকের মানুষ জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে তথাপি জটিলতা সে পছন্দ করে না আদপেই। সে চায় সহজ সরলভাবে বাঁচতে, কথা বলতে, ভালবাসতে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে রাজনীতি এবং অর্থনীতির দারুণ কশাঘাতে জর্জরিত তার মানবিক সত্তা। প্রতিপদে বাধা পেয়ে সে নিজেকে অবোধ্য তার শম্বুক নির্মোকে আশ্রিত করেছে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দিয়ে নিজের ব্যূহ রচনা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না। কানপেতে শুনলে মাঝে মাঝে সেই সহজ মানুষটার আর্তি শোনা যায়, সে আর্তনাদকে নাটকে ধরে রাখতে হবে। আবহসঙ্গীত এক্ষেত্রে হবে প্রধান সহায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চিরপরিচিত পথ ধরে হাঁটলে চলবে না—এলোমেলো নানান সুর এবং শব্দের ঐকতানে যুগ-যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করতে হবে তাতে যদি সঙ্গীতের কাঁধে অশাস্ত্রীয় দোষ চাপে তাতে ক্ষতি নেই। বলাবাহুল্য অভিনয়েরও এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে।

শুধুমাত্র প্রয়োগকর্মেই নব্য রীতি নয় নাটক গঠনেও 'গন্ধর্ব' ওই রীতির দিকে সমান দৃষ্টি রেখেছে। এই আশঙ্কায় যে উভয় স্তরকে সমন্বয় না ঘটলে সার্থক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছু বৈষম্য উপস্থিত হতে পারে। তাছাড়া শুধুমাত্র মঞ্চ এবং 'কাউন্টার' সফলতার দিকে দৃষ্টি রেখে প্লে রচনা করলেই তো চলবেনা, কিছু সম্যক ছাপ রাখার বিশেষ প্রয়োজন যা সাহিত্যমর্যাদা লাভেও সক্ষম হবে। নেহাত যদি উদাহরণের প্রয়োজন হয় তবে, 'গন্ধর্বের' নবনাট্য উৎসবে প্রযোজিত, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত 'সূর্যের মত সমুদ্র' নাটকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। নাটকটি ইতিপূর্বে 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় এবং পরে একটি একাঙ্ক সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছে। এই নব্য রীতির নাট্যকার, নাটকটির গঠন বৈচিত্র্যের

। ছিয়াত্তর ।

ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। আধুনিক প্রয়োগরীতির প্রতি সচেতনভাবে বিশ্বস্ত থাকার ফলেই হয়তো নাট্যকার এই নাটকে সংলাপযোজনা, পরিবেশগঠন, চরিত্রস্পন্দন এবং ঘটনার উপস্থাপনাকৌশল এমন এক ভিন্ন রীতিকে আশ্রয় করে মূল বক্তব্যের পথে সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন যা আমার বিশ্বাস বাংলা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মূল্যবৃদ্ধিকারী উল্লেখ্য সংযোজন। পূর্বপঠিত না থাকলে অথবা এখন পঠনকার্যের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ অনুভব করলে আমার উক্তির সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করার একটা সুযোগ মিলতে পারে।

এক ক্ষয়িষ্ণু নীলরক্ত-শেবাস্ত্রি একাকী যৌবনের প্রান্তদেশে পৌঁছে শৈশবের পরিবেশাশ্রিত একাকীত্বের কাল্পনিক এবং কৃত্রিম নীলনির্জন অন্ধকারের পরিমণ্ডলকে চতুষ্পার্শে টিঁকিয়ে রাখতে চাইল; অপরপক্ষে সূর্যের মত উজ্জ্বল তাজা মানুষের মিছিল গোষ্ঠীবদ্ধতায় বেঁচে থাকার জন্যে বারবার তাকে আহ্বান জানাল। *কিন্তু আজন্ম সঞ্চিত, লালিত, বোধ এবং বিশ্বাসের অবাস্তব ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে শেবাস্ত্রি* এই সূর্যশক্তিকে অস্বীকার করল—ফলে সৃষ্টি হল এক প্রচণ্ড নাট্যসংঘাত। পরিশেষে কালের অমোঘ নির্দেশে শেবাস্ত্রিকে হার মানতে হল। অতঃপর একদা আবিষ্কার করা গেল তার জীর্ণ দেওয়ালের ফাটল দিয়ে নবারুণরশ্মি প্রবেশ করে এতকালের সাজিয়ে তোলা অন্ধকারকে গ্রাস করেছে এবং কখন যেন সূর্যের মত সমুদ্রের ঢেউ হয়ে প্রৌঢ় শেবাস্ত্রি যৌবনের উত্তাপ অনুভব করছে। মৃত ফসিল শেবাস্ত্রি ভ্রান্তিকে হারিয়ে প্রাণ পেল। সূর্যের মত সমুদ্র তার গোষ্ঠীগত ঐক্যবদ্ধতায়, তার তরঙ্গের প্রাণপ্রাচুর্য দিয়ে শেবাস্ত্রিকে সঞ্জীবিত করল। এই হল নাটকের কাহিনী সার।

এখন এ নাটককে আমরা যে ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলাম তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। যেহেতু এ নাটকে শেবাস্ত্রির স্বপ্নের ঘরে বাস, সারাক্ষণ চিন্তার রাজ্যে আনাগোনা তাই মঞ্চে কতকগুলো স্তর সৃষ্টি করে শেবাস্ত্রিকে ইচ্ছা এবং প্রয়োজনমত সর্বত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে এই বিশ্বাসে যে মঞ্চের তথাকথিত বাস্তবানুগ ভৌগলিক সত্তাকে অস্বীকার করে তার ভাবনার রাজ্যে পদচারণার ব্যাপারটা দর্শকের কাছে স্পষ্ট করা যাবে। প্রয়োজনমত শেবাস্ত্রির মানসিকতার বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন মৃত চরিত্রের আগমন ও গমন এবং সর্বোপরিস্তরে এক জীবন্ত মিছিলের গতিকে চলমান রেখে নায়কের বিশ্বাসকে তার মননশীলতার কাছে সমান্তরালভাবে উপস্থিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিছু স্বপ্নভুক মানুষকে একপার্শে রেখে মৃত রাজ্যের বাসিন্দা শেবাস্ত্রিকে অপর পার্শে স্থান দিয়ে প্রকৃতই ভারসাম্য রক্ষা করা যায় কিনা এ প্রশ্নের ইঙ্গিত দর্শকের কাছে রাখা গিয়েছে। মঞ্চের নিম্নভাগে শেবাস্ত্রি এবং মৃত রাজ্যের বাসিন্দাদের উপর ঘন নীল আলো প্রক্ষেপ করা হয়েছে। উপরিভাগে মিছিলের পশ্চাৎপটে পরিচ্ছন্ন আকাশের ইঙ্গিত এবং তাদের উপর সূর্যের রক্তচ্ছটা। নাটকের অন্যান্য জীবিত চরিত্রের উপর কখনও বা সবুজ কখনও সাদা আলো ফেলে তাদের চারিত্রিক সজীবতা এবং রূঢ় বাস্তবের অনুভূতিকে স্পর্শ করার সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়েছে। মিছিলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন মিলিয়ে ওই চরিত্রের ব্যাপকতা, শক্তি, বলিষ্ঠতা এবং জীবনবোধের তীব্র অনুভূতিকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। মানুষের জ্বালা, দুঃখ, ভয়, আর্তি, অভিযোগ, প্রেম, যন্ত্রণা ইত্যাদির প্রকাশানুভূতি শেবাস্ত্রির ভাবনার

অনুষঙ্গে তাল রেখে পুরবী থেকে বিভাস পর্যন্ত নির্বাচিত রাগমালায় কখনও দ্রুত কখনও বা বিলম্বিত লয়ে আলাপে এবং তানের মাধ্যমে ধরতে চেয়েছে এবং পরিশেষে সবই তম্বুরা এবং সমুদ্রগর্জনে মিশে এক হয়ে গেছে। ইত্যাদি। যদিচ এভাবে আমাদের প্রযোজনারীতি বোঝান দুঃসাধ্য তবু কোনক্রমে একটা চেষ্টা করা গেল।

যাই হোক এই ধরণের চিন্তা নিয়ে 'গন্ধর্ব' নাটক প্রযোজনা করেছে। ফলে কারো হয়তো একথা মনে হয়ে থাকবে নাটকে আঙ্গিক বড় প্রাধান্য পাচ্ছে। আসলে মনে হয় এই জটিলতা সে সহ করতে পারছে না। কিন্তু এই আঙ্গিক (?) বাদ দিলেই কি চরিত্রের জটিলতা বোঝান সম্ভব হত? ইচ্ছে করলেই কি এখন কালীঘাটের পটের মত সহজ ছবি আঁকা সম্ভব? না, আঁকলেই ভাল লাগবে? বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ যে শিল্পে অনুপস্থিত বুদ্ধির চাতুর্যময় যুগ তাকে গ্রহণ করবেই বা কেন আর তার সার্থকতাই বা কোথায়? তবে এই সরলতার আকাঙ্খা যখন মানুষের মনে প্রবল হয়ে উঠবে, সহজ হওয়ার পথের সন্ধানে যখন মানুষ পাগল হয়ে যাবে তখন এই জটিলতার মধ্যে দিয়েই সে তার মুক্তির পথ খুঁজে পাবে এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়। তার আগে জটিলতা ভিন্ন নান্য পন্থা:।

নবনাট্য আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আরো একটা কথা বলার দরকার মনে হচ্ছে। নাট্য আন্দোলনের এই বিশৃঙ্খল চেহারা দেখে আমাদের শুভাকাঙ্খী শিল্পরসিক বন্ধুরা হয়তো এর ভবিষ্যত ভেবে শঙ্কিত হচ্ছেন। এবং তা স্বাভাবিক। বন্যার উদ্দাম জলস্রোত অনেক মহিমান্বিত কীর্তিকেও বিলুপ্ত করে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই উদ্দাম জলস্রোত সুদৃঢ় হাতে নিয়ন্ত্রিত হলে সেই অশান্ত প্লাবনও জনকল্যাণের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নবনাট্য আন্দোলনের অন্তরের উদ্দামতা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে। বিশ্বাস করি সত্যের অন্বেষা এবং শিল্প সচেতনতা একদিন তাকে সুনিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে চালিত করবে। নবনাট্য আন্দোলন যদি তার শিল্পচেতনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে পর্বতই একদিন মহম্মদের কাছে হাজির হবে, বাংলা দেশে এ দৃষ্টান্ত বিরল হলেও অদৃষ্টপূর্ব নয়।

। আটাত্তর ।

নাট্যকে সংস্কৃতি চিন্তা

॥ অমরনাথ পাঠক ॥

বাংলা দেশে নাট্য আন্দোলনের রূপ আজ বেশ একটা ধর্তব্যের মধ্যে এসে পড়েছে মনে হয়। কেবলমাত্র কলকাতাতেই নয়, কলকাতার কাছাকাছি মফঃস্বল শহরে, কলকাতা থেকে দূরেও—যেমন, কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগরের মত শহরেও অসংখ্য নাট্যকে দল গড়ে উঠেছে, এবং এইসব দল একত্রে মিলে নাট্য উৎসবও করে থাকে। সংবাদপত্রে এসব সংবাদ প্রায়ই দেখা যায়। আমি দূর শহরের কথা বাদ নিয়ে, কেবলমাত্র কলকাতার নাট্য আন্দোলন ও নাট্য-উৎসবের কথাই এখানে ধরছি।

এই যে সব নাট্যকে দল কলকাতায় গড়ে উঠছে এবং যাদের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন অথবা সংবাদ আমরা কাগজে পাচ্ছি, অর্থনীতির কোন পথে চলে এবং বেঁচে থাকছে এবং নিজেদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে, সেটার কথা ভাববার দরকার আছে। দল তৈরীর ব্যাপারে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির অবদানটাই থাকে প্রধান। যেমন করে হোক কিছু সংখ্যক বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে, নিজেদের মধ্যে থেকে একটা চাঁদা তুলে অথবা কিছু টেম্পোরারী পেট্রন ধরে একটা শো' হয়তো করা যায়। কিন্তু তারপর কিভাবে সংগঠনী চলবে সে সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন শরণ নিতে হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের কর্মকর্তাদের। কলকাতায় প্রায় সারা বছর ধরেই একটা না একটা বারোয়ারী উৎসব চলে। তাঁদেরই কোনো কর্তাব্যক্তিকে যদি কোনো রকমে ইন্টারেস্টেড করে তোলা যায়, তাহলে সেই সব মণ্ডপে একটা আধটা 'সুযোগ' পাওয়া যেতে পারে। এটা নেহাতই কর্মকর্তাদের নেক্‌নজরের উপর নির্ভর করে, কেননা অনেক নাট্য উৎসবে এমন সব নাট্যকে দল 'চান্স' পেয়ে থাকে, যারা নাকি পাড়ায় মাচা বেঁধে অভিনয় করারও ছাড়পত্র পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু এই রকম কোনো একটা উৎসবে যদি কোনো দল অভিনয়ের মান কিছুটা বজায় রাখতে পারে, অর্থাৎ কিনা যদি কোনো রকমে তাদের অভিনয় উত্‌রে যায়, তাহলে হয়তো আবার অন্য কোনো মণ্ডপে আর একটা সুযোগ পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, কলকাতার অধিকাংশ নাট্যকে দলই এমনি ভাবে পরভৃতিকা নীতিতেই বেঁচে থাকবার রাস্তা খুঁজে পায়। নিজেদের ক্ষমতায় অর্থাৎ আর্থিক ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়ে একটার পর একটা নাটক অভিনয় করে চলছে এমন অপেশাদার নাট্যকে দল কলকাতায় আছে বলে আমার মনে হয় না। থাকলেও একটা কিংবা দুটো। এবং এই যে একটি কি দুটি দল যারা আজ নিজেদের ক্ষমতায় দাঁড়াতে পেরেছে, তারাও কিন্তু শুরুতে অমনি কোনো না কোনো মণ্ডপের সাহায্যেই পায়ের তলায় দাঁড়াবার মাটিটুকু পেয়েছিল, কিন্তু তারপর নিজেদের দলগত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে, একান্ত নিষ্ঠাভরে নাট্যসাধনার অনুশীলনে নিজেদের জায়গা কায়েম করে নিয়েছে।

। উদজ্ঞাপী।

নাট্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে তাই নাট্যউৎসবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রয়োগ-পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। সে প্রতিযোগিতা যে সর্বক্ষেত্রেই খুব স্বাস্থ্যকর সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। প্রতিযোগিতার রাস্তাটাও তাই সব সময় সোজা পথে চলে না। সে ব্যাপারে পেশাদারী দলের মঞ্চে ট্রেণ চালানো অথবা জলের তলায় রাজপুরী দেখিয়ে প্রসিদ্ধ হবার মতই। অর্থাৎ কিনা, কি সহজ পথ অবলম্বন করলে আর দশটি দলের আগে সেই বিশেষ দলটির ডাক পড়বে, এইটাই তার ভাবনার কথা,—নাটক উপস্থাপনায় নাট্যিক অপকৌশলের প্রয়োগই প্রধান পথ। এবং বলা বাহুল্য, এইসব সহজ পথের আশ্রয় নিতে গিয়েই অসংখ্য নাট্যকে দল অকালে ইহলীলা সংবরণ করতে বাধ্য হয়।

যে সব নাট্যউৎসব বা মণ্ডপী উৎসবের মাধ্যমে সাধারণতঃ নাট্যকে দলগুলি মঞ্চের আলো দেখে, সেই নাট্যউৎসবের রূপ কী? এবং কেন এইসব নাট্যউৎসব? আমার মত হতাশ জিজ্ঞাসুদের হয়তো একটিমাত্র উত্তরেই মুখ বন্ধ করে দেওয়া যায়—'কেন না, এর প্রয়োজন আছে'। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে হয়তো আবার কেউ কেউ বলবেন যে, নাটককে যদি উন্নত করতে হয়, বর্তমান কালের দর্শককে যদি নাট্য আন্দোলনের প্রতিপ্রকৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচিত করতে হয়, বিভিন্ন নাট্যসংস্থাকে যদি বৃহত্তর জনমানসের সঙ্গে একীকরণ করতে হয়, তাহলে এই রকম নাট্য-উৎসবের প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু এর সব ক'টিই অত্যন্ত চিনে জবাব। নাটককে উন্নত করতে হলে কেবলমাত্র নাট্য উৎসবের মাধ্যমেই তা করা যাবে এটা নেহাতই খেলো কথা। বিভিন্ন নাট্যসংস্থাকে জনতার সামনে উপস্থাপিত করাটা একটা কথা হ'তে পারে—সে কথা আগেই আমরা বলেছি। বর্তমান নাট্য আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির প্রশ্নটা অবশ্য থেকে যায়। বর্তমান নাট্য আন্দোলনের গতি কোন পথে, এবং তার প্রকৃতি কি, এটা যে কোনো নাট্য উৎসব দেখলেই বোঝা যাবে। বলতে অবশ্য আমার সঙ্কোচ হচ্ছে—কিন্তু ও দুটোর একটাও খুব আশাপ্রদ নয়।

আজকের নাটকের যে বিষয়বস্তু, তা কি আদৌ নাটকীয়? এইসব নাটকের মূল বক্তব্য মাত্র একটি এবং সেটি হল এই, যে, বর্তমান অবক্ষীয়মান এই সমাজে কোনো পাপই পাপ নয়, কেন না পারিপার্শ্বিকতার মাপকাঠিতে এইসব পাপের যাথার্থ্য নির্ধারিত। এর বাইরে আছে মহাপুরুষের জীবনচরিতকে নাটকাকারে উপস্থাপিত করা। সেই মহাপুরুষকে স্টেজে অবশ্যই তাঁর নিজস্বরূপে দেখা যাবে না—যায়ও না অনেক ক্ষেত্রে—যা দেখা যায় তা সেই চরিত্রের ক্যারিকেচার। অথচ ধর্মপ্রাণ এই জাত সে নাটক দেখে প্রচুর অশ্রুপাত করে থাকেন। আমার মত অধার্মিক, পাষণ্ড দর্শকও অশ্রুপাত করেন এই প্রার্থনা করে, যে ঠাকুর এদের আর কত দেরী। এছাড়া ত্রিভুজী প্রেমের গল্প আমি বাদই দিলাম। অথচ এমন চরিত্র কেন নাটকে সৃষ্টি হচ্ছে না, যে চরিত্র তার আশপাশের সামাজিক দুর্নীর বাইরে নিয়ে যেতে পারবে তার সমাজকে। যে চরিত্র কেবলমাত্র পাপকে পাপ বলেই মনে করবে। কোনো রকম পরিবেশের দোহাই দিয়ে সে পাপের পক্ষ সমর্থন করে না। এমন চরিত্র কি এদেশে নেই? আমার নিজের চোখেই তো এমন লোককে আমি দেখেছি যে গত দাঙ্গায় একটি মুসলমান শিশুকে হিন্দুদের কাতানের থেকে নিজের জীবন বিপন্ন করেও বাঁচিয়েছেন। পুলিশের গাড়ীতে সেই শিশুটিকে

জিম্মা করে দিয়ে তিনি সমবেত হিন্দুবীরদের বিদ্রূপ গঞ্জনা সহ্য করতে করতে বাড়ীর পথে গেছেন। এত সামান্য একটা উদাহরণ—এর চেয়েও বড় বড় উদাহরণ খোঁজ করলে পাওয়া যাবেনা এমন নয়।

কিন্তু যে সব ম্যারাপী উৎসব বা নাট্যোৎসবকে কেন্দ্র করে এই নাট্য আন্দোলন এগিয়ে চলছে তার রূপটা কি? কি ভাবে এই উৎসব উদযাপিত হয় তা আমাদের জানা আছে। এই সব মণ্ডপে দর্শকের আসনের যে রকম অঢেল বন্দোবস্ত থাকে এবং সেই অগণিত দর্শককে 'কভার' করবার জন্ত মাইক্রোফোনের যে বন্দোবস্ত থাকে, তাতে করে কোনো সূক্ষ্ম অভিনয় দেখানো সম্ভব হয় না। ফলে রাজসূয়যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয় এবং এইরকম দক্ষযজ্ঞে শিবের অনুচরের আক্রোশটা গিয়ে ততটা পড়েনা উৎসবের কর্মকর্তাদের উপর, [কেন না তাঁরাতো তখন না-পাত্তা] যতটা পড়ে অভিনেতাদের উপর—যেন মাইক্রোফোন বিরাটে গলা শোনাতে না পারাটা তাঁদেরই অপরাধ। পূর্বাহ্নেই যে দর্শক এটা অনুমান করতে পারেন না, তা নয়, কিন্তু তবু তাঁরা ওই সব অনুষ্ঠানে দর্শকের ভূমিকায় উপস্থিত থাকবেনই—কেননা কম পয়সায় অনেক নাটক দেখা যাবে—তা সে নাটক যেমনই হোক—এবং ভালো ভাবে নাও যদি দেখতে পাওয়া যায় তাতেও লোকসান নেই। ভাঙাচোরা, কাটা-ছেঁড়া যাই-ই হোক।

এ হ'ল নাট্য উৎসবের বা সাংস্কৃতিক উৎসবের একটা দিক। এর অন্ত একটা দিক আছে—এবং আমার মনে হয়েছে সেটাও ভাববার সময় এসেছে। আমার সে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, এইসব সাংস্কৃতিক উৎসবে আমাদের বৃহত্তর সমাজ কতটা লাভবান হচ্ছে। নাট্য আন্দোলন জয়যুক্ত হচ্ছে কি না সেটা অবশ্য আগেই বলা গেছে—সেখানে ব্যক্তিভেদে মতভেদ। কিন্তু সমাজের দিকটা সাধারণের লাভ-লোকসানের দিক—সেখানে ব্যক্তিভেদ ঘটলেও মতভেদ নাও ঘটতে পারে, এই আমার ধারণা। এইসব অনুষ্ঠানে যতদূর দেখতে পাই—কিছুটা আর্থিক সুবিধা পান, ডেকরেটার, মাইক-ম্যান, স্টল-ওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা, তাছাড়া আর যে কারও কোনো লাভ হয় তা মনে হয় না। অভিনয়ের অনুপ্রেরণায় দর্শকের এথিক্যাল বা ঈস্থেটিক সেন্স বাড়বে—তাও না। নাটক ইম্প্রেসিভ্ হলে তবে তো। আমার নিজের কথা বলি—কোনো একটি দলের রামকৃষ্ণ চরিত্রের অভিনয় দেখে আমার রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণাই পালটাবার যোগাড় হয়ে গেছিল। রামকৃষ্ণ ঠাকুর যে প্যারালাইসিসের রোগী ছিলেন এরকম ধারণা হতে পারে যে কোনো লোকের উক্ত অভিনয় দেখলে এবং বিদ্যাসাগর মশাই জলের কলের মিস্ত্রী ছিলেন এমন ভাবাও বিচিত্র নয়। অথচ এ নাটক মিনার্ভা থিয়েটারের বোর্ডে দেখলাম কোনো এক নাট্য-উৎসবে, আর সেই উৎসবের উদ্যোক্তা কোনো এক নাট্যসংগঠনী যাঁরা নাকি সহস্রাধিক নাট্যগোষ্ঠির কেন্দ্রীয় সংস্থা। কী করে যে তাঁরা এরকম নাটক এবং অভিনেতাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করলেন তা বুঝলাম না। তা যাই হোক, বর্তমানের নাট্য আন্দোলনে নাটকের হাল-হকিকৎ এই রকমই। তাহলে, এ নাট্য উৎসবের বক্সঅফিসে পয়সা দেবো কেন? সময়ই বা নষ্ট করব কেন এই রকমের নাটক দেখতে গিয়ে? কী পাই এর বদলে? নাটক পাইনা, অভিনয় পাইনা, ভালো প্রয়োগপদ্ধতি শিখতে পাইনা তাহলে বাকী থাকে কী?, বাকী থাকে সামাজিক জীবনে কিছু আর্থিক লাভ। এইসব অনুষ্ঠান প্রসাদাৎ আমার দেশের কটা স্কুল সাহায্য পায়? কটা রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে এঁরা সাহায্য করেন?

কটা উন্নয়নমূলক কাজে এঁরা কতটুকু সাহায্য করে থাকেন? এ প্রশ্নটা আমার এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে পেশ করা রইল।

॥ দুই ॥

এরই পাশাপাশি আমাদের দেশের যাত্রাসংস্কৃতির বা যাত্রাআন্দোলনের একটা তুলনামূলক বিচারের অবকাশ আছে। এই সব যাত্রার দল ভ্রাম্যমাণ। এবং বছরের আট/নয় মাস এরা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, বাংলার শিল্পাঞ্চলে, কয়লাখনি অঞ্চলে, চা-বাগানে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ায়। প্রকৃত লোক সংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার বাহন এই সব যাত্রার দল। দূর গ্রামে অভিনয় করতে গিয়ে, গ্রামের স্কুলের উন্নতিকল্পে, রাস্তা তৈরী করবার জন্য, লাইব্রেরীর বই কিনবার জন্য মোট টাকা চাঁদা দেয়নি এমন যাত্রার দল বস্তুতঃ একটিও নেই। হিসাবের ভারে লেখা ভারাক্রান্ত করার কোনো হেতুবাদ নেই, কলকাতার যে কোনো যাত্রার দলের কাছে খবর নিলেই লক্ষ টাকার অংকটা জানা যাবে। আমি নিজে দেখে এসেছি কলকাতারই একটি যাত্রার দল দিল্লীতে নাট্যউন্নয়নকল্পে এক হাজার টাকা দান করে এসেছেন।

আমি ইতিপূর্বে বর্তমান নাট্যআন্দোলনের নাটক ও তার বিষয়বস্তুর আলোচনা করেছি। সেই প্রসঙ্গে কিছু কিছু যাত্রাপালার উল্লেখ করে এই অপ্রীতিকর আলোচনার শেষ করবো। আমি যাত্রার পৌরাণিক পালার কথা বাদ দিচ্ছি। পৌরাণিক পালায় সর্বত্রই সিদ্ধ রসের কথা 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবৎ'। তাছাড়া পৌরাণিক পালার সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থার সম্বন্ধ কি? এ প্রশ্নও উঠতে পারে। কিন্তু সিদ্ধরসের বাত্যয় যে কোথাও ঘটবে না—এ নীতি আজকের পালাকারেরও লক্ষ্য। বর্তমান ঘটনা নিয়ে লেখা ব্রজেন দে'র 'দোষী কে' ঐ কথাই প্রতিপন্ন করেছে। মানুষ পরিবেশকে জয় করবে, সে সামাজিক জীব—সমাজের প্রডাক্ট, কিন্তু সমাজের স্রষ্টাও। বর্তমান পালা-লেখকদের কোথাও দেখিনি মানবধর্মের মহিমাকে, মনুষ্যত্বকে পরিবেশের ফাঁসি কাঠে লটকে তার মানবধর্মকে ক্ষুন্ন করতে। রূঢ় বাস্তব সে সব পালায় নেই, তাও তো নয়। রূঢ় বাস্তবের ঊর্ধ্বে, পেষণের ঊর্ধ্বে, মানব মহিমা—এই কথাই পালাকাররা লিখেছেন, আজও লিখছেন—তাতে কোথাও নাট্যকৃতি ক্ষুন্ন হয়নি। 'অঙ্কার' কোথাও পরিবেশের রঙে 'গুরে' রূপ লাভ করেনি। আমি কোনো যাত্রায় দেখিনি যে কোনো সত্যভূষণ কোনো নরেন পালের গচ্ছিত অর্থ আত্মসাৎ করতে গেছে পরিবেশের চাপে বরং দেখেছি মাণিক চাকলাদারকে, যে সাধুর গচ্ছিত অর্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের ছেলেকে অত্যাচারী রাজার তলোয়ারের নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখেছি বিশ্ব বংশীদাসকে যে, কোনো অত্যাচারেই নবাবের কাছে মাথা নীচু করেনি। মনুষ্যত্বের মহিমা পালা-লেখক কোথাও কোনো কারণেই ক্ষুন্ন করেননি। তাঁদের পালায় যে বর্তমান যুগ-সমস্যা নেই তাও নয়। তবু—সমস্যার উপরেও মানুষ—এইটাই তাঁদের পালার উপজীব্য।

আজ চিন্তা করবার সময় এসেছে [এবং এটা অসঙ্গত চিন্তা নয় বোধ হয়] যে আমাদের কাছে কোন্ সংস্কৃতি আজ গ্রহণযোগ্য। প্রশ্ন করবার দিন এসেছে ছত্রাকের মত এই যে অসংখ্য নাটুকে দল দিনের পর দিন গজিয়ে উঠেছে এদের কাছ থেকে এবং এদের সমষ্টিত প্রয়াস নাট্যউৎসব ও নাট্য-আন্দোলনের কাছ থেকে ব্যক্তিগত মানুষ ও সমষ্টিগত সমাজ কি পাবে, এবং কতটা পাবে?

●

। বিয়াণী ।

সালভিনির 'ওথেলো' সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কি

★

অনেক দিনের কথা। ঠিক স্মরণে আসছে না, বোধহয় উনবিংশ শতাব্দির শেষাদ্ধের কোন একটা সময়ে হবে। সালভিনি[১] তাঁর ইতালিয়ান দলের সংগে মস্কো সফরে এসেছেন। স্ট্যানিস্লাভস্কি[২] তখন কৈশোর ছাড়িয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভ না হলেও কাজের গাড়ে তখন ভরা কেটাল। ঠিক এই সময়ে বেশ কিছু বিদেশী অভিনেতা তাঁর দেশে এসে অভিনয় করে গিয়েছেন। সকলেই কীর্তিমান। কিন্তু বিশেষ করে বোধ হয় মানুষের একজনকেই মনে থাকে। স্ট্যানিস্লাভস্কির জীবনে সালভিনি সেই বিশেষ মানুষ।

সেদিনের অভিনয়ের কথা কোন দিন তাঁর বিস্মরণ হয় নি। ওথেলোর অভিনয়। স্থান—বলশয় থিয়েটার। কোন একটা অনিবার্য কারণে স্ট্যানিস্লাভস্কির প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছোতে সামান্য দেরী হয়ে গিয়েছিল। সেই তাঁর প্রথম সালভিনি দর্শন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর কি হয়েছিল ঠিক বুঝতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অসতর্ক মনের জন্যেই হোক বা বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতার সঙ্গর সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার জন্যেই হোক বা পূর্বব্যাণ্ডের ভিড়ে হারিয়ে ফেলার জন্যেই বোধ হয় তিনি ইয়াগো

১। টমাসো সালভিনি (১৮২৯-১৯১৫)

মিলান-এর এক অভিনেতা বংশের ছেলে। প্রথম অভিনয় Goldoni-র Donne Curiose-তে, তখন বয়স মোটে চৌদ্দ। Ristori-র দলের প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এই অভিনেতা ১৮৪৯ সালে ইতালীর স্বাধীনতাযুদ্ধে সৈনিক পদে ব্রতী হন।

সালভিনির অভিনয় জীবনকে পরাজয়ের গ্লানি কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। বহুবার তিনি বিদেশ সফর করেছেন। একই দেশে একাধিকবার গিয়েছেন এ নজীরও প্রচুর। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় বোধ হয় ওথেলো। শোনা যায় হত্যার দৃশ্যে তাঁর ডেসডিমোনারা নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। রাশিয়া সফরের সময় স্ট্যানিস্লাভস্কি বহু একাধিকবার এই নাটকের অভিনয় দেখেছেন। ওথেলোর অভিনয় যে কতখানি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল সেটা তাঁর (স্ট্যানিস্লাভস্কির) লেখা থেকেই অনুধাবন করা যায়। সালভিনির ওথেলো দেখার পর বেশ কিছুদিন তিনি বিয়োগান্ত নাটকে অভিনয় কোরতে (বিশেষ করে ওথেলো) দ্বিধান্বিত ছিলেন। ১৮৯০ সালে থিয়েটার থেকে অবসর নেন। অবশেষে ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Ristori-র অশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে যে নাট্যোৎসব হয়েছিল তাতেই তিনি শেষ অভিনয় করেন।

২। কনস্ট্যানটিন্ স্ট্যানিস্লাভস্কি (১৮৬৩ ১৯৩৮)

আজকের দিনে কোন মঞ্চরসিক স্ট্যানিস্লাভস্কির নাম জানেন না একথা ভাবাই যায় না। ১৮৬৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী মস্কোর এক ধনী ব্যবসায়ীর ঘরে এই দিক্‌পাল প্রযোজক-অভিনেতার জন্ম। ছেলেবেলাতেই সৌখিন দলে অভিনয়ের হাতেখড়ি। রুশ অভিনেতা Sadovsky, Maria Savina, Yermolova এবং ইতালীয় অভিনেতা Rossi'র অভিনয়ে অনুপ্রাণিত, বহু সংগঠিত নাটকের এই স্রষ্টার সারাটা জীবন থিয়েটারের জন্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। তাঁর প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই অনুসরণ করা হচ্ছে।

চরিত্রাভিনেতার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন তিনিই সালভিনি। (Possart ইয়াগো চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন) স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেন যে তিনি (ইয়াগো চরিত্রাভিনেতা) সুকণ্ঠ, সুদেহী, যথেষ্ট প্রতিভা'ধর এবং ইতালীয় রীতিতে অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু একথা মেনে নিয়েও তাঁর যে স্বীকার করতে দ্বিধা ছিল তিনি অসাধারণ। এও মনে হয়েছিল যে যিনি ওথেলো করছিলেন, তিনিও তুচ্ছ নন। তাঁরও প্রতিভা রয়েছে, কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গী, দৈহিক পরিমাপ সবই সু-অভিনেতার উপযোগী।

এক ধরণের দর্শক আছেন যাঁরা নামকরা অভিনেতার অভিনয় দর্শনের সুরু থেকেই একেবারে আপ্লুত হয়ে থাকেন। সারা জগতে এরা বোধহয় এখনও দলে ভারী। (প্রসঙ্গত বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে দর্শকদের জাতের তো সীমা-সংখ্যা নেই, পরিচালকের পক্ষে (বা অভিনেতার) সকলের মন রক্ষা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ এক ধরণের পণ্ডিত দর্শকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা নিজেদের মনগড়া একটা ধারণা নিয়েই অভিনয় দেখতে আসেন। কিন্তু নাটক দেখতে গিয়ে পরিচালকের চিন্তার সূত্রটাই বোধহয় ধরবা'র চেষ্টা করা উচিত) সেদিনের অভিনয় সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেন যে সুরুতেই cognoscentiদের মোহাচ্ছন্নতা তিনি আদৌ পছন্দ করেন নি। তারা যেন সালভিনির প্রথম লাইন উচ্চারণের সংগে সংগে একেবারে অচেতন হয়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল যে সা'লভিনি অভিনয়ের সূচনা'তেই দর্শকদের সমস্ত মনযোগ নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে চান নি। যদি চাইতেন তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই তা করতে পারতেন, অব্যবহিত পরে সিনেটের দৃশ্যে তা করেওছিলেন। তিনি বলেছেন যে, এই দৃশ্যের সুরুতে সালভিনির রূপসজ্জা, পোষাক এবং দেহ তাঁর চোখে পড়েছিল, তা ছাড়া নতুন কিছু মনে হয় নি। সেগুলিও যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা'ও তাঁর মনে হয় নি। তাঁ'র সাজ তখন তাঁকে (স্ট্যানিস্লাভস্কি) আদৌ আকৃষ্ট করে নি, পরেও না। সালভিনির রূপসজ্জা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, ও বস্তুটি তাঁর ছিল বলেই মনে হয় নি। মানুষটির নিজেরই এমন একটা মুখ ছিল, যেটার বোধহয় রূপসজ্জার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বিরাট ছুঁচলো গোঁফ, পরচুলাটা নিতান্ত পরচুলাই ছিল। আ'কৃতিটা ছিল বিরাট, লম্বা চওড়া, ভীষণ স্থূল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁকে বেশ শক্তসমর্থ মনে হ'ত, বিশেষ করে তিনি যখন মুরীয় জোব্বা আর শিরস্ত্রাণ পরতেন। অথচ এর কোনটাই সৈনিক ওথেলোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সে রাত্রের অভিনয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"কিন্তু সালভিনি মঞ্চে এসে কী যেন একটু ভাবলেন—তা'রপর আত্মগত হয়ে গেলেন। এবং তাঁদের প্রত্যেকের অজান্তে সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে মুহূর্তেই করায়ত্ব করলেন। মনে হোল সালভিনি একটিমাত্র ভঙ্গীতেই জয় করে নিলেন তাঁদের সকলকে। সাধারণের দিকে না তাকিয়েই তিনি হাত বাড়ালেন, তাঁর হাতের তালুতে তুলে নিলেন সকলকে—যেন একরাশ ছোট্ট কীট্। তিনি মুঠো বন্ধ করলেন। আমরা মৃত্যু অনুভব করলা'ম। যখন খুললেন আনন্দের স্পর্শ পেলাম। আমরা তখন তাঁর প্রভাবাধীনে। এ প্রভাব সারাজীবন থাকবে। অনন্তকাল। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি এই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটি কে, তিনি কী ছিলেন এবং আমরা তাঁর কাছ থেকে কী আশা করতাম।" নাটকের প্রথম ভাগে তাঁ'র মনে হয়েছিল যে, সালভিনির ওথেলো যেন ওথেলো নয়—রোমিও। তেজদীপ্ত-অনুপ্রাণ—তাঁর দৃষ্টি, ভাবনা সব জুড়ে রয়েছে ডেসডেমোনা—

আর কেউ নয়। গভীর তাঁর বিশ্বাস। স্ট্যানিশ্লাভস্কির ভেবে আশ্চর্য লেগেছিল যে কী করে ইয়াগো এই রোমিওকে সলিণ্ড ওথেলোয় রূপান্তরিত করলো। সালভিনি তাঁর মনে যে গভীর ছাপ রেখে গেছেন সে কথা পৃথিবীর প্রত্যেকটা থিয়েটার পাগল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে স্বভাবতঃই তাঁর মন আকুলি বিকুলি করেছে। কিন্তু বোঝাবেন কি করে? সত্যি, সাহিত্য সৃষ্টি করে তো আর অভিনয়ের গভীরতা বোঝান যায় না। বোধহয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সালভিনির সৃষ্টির কিছুটা মিল পাওয়া যায়। কীর্তিমান ভাস্কর সুরুতেই ঠিক করে নেন কি তিনি করবেন, কিভাবে করবেন এবং কেমনভাবে করলে তাঁর সৃষ্টি সার্থক হবে। একদলা তপ্ত ধাতুপিণ্ড থেকেও এক মোহময়ী নারীমূর্তির সৃষ্টি সম্ভব। ভাস্কর আকারহীন একদলা ধাতুপিণ্ড নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁর নিপুণ হাত দিয়ে সেই আকারহীন দলাটাকে নিয়ে প্রথমে হয়ত অপরূপ এক পায়ের পাতার প্রতিরূপ গড়লেন, যার রেখা, প্রতিটি বাঁক এমন কি পাতার তলার ডৌল, সবটাই তাঁর আয়ত্বে। এক নারীমূর্তির প্রচণ্ড এবং আশ্চর্য এক পায়ের পাতার সৃষ্টি হ'ল। যা সুন্দর, নিখুঁত এবং কালজয়ী। এমন সৃষ্টি যেখানে কোন সংশোধন অনাবশ্যক, যা শাশ্বত। তখনই সেই শিল্পীশ্রেষ্ঠ সকলের সামনে ভবিষ্যত মূর্তির এমন একটা পরিপূর্ণ অংশ ধরেন যার রূপকল্প ইতিমধ্যেই অনুভবে আসে। তাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য কারো ভালো লাগবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি নির্বিকার। তিনি যা সৃষ্টি করেন তার অস্তিত্ব আছে—আছে। পরিণত বোধের কাছে তা অমূল্য। যারা অনুভব করতে পারে না তাদের কাছে স্বর্গের রাস্তা বন্ধ। যে সৃষ্টির রহস্য তিনি শুরু করেন, তার সূত্র ধরে একে একে সেই নারী-মূর্তির প্রতিটা অংশ তিনি নিদারুণ সতর্কতার সঙ্গে করতে থাকেন। কঠিন ধাতু দিয়ে গড়া রমণীর কোমল বক্ষদেশ তাঁর হাতের ছোঁয়ায় কোমল থেকে কোমলতর হয়ে ওঠে এবং মনে হয় যেন ভরা যৌবন, জড়ত্বের লেশমাত্র নেই। কঠিন ধাতুতে তৈরী তবু যেন মনে হয় সে সুঠাম নারীমূর্তির কোন ভার নেই, এমনই হালকা, যেন বাতাস। সৃষ্টি সম্পূর্ণ হলে স্রষ্টাকে দেখে মনে হল যেন ওই মূর্তির ওই স্বর্গীয় সুষমগুলের সবটাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন। প্রসন্ন তাঁর মুখ, স্নিগ্ধ তাঁর হাসি, যেন এক প্রেমমুগ্ধ কিশোর। ভাস্করের স্বপ্নে দেখা মূর্তি প্রাণ পায় কিন্তু ওই কঠিন ধাতুর মধ্যেই।

মঞ্চে সালভিনির সৃষ্টি ঠিক যেন ব্রোঞ্জে তৈরী এক স্মারক-স্তম্ভ। যার একটা অংশ, যেমন ধরা যাক সিনেটের সভ্যদের সামনে তাঁর স্বগতোক্তি, ঐ নারীমূর্তির পায়ের পাতার মতই নিটোল। অন্যান্য দৃশ্যে তিনি যেন ঐ বাকী অংশগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। যার সম্মিলিত ফল একটা অবিনশ্বর স্মারক স্তম্ভ। মানবিক আবেগ, অসূয়া, প্রেম, অসীম বিশ্বাস, মহৎ ক্রোধ ও ভীতি এবং অমানবিক প্রতিহিংসা দিয়ে গড়া।

স্ট্যানিশ্লাভস্কি বলেছেন যে নাটকের সুরুতে অবশ্য তাঁর মনে হয়েছিল যে সালভিনির অভিনয় একটু যেন স্তিমিত, ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং অস্পষ্ট—যেন স্বপ্নে দেখা, হাওয়ায় ভাসা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব। কিন্তু পরে এই কঠিন ধাতুর সৃষ্টিই কত যে অব্যক্ত অনুভব এবং স্মৃতি চিত্তপটে রেখে গেছে তার হিসাব নেই। তিনি বারেবারেই বলেছেন যে, সালভিনির সৃষ্ট ওথেলো একটা স্মারক স্তম্ভ—মহাকালের হাতে অলঙ্ঘনীয় এক চিহ্ন—অপরিবর্তনীয়।

বিখ্যাত রুশ কবি কে, ডি, ব্যালমণ্ট কোথাও বলেছেন—'সৃষ্টি হবে শাশ্বত, হোক তা ক্ষণিকের কিন্তু চিরন্তনের কাছে নিবেদিত।' সালভিনির সৃষ্টিও শাশ্বত এবং চিরন্তনের কাছেই নিবেদিত। সিনেটের সামনে তাঁর স্বগতোক্তির সময় Desdemonaর সঙ্গে মুহূর্তের সাক্ষাতকালে, ক্ষণিকের মধ্যে তিনি অসাধারণ বিশ্বাস এবং কিশোর সুলভ প্রেমের অভিব্যক্তির প্রকাশ করেই শুরু হতেন। দর্শককুলের কাছে সে যেন এক মহাশূণ্য। স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন যে, বিদ্যুত শিখার চমক লাগিয়ে সালভিনি তার প্রতি দর্শকদের অখণ্ড আত্মাকে কাজে লাগাতেন আর দর্শকরাও, ঠিক তালিম দেওয়া কুকুরের মত, পায়ের পাতার ওপর বসে যেমন করে তারা তালিমদারের চোখের দিকে নজর রাখে, তেমনি বুভুক্ষের মত সেই চরিত্রের বিশেষ মুহূর্ত এবং সংলাপের দিকে নিজেদের নিবদ্ধ রাখতে বাধ্য হোত যেন সালভিনিরই অমোঘ নির্দেশে। স্ট্যানিস্লাভস্কি আরও বলেছেন যে কোন এক মুহূর্তে সালভিনি দর্শকদের চাবুক লাগিয়ে সচেতন করে তুলতেন। সম্বিত ফিরিয়ে আনতেন, যাতে দর্শককুল একেবারে নিস্তেজ না হয়ে পড়ে। Cyprus-এর সেই দৃশ্যে যেখানে Cassio এবং Montanoর বিরোধ খুব দ্রুত তিনি চুকিয়ে ফেললেন। তাঁর দুর্দ্ধর্ষ দুটো চোখ দিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর বাঁকা তলোয়ারটা তুললেন, সেটা বিদ্যুৎঝলকের—মত শূন্যে আন্দোলিত হত এবং অতি ক্ষিপ্রতায় তা নেমেও আসতো। তিনি বলেছেন যে সেই মুহূর্তেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কী ভয়ঙ্কর এবং ওথেলোর চরিত্রও কত ভীষণ :—

For since these arms of mine had seven years pith till now some moons wasted they have used their dearest action in the tented field.

তিনিও বলেছেন আরও বোঝান হয়েছিল—little of this greatest world can I speak more than pertimes of feets of broils and battle.

সালভিনি কেমন করে শেষ দৃশ্যে নিদ্রিতা Desdemona'র দিকে চুপিসারে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নিজের জোব্বার তাঁকে পিছন দিকে টান লাগায় কিভাবে ত্রস্ত হয়ে দাড়িয়েছিলেন, নিদ্রিতা রমণীর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে কেমন করে নিজের শিকার ছেড়ে ভীত হয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে কোনদিন এ সবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হবে না। কতগুলো অবিস্মরণীয় মুহূর্তে তাঁর অভিনয়ের দুর্বার আকর্ষণে সমগ্র থিয়েটারের দর্শক সম্মোহিত হয়ে একজন মানুষের মত উঠে দাঁড়াতো। তিনি বলেছেন যে, যখন সালভিনি তাঁর প্রেয়সীর গলা টিপে ধরতেন, যখন ইয়াগোর দিকে ছুটে যেতেন এবং তরবারীর একটা আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করতেন তখন ঐ মানুষটির ক্ষিপ্রতায়, কর্মচাঞ্চল্যে এবং শক্তির প্রচণ্ডতায় তিনি যেন বাংলার বাঘকে মঞ্চে অবতীর্ণ দেখেছেন। কিন্তু যখন সেই ওথেলো তাঁর চরম ভ্রান্তির কথা জানতে পারলেন তখন তিনি যেন এক হারিয়ে যাওয়া বালক, যে প্রথম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলো। আবার আত্মহত্যার পূর্বে তাঁর সংলাপের পরে তাঁকে দেখে স্ট্যানিস্লাভস্কির মনে হয়েছিল যেন, তাঁর ভিতরে জীবনব্যাপি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে এমন এক বীর যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর অভিনয়ে, উক্তিতে—মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে এমন এক বীরকেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

নাটকের শেষে স্ট্যানিস্লাভস্কির মনে হয়েছিল যে সালভিনি যা করলেন এবং দেখালেন তার সব কিছুই কত সহজ, স্পষ্ট, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ এবং ভীষণ। এক কথায় বলা যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। সত্যিই তো বৈচিত্র্য না থাকলে সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়। অভিনেয় চরিত্র যখন অযথা জটিলতা নিয়ে, ঠিক সময়ে সুনির্দিষ্ট পথে স্বচ্ছভাবে দর্শকের মনে ধরা দেয়, তখনই সেটা মহৎ অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে। স্ট্যানিস্লাভস্কির লেখা থেকে যতটা জানা যায় তাতে মনে হয় অভিনেতা হিসাবে সালভিনির গুণপনার সীমারেখা একেও লঙ্ঘন করেছিল। মহান স্রষ্টার সৃষ্টির মতই ওথেলো চরিত্রের এক একটা অংশ বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও নাটকের অস্থির সময়ে সবটাই অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অনেক কথার মধ্যে সালভিনি সম্পর্কে কিন্তু এমন একটা কথা স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন যার জবাব তিনি কোনদিন খুঁজে পান নি। তিনি বলেছেন যে সালভিনিকে দেখে তাঁর Rossi এবং অন্যান্য মহান রুশ অভিনেতাদের কথা স্মরণে এসেছিল। এঁদের তিনি দেখেছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই একই ধরণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন যা তাঁর জানা ছিল। অবশ্য একমাত্র প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যেই তিনি এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু একথাটা কেন তাঁর মনে উদিত হয়েছিল? অনেক চিন্তা-ভাবনাও এ 'কেন'র সমাধান এনে দেয় নি।

এ তো গেল অভিনয়ের সমঝদার কথা, কিন্তু তাঁর অভিনয়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে স্ট্যানিস্লাভস্কি যা বলেছেন তা প্রত্যেক মঞ্চপ্রেমিক বিশেষ করে প্রত্যেক অভিনেতার ইষ্টমন্ত্রের মত স্মরণ করা উচিত। অন্যথায় বেটামুটি ভাল অভিনয় করাই সম্ভব নয়, মহৎসৃষ্টি তো নৈব নৈব।

তিনি বলেন যে সালভিনি এবং শিল্পী হিসাবে ওঁর দায়িত্ব এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক মনকে বেশ নাড়া দেয়। অভিনয়ের দিন সকাল বেলা থেকে তিনি অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে কাটাতেন, খেতেন কম, দুপুরের খাবারের পর নিরালায় বিশ্রাম করতেন এবং কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। অভিনয় শুরু হোত রাত আটটায় কিন্তু তিনি থিয়েটারে এসে পৌঁছতেন বেলা পাঁচটায়। অর্থাৎ অভিনয় শুরুর তিন ঘন্টা আগে। তিনি তাঁর dressing roomএ ঢুকতেন, ওভার কোট খুলে রাখতেন এবং মঞ্চের চারপাশে ঘুরে দেখতেন। কেউ কোন কথা বলতে আসলে স্বল্প কথায় জবাব দিয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করতেন। কিছুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন একটা মানুষের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর dressing roomএর ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন। কিছু পরে রূপসজ্জার জামা অথবা অন্য কোন পোষাক পরে মঞ্চে কিছুক্ষণ ঘোরার পর কিছু সংলাপাংশ বলে স্বর ঠিক করে নিতেন, কিংবা কোন ভঙ্গীর মহলা দিতেন অথবা অভিনেয় চরিত্রের উপযোগী অঙ্গ সঞ্চালন করে dressing roomএ ফিরে গিয়ে মুখের রূপসজ্জা নিতেন। নিজেকে কেবল বাইরের দিক থেকে নয় ভিতর থেকেও পাল্টিয়ে ফেলে আবার তিনি মঞ্চে এসে দাঁড়াতেন। তখন তাঁকে দেখে মনে হ'ত পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী তরুণ, স্বচ্ছন্দ তাঁর গতিভঙ্গি। মঞ্চের লোকেরা ইতিমধ্যেই দৃশ্য লাগাতে শুরু কোরতো, সালভিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। কে জানে হয়ত তিনি ভাবতেন তিনি তাঁর সৈন্যসামন্তের মধ্যেই আছেন, যারা কোন শত্রুর

বিরুদ্ধে সুরক্ষিত অবরোধ সৃষ্টির কাজ করছে। তাঁর দৃঢ় দেহ, সামরিক ভঙ্গী, দূরের কোন জিনিষের ওপর মনযোগ সহকারে নিবদ্ধ চোখ দেখে মনে হোত তাঁর কল্পনার পরিবেশ সত্য। আবার সালভিনি dressing roomএ চলে যেতেন এবং কখনো নিজের জামা পরে আর পরচুলা লাগিয়ে বেরিয়ে আসতেন। তার পর আবার কোমর বন্ধ আর তলোয়ার এঁটে মাথায় পাগড়ি দিয়ে ঘুরে যেতেন। এবং সবশেষে আসতেন ওথেলোর পুরো পোষাকে। স্ট্যানিস্লাভস্কি বলেছেন তাঁর প্রত্যেক প্রবেশের পর মনে হ'ত যে সালভিনি কেবলমাত্র তাঁর মুখে রং লাগিয়ে রূপ পরিবর্ত্তন করতেন না কিংবা তাঁর পোষাক দিয়ে দেহসজ্জা করতেন না। ভেতর থেকেও নিজেকে চরিত্রের ধরণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ক্রমশঃ চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইতেন। এর দ্বারাই বোধ হয় তিনি শিল্পীর আত্মা ও দেহকে উপযোগী প্রসাধনের সাহায্যে রঞ্জিত করে ওথেলোর চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হতে পেরেছিলেন।

ওথেলো চরিত্র সৃষ্টি করবার জন্যে দশবছরের নিঃসঙ্গ সাধনা এবং এ চরিত্র বহুশত রজনী অভিনয়ের পর তাঁর মত প্রতিভার পক্ষেও প্রতি অভিনয়ের পূর্বে এই রকম প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। সালভিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে স্বীকার করেছেন যে ওথেলোর চরিত্র কী এবং কেমন করে সে চরিত্রের অভিনয়ে সাফল্য আনা যায় সে কথা অনুভবে এসেছে শততম বা দ্বিশততম রজনীর অভিনয়ের পর। এ স্বীকারোক্তি বৃথা নয়।

তমসার তীরে

॥ রমেন লাহিড়ী ॥

মানুষের দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। তবুও আত্মা কলুষিত হয় যখন কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হিংসা-মাৎসর্য এই ষড়রিপুর দুর্বার প্রভাবে মানুষ অভিভূত হয়ে থাকে। সকল রিপুর আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে মানুষ তখনই অমৃতত্ব লাভ করে, যখন অসীম অনাবিল ভালোবাসার আলোকে সে নিজেকে করে তুলতে পারে উদ্ভাসিত—মূলতঃ এই-ই হ'লো 'তমসার তীরে' নাটকের বক্তব্য।

= অভিব্যক্তি =

স্থান: অনির্দেশ্য। কাল : নিরবধি। পাত্র : নির্বিশেষ। জীবন। মরণ। ক। খ। গ।

জীবন। এ আমি কোথায় এলাম।

....

এ আমি কোথায় এলাম ?

....

এ আমি কোথায় এলাম !

....

কে আছ কোথায় দেখা দাও।

....

মানবী তোমার গান গাও ?

....

আলোক বাতাস ফুল পাখী গুধু কেউ নেই !

মরণ। তমসার তীরে আলো নেই আর ভালো নেই আর হাসি নেই।

জীবন। মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যায় কোনও লাভ নেই।

মরণ। তমসার তীরে সত্যে মিথ্যে ভেদ নেই।

জীবন। জীবন যেখানে পূর্ণ শূন্য সেখানে কিছু নেই।

মরণ। জীবন এখানে শূন্য। শূন্য তা ছাড়া কিছু নেই।

জীবন। তাই যদি হবে সে জীবন আমি হাসিতে প্রাণেতে পুরব।

মরণ। বেশ। পার যদি তবে তাই হোক।

....

জীবন। আঁধার আঁধার আঁধারেতে গেল সব ঢেকে।

মরণ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

জীবন। ঘুম। ঘুম। ঘুম। ঘুম কেন আসে নেমে নেমে।

মরণ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

জীবন। আঃ। আমি শ্রান্ত। আমি ক্লান্ত। আমি আর তো পারিনে চলতে।

মরণ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

....

ক। হাঃ। এই তবে সেই।

খ। নাঃ। অশোক কানন।

গ। নাঃ। বৃন্দাবন !

। উদ্দ্যবনিকা।

ক। জঙ্গল। কানন। বন। বাঃ।

খ। বেছে বলেছিস। বাঃ।

গ। আঃ।

ক। কি হ'লো? কি হ'লো?

খ। ব্যথা বাজলো?

গ। বাজলো।

ক। বটে! বটে। বাঃ।

খ। বাজলো বটে বারোটা। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

গ। না ব্যথা। বিষম ব্যথা। বোনটা—

ক। সুন্দরবন?

গ। নাঃ।

খ। অশোক কানন?

গ। নাঃ। আমার বোন।

ক। কোন বন?

খ। রাঙী না কালী?

গ। শ্যামলী। শ্যামলী বোন।

ক। ও হোঃ। যে সেই মরে গেল?

খ। গেল বাসে মরে গেল?

গ। মরে নিল গেল বাসে। শ্যামলীরে।

ক। আহাঃ।

খ। যম বড় নির্দয়।

ক। যা বলেছিস। দয়ামায়া নেই। শয়তান।

গ। নাঃ। দেবতা।

খ। দেবতা। ফুঃ শয়তান।

গ। নাঃ। ভগবান।

ক। শয়তান। শয়তান।

গ। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে করেন।

ক। সেই জন্যে আমি ডাকাত।

খ। আমিও।

ক। তাতে ভালোটা কি হ'লো?

খ। সব্বাই গাল দেয়।

গ। ধরতে পারলে সাজা দেয়।

ক। তবে?

খ। তবুও ভালো।

গ। তবুও ভালো। লোকে আমাদের ভয় করে।

ক। ভালো'ও বাসে না।

খ। এই চোপ্। ভালোবাসার কথা আর না।

ক। আর না!

গ। ভালোবাসা ছাড়া আর কি চাই?

খ। একটা ছুরি, বুকটা পাথর।

ক। হাঃ, নরম বুকে ছুরি বসালেই খর খর।

গ। খুন।

ক। না টাকা। হাঃ হাঃ হাঃ।

খ। আর কিছু না। আর কিছু না। টাকা।

গ। টাকাটাই সব না।

ক। টাকা ছাড়াও কিছু না।

খ। দয়া না। মায়া না। ভালোবাসা না।

গ। অমন করে বলিস না। বলিস না।

ক। কেন না।

খ। ব্যথা বাজে জানিস না।

ক। না। না।

খ। লক্ষ্মী ওকে ভালোবাসে জানিস না।

গ। এই চোপ্।

ক। লক্ষ্মী কসবী। হাঃ হাঃ হাঃ।

গ। খবরদার। খবরদার।

ক। গ, তুই তবে পাগল হলি।

খ। কসবীর টানে পাগল হলি।

গ। খবরদার। খবরদার।

ক। ওরা যে আগুন বোকা, পোকা হ'য়ে পুড়তে যাবি!

খ। পুড়ে পুড়ে বলসে যাবি। মরবি না। বেঁচে থাকবি।

গ। আঃ! আঃ। থামবি?

ক। ঝলসে যাবি। শ্বাস টানবি। হাওয়ার অভাবে হাঁপিয়ে মরবি।

খ। তারপরেতে খুন করবি।

গ। কক্ষনো না। কক্ষনো না।

খ। হতেই হবে। হতেই হবে। এই আমাকেই দেখ না।

গ। তোকে।

খ। আমার চোখে।

ক। চোখে?

খ। কি দেখছিস? লাল?

ক। লাল।

খ। খুন।

গ। যাঃ, নেশা। মহুয়ার রং লাল।

খ। আঃ।

ক। কি হ'লো ফের।

খ। ও নাম আর করবি না।

গ। মহুয়া।

খ। আঃ।

ক। মহুয়ার রং লাল। বাঃ।

খ। আঃ, চুপ, আঃ।

গ। চুপ না করে দেখ না চেয়ে।

খ। দেখব' চেয়ে?

গ। মহুয়া। এই দেখ। এই দেখ।

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

ক। আরে, আরে ক্ষেপলি নাকি। চুপ।

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

গ। আরে, আরে ক্ষেপলি নাকি। চুপ।

খ। মহুয়ার রং লাল। কৃষ্ণচূড়ার রং।

ক। কৃষ্ণ চুড়া।

গ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওইতো—ঐ ফুটেছে! লালে লাল।

ক। বাঃ। আকাশটা দেখ। গাঢ় লাল।

গ। সন্ধ্যা নামছে। সুন্দর।

খ। মহুয়ার চেয়ে?

গ। বুকে রাখতে ইচ্ছে করে। আহাঃ।

খ। খবরদার। খবরদার।

ক। চেঁচাস কেন? চুপ যার।

গ। তুইও না হয় রাখলি বুকে। নে ধর।

ক। গান শুনবি। বুকে ধর।

খ। গান না। গানের মত কান্না। আঃ।

ক। গান না। কান্না না। কিচ্ছুই ভালো লাগছে না।

খ। লাগছে শুধু পান করতে। দে, দেখাই। অাঃ।

গ। আমিও ভেজাই। আঃ।

ক। আমিই বা কেন বাদ চলে যাই। আঃ।

গ। জিনিষটা বেশ। বাঃ।

ক। সব ভোলানো গানের মত। বাঃ।

খ। আমি কিন্তু ভুলতে চাই না। নাঃ।

ক। ভুগতে চাস!

খ। ভুগবো কেন?

গ। ভুগতেই হবে। আমরা ডাকাত।

ক। আমরা ভুললেও কেউ ভোলে না।

গ। আমার চোখে চেয়ে দেখ না। লাল?

খ। লাল।

গ। খুন।

ক। খুন?

খ। খুন। না, না। আমি না। আমি না।

ক। চেঁচাস না। চেঁচাস না।

গ। গাছেরও কান রয়েছে। জানিস না?

ক। বাতাসেরও। ভুলিস না।

খ। আমি খুন করিনি কো। না। না।

ক। থাম। থাম। ভুল বকিস না।

খ। মহুয়া আমার প্রাণ ছিল রে।

গ। তাই বুঝি সে পড়লো ম'রে!

ক। কসবীর আবার ভালোবাসা!

গ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

খ। আঃ। আঃ। থাম না।

ক। চুপ। চুপ। কান্না না। কাতরানি না।

গ। আমরা ডাকাত ভুলে যাস না।

খ। আমি খুনে নই। না। না।

ক। হলেই বা কি? ওরা যখন ছুরি চালায়?

খ। ছুরি চালায়।

গ। ফেলে পালায়, বেইমানীরা?

ক। দয়া নেইকো। মায়া নেই কো। শক্ত ওরা।

খ। তাইত' আমি মদ গিললাম। সব ভুললাম। খুনে হলাম।

গ। খুন?

ক। খুন!

খ। এই ছুরিখানা বসিয়ে দিলাম।

ক। ওঃ, কি ভয়ানক।

গ। কি ভয়ানক, ওঃ।

খ। কাঁদতে কাঁদতে মরে গেল, ওহোঃ।

ক। কাঁদ না তবে। কাঁদ না খুব।

গ। কেঁদে কি লাভ? মিথ্যে ভেবে?

ক। বুকের বোঝা হাল্‌কা হবে।

গ। যে যায় সে ফেরেনা আর।

খ। ফিরতেই হবে। ফিরতেই হবে।

ক। কোথা থেকে বল ফিরবেই বা সে?

খ। ধোঁয়া হয়ে হারিয়ে গেছে ঐ আকাশে।

গ। ফিরবেই সে। ফিরবেই সে।

ক। নেশায় ধোঁকে স্বপ্ন দেখে পাগল হবি। ফিরবে না সে।

খ। ফিরিয়ে তাকে আনতেই হবে।

ক। কাঁদিস কেন? মহুয়া নে।

গ। গলায় ঢাল। ঢেলে দে রে। আরাম পাবি।

খ। এ-ই কি সেই!

ক। সে-ই। সে-ই।

খ। এই তার দেহ। কথা, হাসি, গান।

গ। তার। তার। তার মত সব্বার।

খ। তার মত বল কে আছে আর?

গ। লক্ষ্মী। লক্ষ্মী আমার।

ক। লক্ষ্মী কসবীর। হাঃ হাঃ হাঃ।

গ। হাসিস কেন?

ক। চেঁচাস কেন?

গ। লক্ষ্মী জানিস কসবী না।

ক। নয়তো তবে কি বল না?

গ। লক্ষ্মী মহুয়া।

খ। বেশ বলেছিস। লক্ষ্মী মহুয়া।

ক। বাঃ। বাঃ। বাঃ। ফের বলনা।

গ। নয় বা কেন?

খ। ওরাই ভালোবাসতে জানে।

ক। ফেলে পালায় বেইমানীরা।

খ। কক্ষনো না। কক্ষনো না।

ক। আর কি তবে তাই বল না।

খ। মহুয়া আমায় শাড়ী চাইতো। গয়না চাইতো।

গ। আর কিছু না?

খ। ছেলে চাইতো।

গ। লক্ষ্মীর মত! বাঃ।

খ। মহুয়া লক্ষ্মী। বাঃ।

ক। তারপর। তারপর।

খ। তার পর আমি ডাকাত হলাম।

গ। টাকার জন্তে।

খ। টাকার জন্যে ডাকাত হলাম। ডাকাত হয়ে জেলে গেলাম।

গ। দু বচ্ছর দুটো মাস।

ক। তারপর! তারপর!

খ। মহুয়া তখন কঁদল' আমার।

গ। কেঁদে কেঁদে ঝ'রে গেল'। শুকিয়ে গেল'।

খ। কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো দেখ। মাটিতে পড়ে শুকিয়ে গেল'।

গ। আকাশে দেখ। লাল রংটা মিলিয়ে গেল'। পালিয়ে গেল'।

ক। মহুয়া তখন পালিয়ে গেল'।

খ। তবুও সে বেঁচেই ছিল।

ক। শরীর বেচে বেঁচে থাকার লাভ কিছু নেই।

খ। বাঁচতে পারাই আসল কথা। বাঁচার জন্যেই ছুটে মরা।

ক। কি লাভ বেঁচে পশুর মত। এমনি ধারা পালিয়ে বেঁচে!

গ। আহা। ভগবানের শরীর এ যে।

খ। এই চোপ।

ক। কি হ'লো ফের!

খ। থামাও কথা ভগবানের।

ক। আহা! অনেক দয়া ভগবানের!

গ। তাইতো আজও আছি বেঁচে।

খ। পশুর মত হন্যে হ'য়ে মরছি ঘুরে বনে বনে।

গ। কপাল। কপাল। কপাল রে।

খ। কপাল আমি মানি নে।

ক। মহুয়া তবে মরলো কেন।

খ। রাত ফুরোলেই ফুল ঝরে যায়।

ক। মহুয়ার ফুল!

খ। শিউলির ফুল। মহুয়ার ফুল।

গ। মহুয়ার ভারী মিষ্টি গন্ধ।

খ। ঠিক বলেছিস। পাগল করা।

ক। তাই বুঝি তুই পাগল হ'লি?

খ। ডাকাত হলাম। আমরা সবাই ডাকাত হলাম।

গ। কক্ষনো না। কক্ষনো না।

ক। নয়-বা কেন তাই বল না?

গ। আমরা মানুষ ভুলে যাস না।

ক। মানুষ বলেই কথা বলছি!

খ। হাসছি। গাইছি। ভালোবাসছি।

ক। ভালোবাসছি! হাঃ হাঃ হাঃ।

খ। হাসিস না। হাসিস না।

ক। ভালোবাসার মানে জানিস না!

খ। জানতে চাইনা।

ক। জানতেই হবে। মুর্গি পোষা।

গ। বলিস কিরে! মুর্গি পোষা।

ক। সময় হলেই জবাই করা।

গ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

খ। কক্ষনো না। কক্ষনো না।

ক। মহুয়ার খুন শুকিয়ে গেছে।

খ। শুকোয়নিকো। তাজা আছে।

ক। তাজা আছে!

খ। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে আছে।

ক। বাঃ। বাঃ। বাঃ। বেশ বলেছিস।

গ। মানুষের মত কথা বলেছিস।

খ। মানুষ আমরা ছিলাম, আছি, থাকবোও তো।

গ। মানুষ আমরা ছিলাম বটে।

খ। আছিও বটে।

গ। কে-ই বা জানে।

খ। থাকবোও তো।

ক। সন্দেহ হয়।

খ। সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয়। মিথ্যে কথা।

গ। সত্যি কথা।

খ। মিথ্যে করেই বলনা তবে।

ক। মানুষ আমরা ছিলাম, আছি, থাকবো—এসব মিথ্যে কথা।

খ। মিথ্যে বলাই স্বভাব কেবল।

গ। মানুষের তাই স্বভাবই বল।

খ। আমরা সবাই মিথ্যে তবে!

ক। মিথ্যে বটে।

গ। তুই। আমি। আর ওরা সবাই। মিথ্যে বটে।

খ। লক্ষ্মী! লক্ষ্মীও তাই!

ক। চুপ। চুপ। চুপ। হাসছে সবাই।

খ। হাসাই তো ঠিক। উচিত হাসাই।

গ। উচিত হাসাই!

খ। ওরা কেউই মিথ্যে তো নয়।

গ। ওরা সবাই।

ক। ঐ গাছ ফুল পাখী তারা—ওরা সবাই।

খ। দূর আকাশের সন্ধ্যাতারা। কি সুন্দরই।

ক। অপরূপই।

গ। লক্ষ্মীর মত। লক্ষ্মীর হাসি সন্ধ্যাতারাই।

খ। সন্ধ্যাতারাই।

ক। হাঃ হাঃ হাঃ। হাসালি ভাই।

গ। খবরদার। খবরদার।

খ। লক্ষ্মী চিনতো টাকাই।

ক। তুই চিনেছিস লক্ষ্মী।

খ। হাঃ। হ. হাঃ।

ক। তারাটা যেন রূপোর টাকা। সস্তা টাকা।

খ। টাকা লক্ষ্মী। লক্ষ্মী টাকা।

ক। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

গ। লক্ষ্মীছাড়া তোরা সবাই।

খ। অনেক দিনই।

ক। জন্মোত্তর'ই।

গ। আমি কিন্তু লক্ষ্মীমন্ত। ছিলাম।

খ। লক্ষ্মী এখন ভূত।

ক। যমের ঘরের বাঁদী।

গ। শয়তান। শয়তান।

ক। যম হলেন রাজা।

খ। স্বর্গের লোক। দেবতা।

গ। শয়তান। শয়তান।

ক। চুপ। চুপ। চেঁচাস না আর।

গ। আমার চোখে দেখনা এবার।

খ। জল।

গ। খুন।

ক। খুন।

গ। আবার আমি খুন করবো। খুনে হ'বো।

খ। যমরাজকে!

গ। শয়তানকে।

ক। যম হলেন রাজা। দেব্‌তা।

খ। দেব্‌তারা মরেন না?

ক। না। শুধুই মারেন।

গ। যমকে পেলে মেরে মেরে ফেলবো মেরে।

খ। পারবি তো রে?

গ। নিশ্চয়ই রে।

খ। আমিও তবে খুনে হবো।

ক। খুন করলেও রাগ যাবে না।

খ। এমনভাবে মারতে হবে, বাঁচতে পারে আর যেন না।

গ। আবার ছোরায় রোজ শান দিই।

খ। আমিও দিই।

গ। ছোরা যখন ঢিথবে খুনে।

খ। আমিই তাকে মারবো আগে।

গ। তুই মারবি সোজা পিঠে।

খ। তুই মারবি সোজা বুকে।

ক। বাঃ। বাঃ। বেশ! সাবাস! সাবাস।

গ। লক্ষ্মী আমার কলজে ছিল।

খ। মহুয়া আমার পরাণ ছিল।

গ। শ্যামলী আমার ফুসফুস্ ছিল।

খ। ঐ শয়তান প্রাণ কেড়েছে।

গ। আমার কলজে গেছে। ফুসফুস্ গেছে।

ক। থাম ভীরুগুলো। করিসনা আর গেছে, গেছে।

খ। যমরাজাকে হয়রাণ আমি খুঁজে খুঁজে।

গ। শয়তানকে দেখবো বলে রয়েছি প্রেক, চোখ না বুজে।

ক। চুপ কর। এটা শেষ করে দে।

খ। আহা! ঠিক বলেছে। ঠিক বলেছে।

গ। এই জলেতেই জীবন আছে।

খ। জল নয়রে, মহুয়া আছে। আঃ।

গ। লক্ষ্মী আছে। আঃ।

খ। বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল।

গ। লক্ষ্মী যেন হেসে উঠলো।

ক। আঃ। জলে গেলাম। গেলাম জলে।

খ। আঃ। কি শান্তি। কি আরাম।

গ। আঃ। কি ঠাণ্ডা। কি নরম।

ক। জলে গেলাম। মরে গেলাম।

খ। মহুয়ার হাতের মতন। বাঃ!

গ। লক্ষ্মীর হাসির মতন। বাঃ!

খ। কৃষ্ণচূড়ার রূপের মতন। বাঃ।

গ। সন্ধ্যাতারার আলোর মতন। বাঃ।

ক। আঃ। সব আলো নিভে গেল'। অন্ধকার।

গ। তারার আলো ফুটবে এবার। ফুটবে এবার।

খ। জোনাক্ আলো জ্বলবে এবার। জ্বলবে এবার।

ক। জ্বলবে না। আলো জ্বলবে না। অন্ধকার।

খ। কোথায় আঁধার। কোথায় আঁধার?

ক। আমার মনে। মনে আমার।

খ। এই তো সবে দিন নিভ্‌লো।

গ। দিনের আলো নিভে গেল'।

ক। আমার দিন গেছে নিভে, অনেক দিন'!

খ। সে তো গেছে অনেক দিনই।

গ। ছুরি ধরলাম সেই—যেদিনই।

খ। ডাকাত হলাম।

গ। টাকার জন্যে খুনে হলাম।

ক। শান্তনুকে শ্মশানেতে রেখে এলাম!

খ। শান্তনুটা! আহাঃ।

গ। সত্যি ভারী ভালো ছিল। আহাঃ।

ক। আমার খুব বন্ধু ছিল।

খ। তোরা দুটোয় একই ছিলি।

ক। খেতাম, শুতাম, কাজে যেতাম—একই সাথে।

গ। করলে নাকো বিয়ে।

খ। ছাড়াছাড়ির ভয়ে।

ক। আমরা ছিলাম এক কোটরের কাঠ-ঠোক্‌রা।

খ। শান্তনুটা জোয়ান ছিল।

গ। হাসতে জানতো, গাইতে জানতো।

ক। আহা! সে কতদিন যে হ'য়ে গেল!

গ। টাকার জন্যে ভেবে ভেবে মরে গেল।

ক। এমনি ভ'বে মরে যাওয়ার নেইকো মানে।

খ। মরে যাওয়াটাই বিরাট মানে!

গ। 'জন্মালেই মরতে হবে' গুরুমশাই বলতো বটে।

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

গ। বোকার মত হাসিস না। হাসিস না।

খ। সাধু ভাষার বলিস কথা। হাসবো না!

গ। আমরা এখন সবাই সাধু।

খ। সাধু। সাধু।

গ। মুনি। ঋষি।

ক। আমরা আর মরবো না কেউ। কারণ আমরা নেই কো বেঁচে।

গ। নেই কি বেঁচে!

ক। নেই। নেই।

খ। কিন্তু আমরা চাই বাঁচতেই।

ক। উপায় নেই। উপায় নেই।

খ। উপায় নেই। উপায় নেই।

ক। কারণ আমরা মানুষ নেই।

গ। আমরা সবে ভূত হ'য়েছি।

ক। ভূত বা অতীত। হারিয়ে গেছি।

খ। না। না। আমরা বেঁচেইতো আছি।

ক। আমরা মেরে ভূত হ'য়েছি।

গ। কে আমাদের মারলে রে ভাই?

ক। সময়—কসাই।

খ। সময়—কসাই!

ক। কাল—দেবতাই।

গ। কাল—দেবতাই!

ক। যম রাজাটাই।

খ। যমকে আমি মুঠোয় চেপে মারবো রে ভাই।

ক। যমের কোনও আকার তো নেই।

গ। রূপও কি নেই?

ক। যমকে ধরা যায় না। ছোঁয়া যায় না। মারা যাবে না।

খ। যমকে কেন ধরা যায় না?

ক। সময়কে তো মারা যায় না।

গ। যৌবনকেও মারা যায় না।

ক। যৌবনকেও যমে ছাড়ে না।

খ। যৌবনেরও কান্নাতে ওরে ভরেছে বন!

ক। ভরেছে বন। আকাশ। বাতাস।

গ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। কান্না বটে শুনেছি কার।

খ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। কান্না আমি শুনেছি কার।

ক। আহা। বড্ড কচি প্রাণ ছিল তার!

খ। আহা। কচি প্রাণটাকে কেড়েছে।

গ। আহা। স্বপ্নকে ওর ভেঙেছে!

খ। আহা। কী করুণ সে কান্না।

গ। আর না। এই বিলাপ আর না।

খ। মৃত্যুকে তবে মার না।

ক। নইলে থামবে না আর কান্না।

খ। নে, চল তবে আর দেরী না।

গ। ক, তুই যাবি পুব প্রান্তে।

ক। খ, তুই যাবি পশ্চিমান্তে।

খ। গ, তুই যাবি উত্তরান্তে।

গ। দক্ষিণান্তে পাব কৃতান্তে।

ক। দক্ষিণে ওই যমের দোরে দিয়েছি কাঁটা।

খ। আমরা ক'জনায় মিলে দিলাম তবে তো তাই ফোঁটা!

গ। আলবাৎ, সে তো ঠিক কথা।

ক। আয় তবে হাতে হাত মেলা।

খ। এই মেলানোর। শপথ বলা।

ক। আমরা নিলাম শপথ ভীষণ।

গ। কালান্তক ঐ দানবটাকে করবো খতম।

খ। করবো খতম। করবো খতম। করবো খতম।

ক। জীবনকে যে মেরেছে সে হবেই খতম।

গ। হোক সে স্বয়ং যমরাজা বা দানব ভীষণ।

খ। যমরাজাকে করবো খতম।

গ। করবো খতম। করবো খতম। করবো খতম॥

ক। কোনও লোভেতেই ভুলবো না।
খ। কোনও ভুলেতেই ঘুরবো না।
গ। এ শপথ কভু ভুলবো না।
ক। আমরা লড়বো অথবা মরবো।
খ। আমরা মরবো অথবা মারবো।
গ। যমকে আমরা মারবো। মারবো। মারবো।
খ। মারবো। মারবো। মারবোই।
ক। চল তবে শুরু করি খোঁজা।
খ। আকাশ বাড়ী ও বনেতে বনেতে হোক খোঁজা।
গ। তোলপাড় করে হোক খোঁজা।
ক। খুঁজি, খুঁজি অরি। যে পায় তাহারি। তারি লেখা।
খ। ভালো চাস যদি দানবরে তুই দিবি দেখা।
গ। নইলে তখন দেবতা বলেও পাবিনে ছাড়া।
ক। খুঁজি খুঁজি অরি যে পায় তাহারি তারি লেখা।
খ। এইও। এইও। কে হোথা?
গ। বটে তো। বটে তো। কে হোথা?
ক। কে বসে ওখানে কও কথা।
খ। এইও। এইও। আয় উঠে।
গ। এইও পাজীটা। আয় উঠে।
ক। না আসিস যদি ছোরাখান যাবে ঢুকেতে।
খ। ভাল চাস যদি উঠে আয় তবে সমুখেতে।
ক। সোনাটি। মণিটি। লক্ষ্মী ছেলেটি। গুটি গুটি পায়ে আয় চলে।
গ। হাঁটি, হাঁটি, পায়, পায়।
খ। খোকনমণি ইক্কি আয়।
গ। আহা। ভয় নেই ওরে আয়; আয়।
ক। আয়। আয়। আয়রে।
খ। আহারে। বাছারে। ভয় কিরে।
গ। কিচ্ছুটি তোকে বলবো না রে।

ক। আয়। আয়। আয় রে।
খ। এইতো বাহবা। বাঃ।
ক। লক্ষ্মী বাবুটি। বাঃ।
গ। আহা, দেহখানি দেখ। বাঃ!
ক। আহা, মুখখানি দেখ। বাঃ!
খ। আহা, চোখ দুটি দেখ! বাঃ!
ক। বাহবা। বাহবা। বাঃ।
খ। এইরূপ। আহা, তুমি কেপা!
গ। কোন দুখিনি মায়ের বাছনি গো!
ক। এক্কেও বেরেছে দানবটা।
খ। হয় তো বা।
গ নিশ্চয়ই তাই হবে বা।
খ। দনটাকে যদি হাতের কাছেতে পাই না—
গ। এক ঘায়ে তার ফুস্‌ফুস্‌ দেব' কাঁসিয়ে।
ক তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেই দুই পায়ে দেব' গুঁড়িয়ে।
খ ঐ শিশুগাছে তার ধড়টা টাঙিয়ে কাটবো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।
ক। দাগো, যমকে কি তুমি দেখেছো?
খ। শয়তানটাকে দেখেছো?
গ। দেখেছো।
খ। এঁ্যা।
ক। দেখেছো!
গ। তুমি চুপচাপ তবে দাও দেখি তাকে দেখিয়ে।
ক। ইসারায় দাও দেখিয়ে।
খ। এঁ্যা! ঐ গাছের তলায় লুকিয়ে!
গ। হুররে। হুররে। হুররে।
ক। ওরে চুপ। চুপ। চুপ। হতভাগা যাবে পালিয়ে।
খ। চুপচাপ আয়। চুপচাপ আয়।
ক। ছোরাখানা বার বাগিয়ে।

। সাতাশব্দই ।

গ। একসাথে চল আগিয়ে।

ক। এক। দুই। তিন। চার। পাঁচ।

খ। ছয়। সাত। আট। নয়। দশ।

গ। দশ। নয়। আট। সাত। ছয়।

ক। পাঁচ। চার। তিন। দুই। হাঃ।

খ। মেরেছি। মেরেছি। হাঃ।

ক। এই এক ঘা। এই এক ঘা। হাঃ।

গ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। ফক্কা।

খ। ফক্কা। ফক্কা! ফক্কা।

ক। যাঃ। এই তো পেয়েছি টাকা।

গ। টাকা। টাকা। টাকা।

ক। টাকা! টাকা! টাকা! টাকা!

খ। বস্তাভর্তি টাকা!

গ। রূপো আর ছাপা টাকা!

ক। অনেক। অনেক টাকা।

খ। তাইতো রে! এযে অনেক।

গ। দশলাখ। বিশলাখ খানেক।

ক। হাতেও পায়ে বা কোটিখানেক।

খ। কো—টি—খা—নে—ক!

গ। ওরে। ওরে। ওরে। আমার চোখেতে দেখতো।

খ। আমার চোখ কি খোলা আছে আর দেখবো।

ক। আমি ঘুমোব। ঘুমোব। ঘুমোব।

গ। আমি স্বপ্ন দেখবো। দেখবো। দেখবো।

খ। না। না। গুণে গুণে আয় দেখবো।

ক। গুণে গুণে তারা ফুরোয় না।

খ। গুণে গুণে টাকা ফুরোবে না।

গ। গুণে গুণে টাকা কমবেই।

ক। টাকা কমবে না।

খ। টাকা বাড়বে না।

গ। ভাগাভাগি তবে চলবে না।

ক। চলতেই হবে।

খ। নিশ্চয়ই।

গ। নিশ্চয়ই হবে গুণতেই।

ক। গুণে গুণে রাত ফুরোবেই।

খ। এ দেশে রাত তো ফুরোবে না।

ক। এ দেশে আমরা থাকবো না।

গ। থাকবো না। থাকবো না। থাকবো না।

ক। ঠিক কথা। পালাবোই পালাবো।

গ। টাকা নিয়ে দেশে গিয়ে ঘর দোর বানাবো।

খ। লক্ষ্মীকে তো ফিরে পাবো না।

গ। টাকা পেলে বেঁচেতো যাবই।

খ। সেই কথা বল। বাঁচবোই।

ক। বাঁচবো। হাসবো। ভালোবাসবোই।

গ। ডাকাত হবো না।

খ। খুনেও হবো না।

ক। জীবনকে ফিরে পাবোই।

খ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। বাঁচবো, আমরা বাঁচবোই।

গ। বাঁচবো। বাঁচবো। বাঁচবোই।

ক। আহা। আকাশ। বাতাস। গাছ। ফুল। পাখী। সুন্দর।

খ। আহা! ঘর। দোর। পথ। নদী ও পাহাড়। সুন্দর।

গ। আহা। সাবলী। লক্ষ্মী। মহয়ারা তারী সুন্দর।

ক। আয় তবে টাকা ভাগ কর।

খ। ভাগাভাগি থাক। টাকাগুলো নিয়ে ঘরে চল।

ক। সেই ভালো তবে। গাড়ী ডাক গ। ঘরে চল।

গ। এত টাকা বওয়া সোজা নয় বটে। গাড়ী চাই।

খ। গ তুই তবে গাড়ী বল ভাই।

গ। আহা! টাকার থলেতে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুমোব।

ক। ঘুমোতে ঘুমোতে ঘরের কাছেতে চলে যাবো।

গ। ছুটে যেয়ে গাড়ী আনবো।

ক। আরে শোন, শোন। এটা দেখ দেখি।

খ। আহা। শূণ্য বোতল ভরে যেত' যদি এখনি!

গ। শূণ্য বোতল পূর্ণ হ'তে বা ক্ষতি কি?

ক। তবে তুই ওটা ভরে আন।

খ। বুক ভরে সুধা করি পান।

গ। সুধা বুকে ভরে টাকা কোলে নিয়ে ফিরবো। বাঃ।

খ। বলেছিস ভালো! বাঃ।

ক। বাহবা। বাহবা। বাহবারে গ। বাঃ।

গ। আমি যাই তবে। তোরা যেন চলে যাস না!

ক। আরে থামো। রামো। রামো! অমন কথাটা বলিস না।

খ। অমন কথা'টা বলিস না।

ক। তিনজনে মোরা এক মন এক প্রাণ না!

গ। আহা, রাগ করিস না ভাই, করিস না।

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। গ'টা ভারী ভালো ছেলে তো!

ক। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। গ'টা ভারী বোকা ছেলে তো!

খ। আচ্ছা। বস্তায়, ঐ কত টাকা। ক-ত-টা-কা!

ক। হাজার। অযুত। নিযুত। লক্ষ। কোটী টাকা!

খ। দশ কোটি। বিশ কোটি টাকা।

ক। আয়, আয় দেখি ওটাকে কাটি।

খ। আরে না। না। তবে হবে সব মাটি।

ক। বস্তাটা কেটে কিছু টাকা যদি—

খ। রাখবি সরিয়ে নাকি।

ক। যদি তাই করি?

খ। গ এসে বুঝলে?

ক। বুঝবে না যদি বেঁধে ছেঁদে রাখি।

খ। রাখা মুশকিল।

ক। মুশকিল কেন?

খ। ভাঙ্গা জোড়া লাগে। নতুন হয় না।

ক। বেশ হতো ভাই। আগে থেকে কোন মতে—

খ। কিছু টাকা যদি—

ক। গা'বস্তার মেরে দিতে?

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

ক। তুই আর আমি—

খ। আরে চুপ। চুপ।

ক। তুই আর আমি নিই যদি বেশী—

খ। আরে চুপ। চুপ।

ক। তুই আর আমি নিই যদি বেশী দোষ কি তাতে?

খ। দোষ নেই মোটে!

ক। নেই। নেই।

খ। ঠিক বলছিস দোষ নেই।

ক। নেই। নেই।

খ। গোটা অন্যায়। পাপ ভাই।

ক। বড়লোকদের পাপ নেই। অন্যায় নেই।

খ। তুই আমি বড়লোক ন'ই।

ক। বেশী টাকা হ'লে বেশী ধনী হবো।

খ। বেশী পাপী। বেশী অপরাধী।

ক। থাম। থাম। তুই চুপ যা।

খ। কর তবে তোর মন যা।

ক। টাকা চাস্ তুই?

খ। নিশ্চয়ই চাই।

ক। বেশী টাকা চাস নিশ্চয়ই?

খ। বেশী ধনী হ'তে চাইনাকো ভাই।

ক। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

খ। হাসিস না। হাসিস না।

ক। জলে জল বাধে। জানিস না!

খ। টাকা টেনে আনে বটে টাকা।

। নিরানব্বই ।

ক। অনেক টাকা। আরো বেশী টাকা।

খ। হাজার। অযুত। লক্ষ। নিযুত। কোটী টাকা।

ক। কোটী টাকা হ'লে ধনী হওয়া ছাড়া পথ নেই।

খ। বন্যায় ঐ টাকা আছে বটে কোটীখানেক।

ক। কোটী বিশ। ত্রিশ। শ'খ'নেক।

খ। তবে তো আমরা ধনী অনেক।

ক। আলবাৎ। তাতে ভুল নেই।

খ। বড়লোক হ'লে পাপ নেই? অন্যায় নেই?

ক। আলবাৎ। তাতে ভুল নেই।

খ। তবে তো দেখছি মরবেই।

ক। আলবাৎ। গ মরবেই।

খ। হাঃ। হাঃ। হাঃ! হুররে!

ক। আমরা মেলাই বড়লোকরে!

খ। এই ছুরিটাতে তবে শান দিই।

ক। এইটাও তবে শেনে নিই।

খ। সক্। সক্। সক্। সক্। সক্। সক্। হাঃ!

ক। হিস্। হিস্। হিস্ হিস্। হিস্। হিস্। হাঃ।

খ। বেয়নেট ভাঙ্গা ইস্পাত।

ক। তরোয়াল ভাঙ্গা ইস্পাত।

খ। বেয়নেট বড়ো ইমান্দার।

ক। তরোয়াল খুব হুঁশিয়ার।

খ। বেইমানী এরা করে না।

ক। কারণ এরা তো মানুষ না।

খ। আমরাও কেউ মানুষ না।

ক। আমরা ডাকাত। বুকটা পাথর।

খ। আমরা খুনে। জেল-ফেরা সব।

ক। আমাদের কেউ ভালোবাসে না।

খ। টাকা ছাড়া কিছু ভালোবাসি না।

ক। টাকারা মোটেই বেইমান না।

খ। বন্ধুর মত। মেয়েদের মতো বেইমান না।

ক। সবাই শুধু টাকা চায়। খালি টাকা চায়।

খ। টাকা দিয়ে সবই কেনা যায়।

ক। ইমান্। শান্তি। ভালোবাসা সব কেনা যায়।

খ। সুতরাং আর কিবা চাই?

ক। টাকা চাই। আরো টাকা চাই।

খ। গ'কে তার আগে মারা চাই।

ক। আলবাৎ সেটা করা চাই।

খ। এই চুপ। চুপ। চুপ যা।

ক। গ আসে ওই তো। ওই না?

খ। আয় এইখানে বসে যা।

ক। কিচ্ছুটি যেন জানি না।

খ। নেশা নেই তাই কিচ্ছুটি ভালো লাগে না রে।

ক। গ নেই তাই কিচ্ছুটি ভালো লাগে না রে।

খ। আহা। গটা কেন আর আসে নারে!

ক। ওরে গ, গ'রে।

খ। কোথা গেলি ভাই। আয়রে।

গ। এইতো। এইতো। আসি রে।

ক। আয়। আয়। আয়। এসেছিস।

খ। সুরা ভরে ভরে এনেছিস!

গ। সুরা কিরে। বল অমৃত।

ক। আহা। অমৃত। অমৃত। অমৃত!

খ। দে। দে। দেখি চেখে নিই।

ক। চোপ্‌রও। আমি বড়ো হই।

গ। নিশ্চয়ই। আরে নিশ্চয়ই।

খ। পেসাদ করেই তবে দেনা ভাই।

ক। দে। তবে করে দিই ভাই। আঃ।

খ। এইবার আমি গলার মধ্যে ঢেলে দিই। আঃ।

গ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হুররে!

ক। একি। একি। একি হ'লো রে!

খ। বুক জ্বলে যায় কেন রে!

ক। আলো নিভে যায় কেন রে!

গ। হায়রে। হায়রে। হায়রে।

খ। গ কোথা ভাই গেলি রে।

ক। কাছে আয় তোকে দেখি রে!

খ। আয়। আয়। কাছে আয়রে।

গ। হ'লো কি। হ'লো কি। বলরে?

ক। এই শোন তবে হ'লো কি।

গ। আঃ।

খ। এই শোন ফের হ'লো কি।

গ। আঃ।

ক। শয়তান। তুই বেইমান।

খ। বিষ দিলি তুই বেইমান।

গ। আঃ! আমি মরলাম। আমি মরলাম।

ক। আঃ। আঃ। আমি মরলাম।

খ। আমি মরলাম। আমি মরলাম।

গ। আলো নিভে গেল। সব আঁধার। আঃ।

খ। নরকে নামছি। অন্ধকার। আঃ।

ক। পাতালের নীচে সব আঁধার। আঃ।

....

মরণ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

জীবন। কে হাসে! কে হাসে! হেসো না।

মরণ। লোভে পাপ! পাপে মৃত্যু। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

জীবন। মানুষকে মেরে সুখ পাও যদি হেসো না।

মরণ। কাম। ক্রোধ। লোভ। হিংসা তো এরা। মানুষ না।

জীবন। আমি তো মানব। মানবই।

মরণ। তুমি আজ মৃত। সমাপ্ত।

জীবন। জীবন কি কভু মরে ভাই।

মরণ। তুমি অপহৃত। তুমি অতীত।

জীবন। আমি যৌবন। চির যৌবন তো।

মরণ। ভুল। ভুল। তুমি মহাভুল।

জীবন। সবুজ প্রাণের বাগানে আমি এক চিরজীবি ফুল।

মরণ। এখানে বাতাস নেইকো।

জীবন। এখানেও আমি বাঁচবো।

মরণ। এখানে আলোক নেইকো।

জীবন। আমি নিজেকে দিয়েই জ্বালবো।

মরণ। আমি স্তব্ধ করাবো তোমাকেও।

জীবন। আমি ভালোবাসি তবু তোমাকেও।

মরণ। আমি কচি-প্রাণ-কাড়া মৃত্যু।

জীবন। তুমি জীবনেরই সহোদর তো।

মরণ। তুমি তবে কেন এসোনা এখানে। ভায়ের কাছেতে।

জীবন। আমি তো এসেছি। তুমিই এনেছো আমাকে।

মরণ। সে তোমার দেহ। মন নয়।

জীবন। ফুল ঝরে যায়। গন্ধ তো তবু মরে না।

মরণ। চোপ রও। তুমি উন্মাদ।

জীবন। বড়োভাই তুমি পাগলের মতো করো না।

মরণ। উঃ। থামো। থামো। তুমি থামো না।

জীবন। আমি হাসি। তুমি শোন না।

মরণ। না। না।

জীবন। আমি গান গাই। তুমি শোন না।

মরণ। না। না।

জীবন। আমি বাঁচি তুমি চাও না।

মরণ। না। না।

জীবন। যৌবন সে যে মরে না।

মরণ। অত অহমিকা ভাল নয়।

জীবন। আমি ছলনাকে করি না তো ভয়।

মরণ। আয়। আয় ভাই। আমাকে কষ্ট দিস না।

। একাঙ্কোত্রিক ।

জীবন। আমাকে তোমার খুব কাছে টেনে নাও না।

মরণ। উঃ। শয়তান, তুই শয়তান।

জীবন। দেবতা। নিজেকে ভুলো না।

মরণ। আমি দেবতা নইকো। দানব।

জীবন। আমি সহোদর ভাই। মানব।

মরণ। আমি আলোক, বন্ডাগ নেবো কেড়ে।

জীবন। হে পুরুষ। তুমি জাগো।

মরণ। আমি হিংসার বিষে কালো করে দেবো সব'খান।

জীবন। হে মহাপ্রেমিক। জাগো। জাগো।

মরণ। একি হ'লো। একি হ'লো। কেন জাগে ভয়!

জীবন। কেটেছে আঁধার। জেগেছে জ্যোতির্ময়।

মরণ। একি আলো! একি নির্মল আলো!

জীবন। এ আলো তোমার লাগে না সত্যি ভালো!

মরণ। তমসার তীরে এ আলোর জাগে। জাগে কে?

জীবন। মহাজীবনের দূত আমি ভাই। আমি চির যৌবন যে!

মরণ। হে মানব। তুমি জীবনকে নিলে ছিতে।

জীবন। আমি ভালোবাসি। তাই জীবনকে পাই ফিরে

মরণ। তুমি সত্য। তুমি সার্থক। তুমি সুন্দর।

জীবন। তুমি জীবন পরপারের জীবন। তুমি শাশ্বত।

মরণ। হে মানব। তুমি বর চাও।

জীবন। বর দাও। তুমি বর দাও।

মরণ। বর দেবো তুমি যাই চাও।

জীবন। অসতো মা সদ্গময়ঃ।

মরণ। ওঁ স্বস্তি।

জীবন। তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।

মরণ। ওঁ স্বস্তি।

জীবন। মৃত্যোর্মামৃতং গময়ঃ।

মরণ। ওঁ স্বস্তি। *

---

* প্রযোজনার সুবিধার জন্য মঞ্চ-নির্দেশনা উহ্য রাখা হলো। এ নাটকের অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক।

অসাময়িক

॥ ক্ষণেশ প্রসাদ দত্ত ॥

মানুষটির নাম সত্যপ্রিয় চৌধুরী। আজ বয়স হয়েছে, এবং তার সঙ্গে আরো এমন একটা কিছু হয়েছে যাতে অনেকদিন পরে কেউ যদি তাঁকে হঠাৎ চিনতে পারে না। আমিও পারিনি। গোড়াতে পারিনি। ফিল্ম-পরিবেশকদের আপিসে যাবার সিঁড়ির মুখটা দুপুরেও অন্ধকার। সেইখানে সিঁড়িতে ওঠবার জন্যে পা বাড়িয়েই হঠাৎ অন্তোখানি একটা দীর্ঘ শরীর মুখোমুখি এসে পড়ায় পাশ কাটাবার মধ্যেই একবার তাকিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেও ঐ এক পলকের জন্তই, তারপরেই চোখ ফিরিয়ে আপন গতিবেগে ওপরেই উঠে যেতাম, কিন্তু বিন্দুর মধ্যে ততক্ষণে টরে টক্কা ক'রে একটা টেলিগ্রাফের বার্তা চঞ্চল ক'রে তুলেছে—লোকটার চোখটা যেন আমাকে চিনতে পারলো, লোকটার চোখটা যেন আমাকে চিনতে পারলো,—সঙ্গে সঙ্গে মোটর-নার্ভগুলো ব্রেক কষলো, আর আমি প্রায় ভদ্রলোকের গায়ের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে তাঁ'র মুখের দিকে তাকালাম। ঠিক। ভদ্রলোকের চোখে সেই চিনতে পারার ভাব। আমার মাথার মধ্যে তখন যেন ডজনখানেক কেরাণী তাদের অফিসারের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফাইলের তাড়ার মধ্যে খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

দীর্ঘ ভদ্রলোকের শীর্ণ মুখের ওপর হাসি। ঝোঁক দিয়ে জ্রযুটিকে উপর দিকে তুললেন কুশলপ্রশ্নের ভঙ্গীতে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনতে পারলাম। বিস্ময়ে কথাগুলো যেন আমার মুখ থেকে স্খলিত হয়ে পড়লো—"আপনি! এ কী চেহারা! এ রকম কেন হোল? কী হয়েছে আপনার?"

সত্যপ্রিয় ভাঙা তোবড়ানো গালে আবার একটু হাসলেন। বল্লেন,—"আমিও তো ভেবে ভেবে কোনও ঠাওর পাচ্ছি না। তোমরা কেউ বলতে পারো? যে কী হোল আমার?"

আগেকার মতো সেই মেঘডাকা গম্ভীর আওয়াজ নেই সত্যপ্রিয়ের। নবনাট্য আন্দোলনের মঞ্চে যে কণ্ঠ শুনে লোকে উদ্বেল হোত, মেয়েরা প্রেমে পড়তো, সে উদাত্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ সে যেন অনেক ক্লান্ত, অনেক ফিকে। হঠাৎ মনে হ'তে পারে এ কণ্ঠ যেন আর কথোপকথনেরও নয়, এ যেন শুধু স্বগতপ্রলাপের।

আমারও সেই কথাই মনে হোল একটু পরে তাঁর সঙ্গে চায়ের দোকানে ব'সে। এতদিন পরে দেখা, আমার সত্যদাকে যে কী দিয়ে আপ্যায়ণ করবো ভেবেই পাই নি। আমার যাবার কথা ছিল ওপরতলার এক ফিল্মপরিবেশকের আপিসে একটা পোস্টারের ডিজাইন নিয়ে, ভুলে গেলাম সেসব, আমন্ত্রণ

॥ একশোতিন ॥

ক'রে নিয়ে গেলাম সত্যপ্রিয়দাকে মোড়ের ছোট্ট চায়ের দোকানটা'য়, অনেক কথা বলবো আর অনেক কথা শুনবো ব'লে। অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে, অনেক কথা আমার শোনবার আছে, অনেক খবর আমার জানবার আছে।

সত্যদা বল্লেন,—"তা এককালে তো আমাকে গুরু ব'লে মানতে, তারই দক্ষিণাস্বরূপ দুটো টোস্ট্ খাওয়াও তো। আজ সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি।"

সেকি। আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম—"চলুন তাহ'লে একটা ভালো জায়গায় যাই, পেটভ'রে খেয়ে নেবেন, এখানে শুধু টোস্ট্ খেয়ে কী হবে। চলুন।"

হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। মাথা নেড়ে বল্লেন,—"নাহে। ঐ দুখানা টোস্টের ওপর দিয়েই যাক। বেশী দক্ষিণা চাইতে গেলে আমার সম্পর্কটাই ভেঙে যাবে। বোসো।"

আমি বসলাম, কিন্তু ওঁর কথায় একটা অভিমানের আবেগ আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ফুলে উঠ্তে থাকে, বল্লাম,—"আমি জানি অনেক লোক আপনার সঙ্গে বেইমানি করেছে, আপনারই সাহায্যে দাঁড়িয়ে উঠে পরে আপনার নামেই কুৎসা ক'রে বেড়িয়েছে, কিন্তু আমি বোধহয় তাদের মতো নই, আমি সেরকম বংশে জন্মাইনি। আমার যদি কোনও মনুষ্যত্ব থাকে, আমার যদি কোনওরকম সত্যজ্ঞান হয়ে থাকে,—সে সমস্ত আপনার জন্যে। আজ যদি তার দক্ষিণা দিতে আমাকে সর্বস্ব দিতে হয় সেও আমি হাসিমুখে দিতে পারবো, দুখানা টোস্ট্ খাইয়ে শোধ দিতে চাইব না।"

বলতে বলতে সত্যিই আমার চোখজোড়া ক'রে জল এসে পড়লো, আমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হ'ল।

সত্যপ্রিয়দা কিন্তু কিছুই বল্লেন না, চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন, যেন আমার এই আবেগের ভিতর দিয়ে আরো অনেক গভীর কথা, অনেক মৌন কথা তাঁর চোখের সামনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যার কোনও সমাধান নেই।

একটু পরে আপন মনে বল্লেন,—"কেন যে এমন হয়! আমার কাছে এলেই সবায়ের কেন যে এমন হিস্টিরিয়া হয়। কিন্তু আমি তো আর কিছু চাই না। স্তুতিও চাই না, কুৎসাও চাই না,—খালি একটু বিশ্রাম চাই।" একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁর।

এই সেই সত্যপ্রিয় চৌধুরী যে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের একজন নেতা। সেদিন যার শরীর ছিল বিশাল, মন ছিল তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপরিমেয়, আর আশা ছিল তার চেয়েও বেশী। আজকের মতো এই নিষ্প্রভ চোখ নয়, সেদিন যার চোখ ছিল বিদ্যুতের মতো শাণিত; আজকের মতো এই অস্থি-চর্মসার ক্লান্ত মুখাবয়ব নয়, সেদিন যার মুখে সকালের আলো ঝলকাতো; সেই সত্যপ্রিয়দার মনে কোনও সংশয় ছিল না। যার মনে ভরসা ছিল যে স্বার্থান্বেষী মুনাফালোলুপ মুষ্টিমেয় লোক দেশের সাধারণ লোকের পরিস্ফুরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেবল তাদের জন্যই জনগণের সংশিল্পের রসাস্বাদনের পথে বিঘ্ন ঘটছে। তাই স্বার্থত্যাগ ক'রে একনিষ্ঠভাবে সত্যিকার নাটকের অভিনয় ক'রে যেতে হবে, কেবল

দেশের লোককে ভালো জিনিষটি দেখবার সুযোগ ক'রে দিতে হবে, তাহলেই তা'রা আপন-পর বুঝতে পারবে, এবং যা সৎ ও সত্য তার জয় হবেই। এ হবেই হবে।

এবং সত্যই কিন্তু তখন তখন হয়েওছিল জয়। হৈ হৈ প'ড়ে গিয়েছিল সত্যপ্রিয় চৌধুরীর প্রযোজনায়। বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া প'ড়ে গেল নতুন যুগ এসেছে ব'লে। নাট্যাভিনয় আবার নতুন ক'রে এবং আগের চেয়ে অনেক বেশী ক'রে জমে উঠলো। ইন্টেলেক্চুয়াল এবং মধ্যপ—দুই ব্যক্তি একসাথে হোল। সেদিন সত্যপ্রিয়দার চলায় বলায় হাসির আওয়াজে যেন জয়ের নিশান দাওয়ায় উড়তো।

আর আজ তিনি ক্লান্ত, একটু হেসে নিজের ডানহাতটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, বল্লেন,—"তুমি তো একসময়ে রিহার্সেলের ঘরে সকলের হাত দেখতে,—জ্যোতিষ।—তখন দেখ্‌তে দিইনি, আজ দ্যাখ।"

তাঁর সেই কালিমেড়ে দেওয়া ফর্সা তেলচুকচুকে হাসির দিকে তাকিয়ে আমার মনের সমস্ত অভিমান যেন বরফের শোকেস সামনে শিশুর কান্নার মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপনি কি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন আজকাল?

তিনি বল্লেন,—"করি বৈকি। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো যা কিছু করবার ছিল সবত্ত করেছি, ক'রে চাঁদ বেণের মতোই হেরে গেছি। তাই আজ চ্যাংমুড়ি কাণিকেই বিশ্বাস করি।—অন্ধকার একটা বড়ো সত্যি জিনিষ ভাই। ইস্কুলে পড়েছ তো, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল? মানুষের অস্তিত্বেও তেমনি, তিনভাগ অন্ধকার একভাগ আলো। কিংবা হয়তো তারও কম।"

আমি কথা পাল্টাতে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপনি আজকাল কোথায় আছেন?"

তিনি আবার একটু হাসলেন, বল্লেন,—"বাড়ীর ঠিকানা আমি অনেকদিন হোল কাউকে দিই না। তোমাকে বলছি, আশা করি তুমি কাউকে বলবে না।—থাকি ক্যানিং লাইনে একটা গ্রামে। স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে।"

—*"এখানে এই ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারদের পাড়ায় এসেছিলেন কেন?"*

—"ওরা মাঝে মধ্যে আমাকে দিয়ে সিনারিও ঠিক করিয়ে নেয়, সংলাপ লিখিয়ে নেয়। না, নাম দেয় না। অল্প কিছু টাকা দেয়। কখনো দেড়শো কখনো দুশো।"

—"এই টাকাতে আপনি করেন?"

—"করি। খালি তাই নয়, এইটুকু কাজ পাবার জন্যে আবার তোষামুদিও করি।"

সত্যপ্রিয়দা কারুর তোষামুদি করছেন এ ছবিটা আমি চেষ্টা করেও কল্পনা করতে পারলাম না।

কিন্তু তিনি মাথা নেড়ে বল্লেন,—"করি। নইলে আমাকে না দিয়ে তো আর যে কাউকে ইচ্ছে কাজটা দিতে পারে। আমার মতো উদ্বাস্তুর লোক তো কেবল আমি একাই নই।"

চা আসে, টোস্টও।

সত্যপ্রিয়দা বল্লেন,—"চা খেয়ে নিয়ে আমার হাতটা একবার দেখে দিয়ো তো।—কবে ভালো

হবে তা জানতে চাইছি না, কবে একেবারে মন্দ হবে সেটা খালি ব'লে দিও। এই যে দেড়মাস দুমাস অন্তর দেড়শো দুশো টাকা রোজগার হয় এইটাও কবে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বলতে পারো? তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হই।—বুঝতে পারলে না? যেদিন সত্যি বন্ধ হবে আমি তো ঠিক সেইদিনই বুঝতে পারবো না, তারপরেও দুমাস, তিনমাস, হয়তো চারমাস ধরে ঘোরাঘুরি করবো, আর আশা করবো যে এইবার আসবে কিছু টাকা। এই কষ্টটা থেকে অন্তত: তুমি আমাকে রেহাই দিতে পারো। স্বাধনা, যদি সেইটুকুই পারো।"

আমার কি যেন হয়, হঠাৎ জোর দিয়ে ব'লে উঠি—"না, এরকম চলতে পারে না।—আপনি আবার আসুন। আমি আবার লোকজন জড়ো করবো। আবার আমরা নতুন ক'রে নাটক করবো, নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আবার আপনাকে কাজে নামতেই হবে।"

সত্যপ্রিয়দা মাথা নাড়েন, বলেন—"না। আর তা হয় না।" আমি অনুনয় ক'রে বল্লাম,—"কেন হবে না? বলছি তো আমি ছেলেমেয়ে যোগাড় করবো, যারা এখনো স্বপ্ন দেখতে পারে, যারা এখনো আদর্শের জন্যে ত্যাগ করতে পারে, সেইরকম অল্পবয়সীদের আমি যোগাড় ক'রে আনবো।"

সত্যপ্রিয়দা বল্লেন,—"তাতে কী হবে? দু'একবছর পরে তো আর তারা অল্পবয়সী থাকবে না। তখন? যাদের নিয়ে সুরু করেছিলাম তারা আজ কোথায়? কেউ ব্যবসা দেখছে, কেউ অফিসার হয়েছে, কেউ ফিল্মে গেছে, আর যারা কোনরকম সুবিধে ক'রে উঠতে পারেনি তারা আজও প্রতিষ্ঠার লোভে থিয়েটারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিষমুখে সকলের কুৎসা ক'রে বেড়াচ্ছে।—তাদের পরে আবার যারা নতুন এলো তারাই বা কী করলে?—যাক্‌গে।···তুমি কি এখনও নাটক করছো? কোন দলে আছো?"

বল্লাম,—"না। জীবনে আমি একটাই দলে ছিলাম। এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।"

সত্যপ্রিয়দা হাসলেন, বল্লেন,—"সতীত্বের গৌরব?"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"শেষদিনটায় তুমি ছিলে?"

—"ছিলাম। আমি পৃথ্বীশ আর দীপক সবচেয়ে আগে এসেছিলাম। এসে দেখলাম আপনি লাইব্রেরীর বইগুলোর ওপর হাত বোলাচ্ছেন, আমরা তাই আপনাকে জানান না দিয়ে বারান্দার কোণের দিকে চ'লে গেলাম।"

—"জানো, অনেকের অনেক রক্ত জল ক'রে কেনা হয়েছিল বইগুলো। তাই ছেড়ে ছেড়ে দেখছিলাম।—কিন্তু মনে আছে? অমরেশ পরে ইঙ্গিত করলে যে আমি তাড়াতাড়ি এসে কিছু বই সরিয়েছি?"

—"তার শাস্তি অমরেশকে সেইদিনই পেতে হয়েছিল। সেই রাত্তিরেই।"

—"হাঁ, তোমরা কয়েকজনে নাকি তাকে মেরেছিলে। কিন্তু কেন মারতে গেলে। অমরেশটা বোকা ছিল।"

—"কিন্তু খগেনকে পেলেও সেদিন আমরা ছাড়তাম না। সেই ভয়েই সে গা ঢাকা দিয়েছিল।"

—"খগেন এখন কী করছে?"

"—নানান অপিস ক্লাবে যে কোনও নাটকের ঠিকে-ডাইরেকশন নিয়ে বেড়ায়। তার জন্যে পয়সা পায়। তারওপর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।"

—"সুশান্ত, প্রদীপ, এরা কী করে?"

"সুশান্ত একটা দল করেছে। প্রদীপ আর একটা দল করেছে।—কিন্তু এদের কথা ছেড়ে দিন আপনি। এরা দল করেছে দলাদলির জন্যে। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে পরস্পরের নামে কুৎসা করা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনার নামে প্রত্যহ একটা কুৎসিত কথা না বলতে পারলে এদের পেটের ভাত হজম হোত না। কিন্তু আপনি তো একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাই এখন নিজেদের মধ্যেই সব গালাগালির লক্ষ্যটা থেকে যাচ্ছে। যাকগে, যাকগে, এরা অত্যন্ত তুচ্ছ লোক।—আপনি আবার ফিরে আসুন, সত্যদা, আমরা আবার কাজে লাগি। সেইসব দিনগুলোর কথা মনে হ'লে ভেতরটায় যে কী হয় সে তো আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আচ্ছা, তখন তো আমরা কোনওদিন কোনও ছোটকথা ভাবিনি। আপনি বলতেন, নিজেকে সম্মান করতে পারলেই এ অসম্মান থাকে, সেটা অপরের দেওয়া না-দেওয়ার ওপর নির্ভর করে না। আপনি বলতেন, দেশের সাধারণ লোক নেভাপ্রদীপের মতো মন নিয়ে উন্মুখ হয়ে ব'সে আছে যে কবে আমরা সেই প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দেব, সেইদিনই দেশে দেয়ালির রাত আসবে।—সেই বড়ো কথাটা তো আজও আমাদের বলা হোল না সত্যদা, কেউ যে বলবে এমন লোক নেই। আপনি ফিরে আসুন। আমাদের জন্যে, দেশের জন্যে, আবার একটা কিছু করুন।"

কিন্তু সত্যদা চুপ ক'রে থাকেন, তারপর নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, "নাঃ। আমার সে শক্তি নেই ভাই, আমার দ্বারা হোল না। প্রথম যখন সুরু করেছিলাম তখন দেশ পরাধীন। আমরা সবাই তখন এক, কারণ শত্রু তখন বিদেশী ইংরেজ। তারপর স্বাধীন হলাম। সামনে থেকে বিদেশী শত্রু হ'টে গেল, আর আমাদেরও মতো সুশ্রী ঝগড়া বেরিয়ে পড়লো। যারা অভিনয় করবে তাদেরও, যারা দেখবে তাদেরও। তবুও করেছি। না খেয়ে না প'রে করেছি। কই, দেশের লোক তো একটা থিয়েটার দিলে না আমাদের। তারা ফ্যাশান ক'রে আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে। আর হাততালি দিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের পুরাণো অভ্যস্ত জীবন যাপন করেছে। তাই, যারা অভিনয় নিয়ে ব্যবসা করেছে তাদেরই রোজগার বেড়ে গেছে, এই লোকেরাই যে সেখানে ঝাঁক বেঁধে গিয়ে পয়সা দিয়ে এসেছে, তবেই না বেড়েছে!—ছেলেটা মারা গেল, সে কথা তো জানো। আজ ভাবি ভালো হয়েছিল, নইলে আরও কষ্ট পেত। অরুণাংশু তখন সকলকে তাতাচ্ছে যে, স্যাক্রিফাইস ক'রে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, শিল্পী হওয়া যায় না।—খগেন তখন সেই যে নতুন মেয়েটি এসেছিল—গীতা—যার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল—, তার সঙ্গে জোর ক'রে প্রেম করবার চেষ্টা করছে। দল বেঁধে মদ খাচ্ছে তারা, ঐ বাচ্চা ছেলে অমরেশকেও ভিড়িয়েছে সেই দলে। যে যেদিন ইচ্ছে আসছে, যেদিন ইচ্ছে কামাই করছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে ব্যক্তিগত কাজ ছিল। অদ্ভুত। আমি তখনো ভাবছি নতুন নাটকের কথা। নতুন ধরণের।—বাড়ীতে নীলিমা ছেলের শোকে পাগল।

। একশোসাত ।

আমাকেই দোষ দেয়। বলে, আমার মহত্ত্বের সাধনার দাম দেয় আমার ছেলে। অংশ হয়, পরের বাড়ীতে গিয়ে চুরি ক'রে খায়, তারপর ম'রে যায়।—বলতে প'রো ভাই, কার জন্তে করেছি এ পাগলামি? তারা তো অন্ততঃ আবার তৈরী জিনিষটাকে কোথাও রাখবে আদর ক'রে? নতুন কর্ম তো এনেছিলাম একটা, সেইট'ই একটা স্থান ক'রে দাও কেউ, যাতে তার বৃদ্ধি হয়, প্রসার হয়!—আসলে কী জানো? ইতিহাস বলো, ভবিষ্যৎ বলো, যা জনসাধারণ বলো, ক'রের ওপর কোনও ভরসা করাই ভুল। যা করবে তা নিজের দায় মনে করেই কোরো, কারোর ওপর ভরসা ক'রে কোরো না। ছোটবেলায় ঐ যে ধারণা, ভালো কাজ করলে মানুষ পুরস্কার পায়, পুণ্যের জয় হয়,—এ একেবারে ভুল। তোমার পোড়ো জমির সামনে দিয়ে যদি চওড়া রাস্তা বের হয় ত'হলেই তোমার জমির দর বেড়ে যাবে, আবাদ করো আর নাই করো।"

হঠাৎ আমার মনে হোল তেলচিটে ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে যেন বিরাট একটা ভাঙা পিরামিডের মতো ব'সে আছেন তিনি। সারা মুখে কতো দারিদ্র্যের ভৌল আর রেখা। চোখ দুটো খোলা। চল্‌-নামা গঙ্গার মতো'ই গভীর কিন্তু তেমনি অস্বচ্ছ, ভিতরে যে কতো কী হচ্ছে তা কিছু বোঝা যায় না। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা শুনতে শুনতে আমার যেন কেমন আচ্ছন্ন লাগছিল, জোর ক'রে সেটাকে কাটাবার জন্তে সোজা হয়ে বসি, আবার চায়ের অর্ডার দিই। কিন্তু সত্যপ্রিয়দা নড়েন না, কোথাও যে কিছু নড়ছে জীবনে তাও যেন ও'র গোচর নয়।

আমি ওঁকে বলি,—"আমাদের দলে যদি অরুণাংশু খগেনের মতো লোক না থাকতো তাহলেই আমরা ঠিক থাকতাম। ওদের মতো লোক যেখানে যাবে সেই জায়গাটাকেই ভাঙবে।"

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে আগের মতোই মৃদুস্বরে বল্লেন,—"না। এ জাতের মোটের মাথায় standard breed হচ্ছে এইরকম। এই চোদ্দ পনেরো বছর ধ'রে কতো ছেলে এলো, গেল, সব এই। সমাজেই মনদণ্ডের গোলমাল হয়ে গেছে। সেইজন্তেই আমার কথা শুনতে শুনতে ওদের রাগ হোত। অথচ একদিন ঐ অরুণাংশু, ঐ খগেন, আদর্শবাদীর উজ্জ্বল চোখ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার কথা শুনে ওদের ভিতরটা যেন দপ্‌দপ্‌ করতো। তারপর আস্তে আস্তে ওদের চোখের জ্যোতি ক'মে এলো। যে সাফল্যের আশা করেছিল সে যখন এলো না,—টাকা এলো না, ফিল্মের মতো পাব্‌লিসিটি এলো না, সুন্দরী নারী এলো না প্রেমজ্ঞাপন করতে,—তখন ওদের রাগ হোল আমি যেন ঠকিয়ে এনেছি। কারণ আমার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, আর লোকমুখে তো আমার প্রতিষ্ঠা।—তাই যখন হঠাৎ ছেলেমেয়েদের মেলামেশা'র কথা জানতে পারলাম, বাধা দিতে গেলাম, ফল উল্টো হোল। আমার সামনে ওদের একটা সঙ্কোচের বাধা ছিল সেটা উবে গেল। ওরা বল্লে, যে-তাড়না প্রাকৃতিক তাকে দমন করা যায় না। আমি বল্লাম—তাকে চালনা করা যায়, সাবলিমেট করা যায়। ওরা বল্লে,—আগে পেট ভ'রে খাই, তারপরে কৃচ্ছ্রসাধনের কথা ভাবা যাবে। বল্লে,—আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণের মতোই বাঁচতে চাই। খিদে পেলে খাবো, আর না খেতে পেলে চুরি করবো। তবেই আমরা সাধারণ লোককে আনন্দও দিতে

শিখবো। ঐসব দার্শনিক নাটকে সামাজিক দায়িত্বপালন ক'রে নয়। সেন্টিমেন্ট দিয়ে, ঢং দিয়ে, ভেল্কি দিয়ে,—সাধারণ মানুষের মনোমত সাধারণ হয়ে।

'ভয়ে আমার হাত পা যেন কাঁপতে লাগলো, বল্লাম—তাহ'লে এতদিন আমরা যা ভেবে এসেছি সব ভুল? বীর থাকবেনা কেউ, কেউ লড়াই করবে না, মহৎ হবে না?

'ওরা তিক্তভাবে হেসে বল্লে—মাফ করবেন, চারদিকে যাদের দেখা যায় তারা কেউ বীর নয়, বীরত্ব দেখতেও চায় না। তাই নায়কের চেয়ে এখন নায়িকার টান বেশী। সোজা লাইনের চেয়ে কার্ভএর দাম বেশী।

'এসব কথা তোমরা কেউ জানো না। তোমরা খালি জানো যে মিসেস ঘোষকে আমি বকেছিলাম ব'লে খগেনরা কমিটি মিটিঙে আমায় মাপ চাইতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি, তাই আমাকে সাস্পেণ্ড করার প্রস্তাব এনে সেটা পাশ করালো। তাই না? কিন্তু এসব অনেক পরে, তার আগে—ওঃ!—কিন্তু কেনই বা তোমাকে এ সমস্ত বলছি। থাকগে।"

আমি বল্লাম,—"না বলুন, আমার শোনার দরকার আছে।"

—"কী দরকার?"

সে কথার জবাব না দিয়ে আমি আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বল্লাম,—"আছে দরকার। আপনি বলুন।"

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ সোজা প্রশ্ন ক'রে বসলেন,—"অরুণাংশু এখন কোথায় জানো?"

আমি যেন এই প্রশ্নটারই অপেক্ষা করছিলাম গোড়া থেকে। অন্যদিকে তাকিয়ে বল্লাম,—"এখন কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। সাঠে অ্যাণ্ড মাচওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজার। থিয়েটার রোডে থাকে।

তিনি একটু হেসে বল্লেন,—"থিয়েটারের সঙ্গে বুঝি ঐটুকু সংযোগই রেখেছে?"

আমার হাসি এলো না, কারণ আমি সত্যপ্রিয় চৌধুরীর মতো মহৎ নয়। রাগে আমার চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে, তবু সংযত থাকবার চেষ্টা ক'রে বল্লাম,—"বছর দেড়েক আগে সে ফিরেছে। ঠিকানা যোগাড় ক'রে আমি একদিন গিয়েছিলাম তার বাড়ীতে। বেয়ারাকে দিয়ে ব'লে পাঠালে এখন ব্যস্ত আছি, আপিসে দেখা করতে বোলো। আমি একটা কাগজে লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে আবার পাঠালাম যে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার আমার আদৌ কোনও ইচ্ছে নেই, আমি শুধু নীলিমা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। কিন্তু দেখা করতে দিলে না। বেয়ারা এসে বল্লে, যে, এ বাড়ীতে ও নামের কেউ থাকে না। আমি আর পারলাম না, সিঁড়ির কাছটায় গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম—নীলিমা বৌদি, আমি মুকুলেশ এসেছি। আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, আপনাকে তার জবাব দিতেই হবে। নীলিমা বৌদি বেরিয়ে আসুন, আমাকে বলুন আপনি কী ক'রে এ কাজ করতে পারলেন—! ততক্ষণে ওপরে অরুণাংশু বেরিয়ে এসেছে, রেলিং ধ'রে চীৎকার ক'রে বেয়ারাকে ডেকে বল্লে আমায় তাড়িয়ে দিতে। আমারও তখন মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেছে। আমি

অরুণাংশুকে গালাগাল দিয়ে বল্লাম যে সে আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছে, আপনার সঙ্গে বেইমানী করেছে— । কিন্তু বেশী বলা গেল না, চাকরে, দারোয়ানে মিলে আমাকে মেরে গেটের বাইরে বার ক'রে দিলে। দু'একটা রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে প'ড়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, আমি ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে চ'লে এলাম।"

খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। তারপরে সত্যপ্রিয়দা আস্তে আস্তে বল্লেন,— "নীলিমাকে তোমরা অমন ক'রে বিচার কোরো না। ওর যা কিছু অনিষ্ট সব আমি করেছি, ও আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিল।"

আমি বিশ্বাস করি না কথাটা, তবু চুপ করেই থাকি। তিনি আবার বল্লেন,—"সত্যিই ও আমাকে ভালোবেসেছিল। আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার সাথী হ'তে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ: দেখা গেল যে, ও একেবারেই অভিনয় করতে পারে না। ও কী করবে? ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়লো।"

আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না যে,—"অভিনয় ছাড়াও তো কতো কাজ থাকে। উনি পোষাকের ভার নিতে পারতেন, প্রম্পট্ করতে পারতেন,—মাঝে মাঝে তা করেওছেন শুনেছি, সেটা কেন বন্ধ করলেন?"

সত্যপ্রিয়দা বল্লেন—"কিন্তু সেটা তো ওর ক্ষমতার উপযুক্ত কাজ হোলো না। সারাদিনের মধ্যে ওর তো আরও কাজ থাকা চাই, যে-কাজ ওর বুদ্ধির যোগ্য।—তাই ও চাকরি নিল। সেল্‌স্ অর্গ্যানাইজ করার কাজ। কিন্তু ওর সে কাজ সম্বন্ধে আমার তো বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আমি আমার কাজেই মশগুল থাকতাম। কিন্তু নীলিমা তো চেয়েছিল যে আমার কাছে তার মূল্য হবে, খালি টাকা রোজগার করেই তো সাথী হওয়া যায় না। অথচ আমি তার এই নির্ভরতা বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হোত আমরা দুজন স্বাধীন সম্পূর্ণ লোক, স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছি। ফলে, তার কাজ সম্পর্কে আমার ঔদাসীন্যটা নীলিমার মনে হ'তে লাগল তারই সম্পর্কে আমার ঔদাসীন্য। ও কল্পনা করতে লাগল আমি আর কোথাও প্রেমে পড়েছি।—ওর সেই অসুস্থতা দেখে সত্যিই আমার মন ক্রমশ: বিরূপ হয়ে যাচ্ছিল। কাজ আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। এমন সময়ে ছেলে হবার সময় হোল। ও চাকুরি ছেড়ে দিল। আমিও ওর শরীরের দিকে নজর দিলাম, আমাদের সব ঝগড়া মিটে গেল। আরো মিটে গেল ছেলে হবার পর। ও যেন ঠিক কাজটা পেল, যাতে আমাদের দুজনেরই উৎসাহ। ও ঠিক করলো ও ঘরকন্নার কাজই করবে, ছেলেমানুষ করবে।—কিন্তু আমার রোজগার ক্রমশই কমতে লাগ্‌ল। আর ততোই নীলিমা ক্ষেপে উঠতে লাগ্‌ল। কিন্তু কিছুতেই আমাকে নাটকের কাজ ছাড়াতে পারলো না, ফলে রোজগারও কিছু বাড়লো না। ঝগড়া একবার খুব কমেই গেল। তখন একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে শুনলাম আমার পাঁচবছরের ছেলে দুপুর বেলায় পাশের বাড়ীর আল-আলমারি থেকে চুরি ক'রে তরকারি খাচ্ছিল, ধরা প'ড়ে গেছে।—দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। সেই নীরবতার মধ্যে নীলিমার কঠিন দৃষ্টি যেন চীৎকার ক'রে আমাকে দায়ী করতে থাকলো। কিন্তু আমার মনে প্রায় আজীবনের আগে ইব্‌সেনের

-তোলা একটা প্রশ্ন বার বার ঘা দিতে লাগ্‌লো—ছেলেমেয়ে আছে ব'লে কি মানুষ ভালো কাজ করতে পারবে না, সত্যের জন্যে দাঁড়াতে পারবে না ?—তারই মাসকয়েক পরে ছেলেটা মারা গেল।''

আমি প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম,—''এই রকম হয়েছিল নাকি ?—তার পর ?''

সত্যপ্রিয়দা চোখ দুটো ছোট ক'রে গগনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন কষ্ট ক'রে কী দেখবার চেষ্টা করছেন। বল্লেন,—"তারপর ? ভাবো নীলিমা'র কী রইল। আমার সাথীত্ব পেল না, সংসার পেল না, ছেলে রইল না। আমার মতো হা'ঘরের ঘরে ও কী দিয়ে পূর্ণতা আনবে। কখনো কুৎসিত বিরাক্ত কথা ব'লে ঝগড়া করে, আবার কখনো আমাকেই আঁকড়ে ধ'রে কাঁদে। আমি দিনের পর দিন দেখেছি। কিছু করতে পারিনি। তার কাছেও থাকতে পারিনি বেশীক্ষণ, রোজগারের জন্যে যেতে হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় রিহার্সেলে যেতে হয়েছে। কাউকে বুঝতে দিইনি আমা'র দিন কী ক'রে কাটছে। আর একলা বাড়ীর মধ্যে নীলিমা একটু একটু করে অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কতো কষ্ট ক'রে তখন সেই নাটকটা আমরা তৈরী করলাম—'ক্রান্তিপুর'—, কতো বিশিষ্ট লোকের কাছে কতো প্রশংসা হোল, কিন্তু লোকে দেখতে এলো না। কী জানি কেন ! হয়তো সাধারণ দর্শকের মন বদলাচ্ছে। তাই জোর ক'রে অভিনয়টা চালাতে গিয়ে অনেক ধার হয়ে পড়লো। অতো'গুলো বৎসরের পরিশ্রমের পর দলের হাতে কোনও টাকা পয়সা রইল না; শুধু ধার রইল।—তখনই ঐ মদ খাওয়া, ঐ মেয়েদের নিয়ে—ব্যাপারগুলো ঘটলো।—ওরা বন্ধুদের মধ্যে উদ্ধতভাবে আমার সঙ্গে কথা বল্লে, ওরা সবাই যে আমার চেয়েও কতো বেশী আত্মত্যাগ করেছে সেইসব কথা—। আমি কিন্তু কখনো বলিনি যে আত্মত্যাগের যৌতুকী-পাট্টা কেবল আ'মার। বলতে পারলাম না। কিছুই বলতে পারলাম না। বাড়ী ফেরার পথে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, নিশ্চয়ই আ'মা'র কোথা'ও পা'প হয়েছে, নইলে আমারই হাতে গড়া ছেলেরা এমন কথা আমাকে বল্ল কী ক'রে। আমারই পাপ, নিশ্চয় আমা'রই পাপ।—সেদিন বড়ো কষ্ট হচ্ছিল। এরকম কখনো হয়েছে তোমার, যে, চোখ শুক্‌নো থাকে, অথচ থেকে থেকে কী রকম একটা জন্তুর মতো অস্বা'ভাবিক আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে গলা থেকে ?—ভগবান করুন, যেন না হয়।''

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লা'গলেন,—"বা'ড়ী ফিরতে অনেক রাত হোল। নীলিমা কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা করলো,—'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে ?'—আমি কোনও জবাব দিলা'ম না। ও আবার বললো,—'আমার সম্পর্কে কী ঠিক করেছ ? আমি কী করবো ?' আমি বল্লাম,—'তুমি ঠিক ক'রে নাও তুমি কী করতে চাও।' নীলিমা বললো,—'একটা স্ত্রী তার স্বামীর কাছে যা ন্যায্যভাবে চাইতে পারে তার চেয়ে বেশী তো কিছু চাচ্ছি না। আমি একটা সংসা'র চাই, ছেলেপুলে চা'ই, তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চাই। এটা চাই না যে আরএকজনের মহত্বের সিঁড়ি হবার জন্যে তারা ম'রে যাক। আমার স্বামীর অবহেলা চাই না। আমার একটা ভবিষ্যৎ চাই, তার জন্যে আমার— ।' আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—'এতো-দিনে তো বুঝতেই পেরেছ যে আমি একেবারে অক্ষম, একেবারে অপদার্থ, তাহ'লে আর কেন আমাকে এ সমস্ত কথা বলছো। আমার স্বাচ্ছন্দ্য দেবার ক্ষমতা নেই, ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা নেই, স্ত্রীর ভবিষ্যৎ বাঁধিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। আমি লো'কটা ঐটুকুই, আমি নপুংসক, আমি হিজ্‌ড়ে, আমি

। একশোএগার ।

পাপী, আমি স্বার্থপর, আমি শঠ, আমি শঠ। দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে চ'লে যাও। আমার ওপর ভরসা ক'রে তোমরা সবাই নিজেদের সর্বনাশ আর কোরো না। দোহাই তোমাদের, তোমরা যাও, চ'লে যাও।' তারপরেও দিন কাটলো। কী ক'রে কাটলো তা আর এখন বলা অসম্ভব। কিন্তু কিছুদিন কাটলো। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে চারপাশ থেকে কী একটা ঘনিয়ে উঠছে। কিন্তু আমিও তখন শেয়ালের মতো সতর্ক হয়ে গেছি। রিহার্সেলে খুব সাবধানে ব্যবহার করি, বাড়ীতেও। আমার আসল আমিটা যেন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কান খাড়া ক'রে আছে, একটু বাঁচবার পথ পেলেই যেন সেদিকে দৌড় দেবে। কিন্তু ওরা ঠিক আচমকা ধ'রে ফেললে। রাণী ঘোষ চোখ রাঙিয়ে এসে জানতে চাইল যে খবরের কাগজে ওর নাম অতো ছোট কেন। কথাবার ধরণে আমার অপমানবোধ হোল, তাই গলাটা খুব আস্তে ক'রে বল্লাম—বিজ্ঞাপন আমি পাঠাইনা, মুকুলেশরা পাঠায়, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। রাণী ঘোষ বলে গেল—তবু জবাবটা আপনারই দেওয়া উচিত ছিল, কারণ ওরা তো সব আপনারই ফলোয়ার, মন্ত্রী তো আপনি।—তারপর রিহার্সেলের সময়ে খুবই হেলাফেলা ক'রে পার্ট বলছিল, আমি বলে ফেল্লাম—যদি তোমার রিহার্সেল দেবার ইচ্ছে না থাকে দিয়ো না, কিন্তু দিতে উঠে এরকম করাটা যে এদলে চলে না সে কথা তোমার জানা নেই?—ব্যস্। রাণী কেঁদে কেটে কী করলো সে তো সবাই জানো। আমি নাকি তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি। দলের প্রতি অনুরক্তি আমার চেয়ে তার একতিলও কম নয়। এবং কমিটির লোকেরা এর প্রতিকার না করলে সে আর এ দলে থাকবে না ইত্যাদি।—পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হোল, সামান্য জ্বরের মতো হয়েছিল। নীলিমা আমাকে চা দিতে এলো বাইরে যাবার পোষাকে। বল্লে—তোমার এমনি ডালভাত রেঁধে রেখেছি, কালকের তরকারিটাও আছে। যদি আরও কিছু ইচ্ছে হয় রেঁধে নিও। আমি চল্লাম।

'আমি হতবুদ্ধির মতো বল্লাম—কোথায়?

'নীলিমা বল্লে—সেকথা তোমাকে বলবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না, কারণ সেটা তোমার কোনও আগ্রহের বস্তুই নয়। খালি এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে আমি অসতী হয়েছি, আর সেইজন্যেই চ'লে যাচ্ছি।

'আমি উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধ'রে ফেলে বল্লাম—নীলিমা, কী বলছো তুমি?

'ও বল্লে—হাত ছাড়ো।

'আমি বল্লাম—না। তোমাকে আমি যেতে দেব না। তোমার মাথার ঠিক নেই, তুমি সুস্থ হও, তারপরে যা ইচ্ছে হয় কোরো।

'নীলিমা টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলে, বল্লে—সুস্থ মানে? তোমার মনোমত হওয়া? তুমি যেটাকে ভালো মনে করো সেইটেই সবচেয়ে ভালো, সকলের পক্ষেই ভালো, তাই না? আশ্চর্য আত্মম্ভরিতা তোমার!

'কঠিন বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলো নীলিমা, বল্লে—তুমিই একমাত্র মানুষ, না? তোমার মত্ই একমাত্র মত, না? কিন্তু আর আমি তোমার বৌ না। আমি অসতী। অসতী হয়ে আমি তোমার হস্ত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এখন থেকে আমার নিজের ভালোমন্দ আমি নিজে বুঝবো।

'আমি জিজ্ঞাসা করবো না মনে করেও না-জিজ্ঞাসা ক'রে পারলাম না,—কে, কে সে?

'নীলিমা বল্লে—অরুণাংশু।—হ্যাঁ। অ-রু-ণাং-শু।

'এমনই একটা সন্দেহ একদিন আমার মনে হয়েছিল। ছেলে মারা যাবার পর থেকেই অরুণাংশু একটু বেশী আসতো আমাদের বাড়ীটায়। আমার অবর্তমানেই আসতো। একদিন বিকেলে আমি এসে পড়াতে কী রকম যেন সন্ত্রস্তও হয়েছিল, তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে চ'লে গেল, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল যে আমিও রিহার্সেলে যাবো কিনা। কিন্তু নীলিমাকে আমি খুব লক্ষ্য করেও তো তার মুখে কোনও আনন্দের আভাস, বা গোপনতার চেষ্টা, কিছুই তো দেখতে পাইনি। তাই আর সে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিইনি। আজ সেইটাই হঠাৎ বাজের মতো আচমকা আমারই মাথায় পড়লো।—হয়তো খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে দরজা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বল্লাম—আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি ভুল করছো। অরুণাংশুর এরকম করা স্বভাব। সে কখনো—

'নীলিমা বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো—অরুণাংশুর সম্বন্ধে তুমি কোনও কথা না বল্লেই তোমার মর্য্যাদা থাকতো—

'আমিও তেমনি ক'রে বল্লাম—বলবো না। আমি কারোর সম্পর্কে কোনও কথা বলবো না। কিন্তু তুমি এই পাগলামি কোরো না, এটা পাগলামি—

'নীলিমা প্রায় চীৎকার ক'রে বল্লে—আমি অসতী,—অসতী। আমার সঙ্গে তুমি বাস করবে কী ক'রে—

'আমি বল্লাম—না। একদিনের একটা ঘটনায় কেউ খারাপ হয়ে যায় না। তুমি থাকো, তোমাকে আমি যেতে দেব না—

'বল্তে বল্তে আমি তাকে টেনে বিছানার কাছে নিয়ে এলাম। বল্লাম—একদিন তো তোমাতে আমাতে যে সম্পর্ক ছিল সেটা পবিত্র ছিল, সেটা পুণ্যের ছিল—

'নীলিমা যেন কী এক অন্ধ আক্রোশে হিংস্র হয়ে উঠে আমার বুকের কাছের গেঞ্জিটা টেনে ধ'রে বল্লে—বুঝতে পারো না কেন? আমি সেটাকে নোংরা করেছি। তোমার এই বিছানায় আমি অন্য লোকের সঙ্গে শুয়েছি। শুয়ে তোমাকে ঠাট্টা করেছি। নোংরা করেছি, বুঝতে পারছো; সমস্ত অতীতটাকে নোংরা করেছি। থাকবে? থাকবে এখনো আমাকে নিয়ে? পারবে?—

'আমি দুহাত দিয়ে মাথাটাকে ঢেকে ব'সে রইলাম, যেন আমার মাথায় কেউ মেরেছে। কখন যে নীলিমা চ'লে গেল জানতেও পারিনি।······একগ্লাস জল আনতে বলতো মুকুলেশ।"

। একশোতেরো ।

আমি যে চেঁচিয়ে জল আনতে বলবো সে ক্ষমতা ছিল না। ভয় হচ্ছিল যে একটু জোরে কথা বলতে গেলেই হয়তো গলা ভেঙে যাবে। তাই উঠে গিয়ে ছোট্ট রান্নাঘরটা থেকে জল চেয়ে নিজের হাতে নিয়ে এলাম। পুরোনো পাথরের টেবিলের ওপর চায়ের দাগ লেগে আছে, মাছি উড়ছে, আমি গ্লাসটা রাখলাম। সত্যপ্রিয়দা সমস্ত জলটাই ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেল্লেন।

তারপর আবার বল্লেন,—"কমিটির মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। কিন্তু মেজরিটি বল্লে যে আমি দলটাকে নিজের জমিদারীর মতো ব্যবহার করি। আমার উচিত রাগী খোকার কাছে সকলের সামনে ক্ষমা চাওয়া। আমি বল্লাম যে আর আমি কোনও ব্যাপারে কোনরকম জোর খাটাতে যাবো না, কোনো পদেও আমি থাকতে চাই না, আস্তে আস্তে সেগুলোও অন্যেরা নিয়ে নিক, কিন্তু ক্ষমা চাইতে হ'লে আর আমি এখানে থাকতে পারবো না, কারণ আমি যে নিজের দোষ বুঝতে পারছিনা, দোষ বুঝলে—তোমরা জানো—আমি কখনো ক্ষমা চাইতে পরাঙ্মুখ হইনা। আমাকে এমনি সাধারণ সভ্য হিসেবে থাকতে দাও। আমি এখনো কাজ করতে পারি, আমাকে কাজ করতে দাও—। অনেকের হয়তো মন ভিজেছিল কিন্তু খগেন বল্লে—আমার মনে হয় সত্যপ্রিয়দা, আপনার এখন দল ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আপনার আইডিয়াগুলো পুরোনো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনার প্রোডাক্শন্ অব পপুলার হচ্ছে না। আমার মনে হয় আধুনিক নাট্য আন্দোলনে আপনার আর কিছু করবার নেই।

'হঠাৎ আমার মনে হোল যে খগেনরা ঠিক বলেছে। আমি কোনও কিছুই তো ঠিক ক'রে করতে পারলাম না। মানুষের ঘরের জীবন আর বাইরের জীবন—এই দুটো সুর তো কতো চেষ্টা করেও আমাদের অভিনয়ে একসঙ্গে আনতে পারলাম না। অথচ কী একটা মূল কারণে আমার দুটো জীবনই একসঙ্গে ভেঙে গেল।—যদি সেটা এতদিনেও বুঝতে পারতাম তাহলে আবার হয়তো নাটক করতে আসতাম।"

খুব জোরে নিশ্বাস টেনে সত্যপ্রিয়দা বল্লেন—"চলো, বেরিয়ে পড়া যাক, ভিতরটায় যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।"

দুজনে বেরিয়ে এলাম ফুটপাতে। হঠাৎ যেন সমস্ত শহরের গোলমালটা ভেঙে পড়লো আমাদের ওপর। বাইরের আলো যেন চোখে বিঁধতে লাগলো।

সত্যপ্রিয়দা আমার বাহুটা ধ'রে রাস্তার ভীড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বল্লেন—"এই হোল জীবন। এ কিছুই পবিত্র থাকতে দেয় না। ভালোর মধ্যে মন্দ, আর মন্দের মধ্যে ভালো, সব জড়াজড়ি ক'রে আছে। এখানে লখীন্দর যেমন আমাদের, সাপও তেমনি আদরের। এখানে বেহুলাকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে হয় স্বর্গের সভায় নাচ দেখিয়ে। উদ্দেশ্যের জোরে নয়, যুক্তির জোরে নয়,—লাস্যের অভিনয় ক'রে। খগেনরাই ঠিক, আমি ভুল।"

হাঁটতে থাকেন সত্যপ্রিয়দা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। একটু পরে জিজ্ঞাসা করি,—"আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে যাবো ?"

উনি যেন আপনমনে হাঁটছিলেন, এই কথায় হঠাৎ থেমে প'ড়ে বল্লেন—"না। সেখানে—সেখানে নীলিমা আছে। কোনও চেনা লোক দেখলে ওর ভালো লাগবে না।"

ব'লে উঠলাম—"বৌদি কি আপনার কাছে?"

সত্যপ্রিয়দা ফুটপাতের কিনারে গিয়ে দাঁড়ান রাস্তার দিকে মুখ ক'রে। তারপর বলেন—"হাঁ। অন্তঃসত্ত্বা হবার কিছুদিন পরেই ও আমার কাছে পালিয়ে আসে। বলে, এবারে যেন আমি ওর সন্তানটাকে বাঁচাই। খুব চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঁচলো না। সেই প্রসব হওয়ার সময়েই নীলিম'র পক্ষাঘাত হয়। এখন আমরা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।—তোমরা যারা অল্পবয়সী, যাদের এখনো আশা আছে, তারা বুঝতে পারবে না যে সমস্ত আশা ভরসা খুইয়ে যখন দুটো মানুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুর অপেক্ষায়, তখন তাদের ভালবাসা সে কী রকম ভালবাসা।—আচ্ছা আমি চল্লাম।"

একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লেন তিনি।

ফুটপাতের ওপর থেকে একটা কলেজের ছেলে ব'লে উঠলো:—"বাইরি কি অস্বাভাবিক লম্ফুরে।"

আমার হঠাৎ ধমক দেবার ইচ্ছে হোল যে, হ্যাঁ, আমাদের এই বেঁটেদের হাতে ওদের বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়, ওরাই অস্বাভাবিক। কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলাম।

প্যারিসের সেই রোগা মেয়েটি—

॥ হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ॥

মেয়েকে নিয়ে জুলি পড়েছেন মহা মুস্কিলে। একে ভীষণ রোগা, তায় আবার বাদশাহী মেজাজ—কখন যে রেগে যায় আর কখন যে উদাসী হয়ে ওঠে, তার কোন ঠিকানা নেই। জুলি হয়তো অনেক জোগাড়-যন্ত্র করে একটা ভোজসভায় মেয়ের পাণিপ্রার্থীদের নেমন্তন্ন করলেন; কিন্তু মেয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই গুম হয়ে এক কোণে বসে রয়েছে। কারুর সঙ্গে হেসে কথা বলা তো দূরে থাক, কেউ যুক্তি করে নিরিবিলি জায়গা দেখে কথা বলার চেষ্টা করলে মেয়ে তাকে চড় মেরে ঠাণ্ডা করে দেয় আর সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করলে তো হেসেই অস্থির—যেন কতো মজার কথা শুনেছে। বিত্তবান স্বামী জোগাড় করা যে মেয়েদের পক্ষে কী ভীষণ দরকারী এটা জুলি মেয়েকে কিছুতেই বোঝাতে পারেন না। ঐতো ছিরি—লম্বা-বাঁকা নাক, ক্যাকাসে চেহারা, জটপাকানো চুল। তার আবার সাতশ বায়নাক্কা—আধবুড়ো বর পছন্দ নয়, গায়ে বেশী লোম থাকলে চলবে না, কায়দার দাড়ি নেই কেন? জুলি যা বোঝেন তাতে টাকাই হোল পুরুষের আসল গুণ এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলাটা ঠিক নয়। কিন্তু কে বোঝাবে মেয়েকে? সে ঠিক করে বসে আছে যে ব্রহ্মচারিণী হবে।

মেয়ের এই খামখেয়ালী স্বভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে জুলি একদিন তাঁর হিতাকাঙ্খীদের নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠকে বসলেন। মেয়েরও ডাক পড়লো সেখানে। জুলির প্রশ্ন হলো, এ মেয়েকে নিয়ে কি করা যায়? এর উত্তরে প্রায় সবাই চুপ, কারণ তাদের প্রস্তাব মেয়ে আগেই নাকচ করে দিয়েছে। ড্যুক-ডি মোর্নি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন—'ওর অভিনেত্রী হওয়া উচিৎ।' প্রস্তাব শুনে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্। জুলি ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বললেন—'কিন্তু ওযে বেজায় রোগা।' মেয়ে এতক্ষণ বিরক্ত হয়ে নিরাসক্তভাবে বসেছিল। সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উদ্ধতভাবে জবাব দিলো—'র‍্যাচেলও রোগা ছিলেন।' সে নিজে যে কখনো অভিনেত্রী হওয়ার কথা ভেবেছে তা নয়, কিন্তু মায়ের কথার প্রতিবাদ তার মজ্জাগত। একটা আকস্মিক সংকল্পে তার দুটি উদাসীন চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠলো—সে প্রমাণ করে দেবে যে ইচ্ছে করলেই সে যে কোন কাজে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করতে পারে। ড্যুক্-ডি মোর্নি দেখলেন যে এই একটা ব্যাপারে অন্ততঃ মেয়েটি আগ্রহ দেখিয়েছে। তিনি তাই আবার বললেন—'ওর একটা শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া উচিৎ।'

বহু বছর পরে এই মেয়েটির সম্পর্কেই বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ম্যাক্স্ বিয়ারবোম্ লিখেছিলেন—'বছর বছর যখনই তাঁকে আমাদের মধ্যে পাই, তখনই তাঁর সম্পর্কে আমার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা

খেতে যায়। কয়েকদিন আগে তাঁকে 'La Borciere' নাটকে দেখে আমি সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হলাম। মনে হয়েছিলো—এই সেই বিখ্যাত অভিনেত্রী গত কয়েক দশক ধরে যিনি অনন্যা।.........আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম যে তাঁর প্রথম অভিনয়ের পর থেকে কতো নাটক লেখা হয়েছে, কতো অভিনেতা—অভিনেত্রী খ্যাতিলাভ করে আবার বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, কতো নাট্যশালা তৈরী হয়েছে আবার কতো বিলুপ্ত হয়েছে—কল্পনা করতে গিয়েও আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। অভিবাদনরতা ঐ মহিলার সঙ্গে বিগত চল্লিশ বছরের নাট্য-ইতিহাস জড়িত। মনে হলো, এখন যারা কবরের নীচে সেইরকম হাজার হাজার দর্শকের অভিনন্দন তাঁর চারিদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখনও তিনি ঠিক তেমনিই উজ্জ্বল চোখে নতুন অভিনন্দনকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। এমন সময় একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা যে হাতে তালি দিচ্ছি সেই হাত থেমে যাবে। আমরা যখন কবরের নীচে থাকব,—তখনও তিনি বোধহয় পাদপ্রদীপের পিছনে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনি কমনীয়ভাবে অভিবাদন জানাবেন সেইসব নবীন দর্শকদের, যারা এখনো জন্মায় নি।'

একটা আকস্মিক ঘটনায় নিতান্তই ঝোঁকের বশে যাঁর অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিলো, পরিণত বয়সে যিনি পেলেন এইরকম অকুণ্ঠ প্রশংসা সেই অনন্য প্রতিভাময়ী হলেন—সারা বার্ণহার্ড।

সারা বার্ণহার্ড—একটি নাম। এমন একটি নাম যা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ নাট্যরসিকদের মুখে মুখে ফিরেছে। বিভিন্ন মানসিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে এই নামের উচ্চারণে—ঈর্ষা, অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্য, আবার শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও বিস্ময়। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে খ্যাতি—ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার।

এই অসাধারণ প্রতিভাময়ী সারার জন্ম ছিলো অবাঞ্ছিত। জুলি ভ্যান্ হার্ড এবং এডোয়ার্ড বার্ণহার্ডের প্রণয়ের ফলে তার জন্ম। সৌভাগ্যবশতঃ 'বার্ণহার্ড' উপাধি ধারণের অধিকার এডোয়ার্ড মেয়েকে দিলেন, আর দিলেন তার শিক্ষাদীক্ষার জন্যে কিছু অর্থ। মেয়েকে দেখাশোনা করার সময় তাঁর ছিলো না, কারণ ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে সর্বদাই তিনি ব্যস্ত। আর জুলি মেয়েকে শৈশবেই পাঠিয়ে দিলেন ব্রিটানীতে এক ধাত্রীর হেফাজতে এবং পরে আবাসিক বিদ্যালয়ে। কেবল অর্থব্যয় করেই তিনি কর্তব্য সারলেন, কারণ তাঁরও তখন অনেক কাজ—প্যারিসের সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা চাই। কাজটা তাঁর পক্ষে শক্ত হলো না, কারণ তাঁর রূপ ছিলো এবং প্রেমের খেলায় তিনি ছিলেন দক্ষ। সমাজের থাক্‌ চড়াই বেয়ে তিনি উঠতে লাগলেন। শিল্পপতি এবং ব্যারণদের মধ্যে হাতবদল হ'তে হ'তে তিনি শেষপর্যন্ত গিয়ে পড়লেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সৎ-ভাই ড্যুক-ডি মোর্নির বাহুবন্ধনে। ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁকে জ্যাঁ এবং রেজিনার মা হতে হয়েছে।

★ ★ ★

শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে সারা বেশ খেটে পড়াশোনা করতে সুরু করলেন। যে সব চরিত্র তাঁর পক্ষে মানানসই, কেবল সেই সব চরিত্রের সংলাপ মুখস্থ করেই তিনি খুশী থাকতেন

না, গোটা নাটকই মুখস্ত করে ফেলতেন। কর্ণেই, রেসিন এবং মলেয়ার এর যাবতীয় নাটক পড়ে এবং কোন রকম বাছবিচার না করে হাজার হাজার লাইন সহজেই মুখস্ত করে ফেললেন। ১৮৬০ সালের অক্টোবর মাসে পরীক্ষার দিনটিতে ম্যাদাম গরার্ড সারাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রে। (ম্যাদাম গরার্ড সারাদের ওপরতলায় থাকতেন এবং পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে সারার সঙ্গিনী ছিলেন)। সারা ঠিক করেছিলেন যে তিনি মলেয়ারের একটা প্রহসনের থেকে একটা অঙ্ক অভিনয় করবেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার জন্যে কাউকেই বলা হয়নি। তখন একটাই উপায় ছিলো—যখন তাঁর নাম ডাকা হলো, সারা গট্‌গট্ করে গিয়ে উঠলেন মঞ্চে এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি লা ফন্টেনের 'Les Deux Pigeons' উপকথাটা আবৃত্তি করবেন। এতে মহামান্য বিচারকদের মধ্যে কেউ বা গেলেন ক্ষেপে, আবার কেউ বা পেলেন মজা। কিন্তু নির্দেশকের পাঠানো 'ডুাক-ডি-মোর্নি' লেখা চিরকুটটুকু সমস্ত চাঞ্চল্য স্তব্ধ করে দিল, ফলে আবৃত্তি ভালো হলো কি মন্দ হলো তাতে কিছু এসে গেলো না, সারার ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নেওয়া হলো।

এই কেন্দ্রে সারা দু'বছর ছিলেন। এখানে তিনি অভিনেয় চরিত্রকে বোঝা এবং সৃষ্টি করা, অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে মহড়া দেওয়া এবং দর্শকদের সামনে অভিনয় করা—এই সব গোড়ার কথাগুলো শিখলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি প্রথম বছর ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ—ব্যাচেলের পূর্বতন গুরুর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশনায় সারা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পেলেন। *পরের বছর বৃদ্ধ অধ্যক্ষ অবসর নিলেন এবং সেবার বাৎসরিক পরীক্ষায় সারাকে মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত* এই দু-ধরণের নাটকেই—বেমানান চরিত্রে অভিনয় করতে দেওয়া হলো। ফলতঃ সারার অভিনয় খারাপ হলো। বাড়ি ফিরতে ডুাক-ডি-মোর্নি বললেন—'দেখ, তুমি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছো। অভিনেত্রী হওয়ার জন্যে মিথ্যে জেদাজেদি করে আর কী লাভ? তুমি রোগা এবং বেঁটে, তোমার মুখটা কাছের থেকে বেশ দেখায় কিন্তু দূর থেকে দেখতে কুৎসিত লাগে, আর তোমার গলা তো শুনতেই পাওয়া যায় না।'

কিন্তু এ'সব সত্ত্বেও সারার মনে হলো যে তিনি তাঁর পথ পেয়ে গিয়েছেন—অভিনয় করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ডুাক্-ডি মোর্নি সারাকে আবার একটা সুযোগ করে দিলেন। চতুর্দশ লুই প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের জাতীয় নাট্যশালা 'কমেডি ফ্রাঁসে'র নির্দেশক এডোয়ার্ড থিয়েরীর সঙ্গে তিনি কথা বললেন। কিছুদিন পরেই সারাকে ঐ বিখ্যাত নাট্যশালার একজন 'Pensionnaire' বা মাইনে করা শিক্ষানবীশ অভিনেত্রী হিসেবে নেওয়া হলো। এর জন্যে শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রের সতীর্থদের কাছে তিনি হিংসার পাত্রী হয়ে উঠলেন কারণ সোজাসুজি 'কমেডি ফ্রাঁসে'তে ঢোকার মতো প্রতিভা এদের খুব কম জনেরই ছিলো—প্রায় সকলকেই প্রাদেশিক নাট্যশালায় অথবা বুলেভার্ড নাট্যশালা গুলোতে অনেক বছর ধরে অভিনয় করতে হ'তো।

সারার প্রথম অভিনয় করবার কথা হলো রেসিন-এর বিয়োগান্ত নাটক 'Iphigenie'তে। প্রথম-

মহলার দিন তিনি ঘণ্টাখানেক আগে গিয়ে হাজির হলেন। মঞ্চাধ্যক্ষ তাঁকে বিরাট মঞ্চটা দেখিয়ে দিলেন। হাঁ-ওয়ালা অন্ধকার প্রেক্ষা, তার নিস্তব্ধতা এবং শৈত্য—সব মিলিয়ে তাঁকে ভয় লাগিয়ে দিলো। পরে তিনি এসম্পর্কে বলেছিলেন—'একথা আমার কিছুতেই মনে হয়নি যে ঐ প্রেক্ষার সঙ্গে এই উজ্জ্বল মঞ্চটার কোন যোগাযোগ আছে—যে মঞ্চে জীবন্ত শিল্পীরা তাঁদের হাসি-কান্নার মন্ত্রে প্রতিরাত্রে অভিনন্দিত হয়েছেন। আমার মনে হয়েছিলো যেন আমি বিগত গৌরবের সমাধির মধ্যে রয়েছি এবং যে সব প্রতিভাধরদের নাম মঞ্চাধ্যক্ষ এই মাত্র করলেন তাঁদের প্রেতাত্মারা যেন মঞ্চের ওপর আমার চারিদিকে ভিড় করে আসছে।' Moliere, Adrienne Lecouvreur, Marie-Francoise Dumesnil, Mademoiselle Clairon, Lekain, Talma এবং অবশ্য Rachel—চারিদিকে এঁদের অশরীরী উপস্থিতি যেন সারাকে শক্তিপরীক্ষার মঞ্চে আহ্বান করছিলো।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে সারা প্রথম অভিনয় করলেন কমেডি ফ্রাঁসেতে। প্রচণ্ড মঞ্চভীতি সত্বেও তিনি একরকম করে অভিনয় করে গেলেন। পরদিন এক খবরের কাগজে সমালোচনা বেরুলো—'তাঁর গলাটা মিষ্টি এবং মুখটাও দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু তাঁর চেহারা কুৎসিত এবং মোটেই মনোজ্ঞ নয়।' Francisque Sarcey তখন ফ্রান্স্‌এর সবচেয়ে ডাকসাইটে নাট্যসমালোচক—তাঁর সমালোচনার এমন জোর ছিলো যে তিনি যে কোন শিল্পীকে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দিতে পারতেন। তিনি সারাকে অনেক বেশী সহানুভূতি দেখালেন—'মাদ্‌মোয়াজেল বার্নহার্ড একজন লম্বা, তন্বী যুবতী এবং তাঁর মুখমণ্ডল মনোজ্ঞ। তিনি মঞ্চে নিজেকে ধরে রাখতে পারেন এবং তাঁর উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। এক্ষুনি তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

সেকালে কমেডি ফ্রাঁসের নিয়ম ছিলো যে প্রত্যেক নতুন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে প্রথম দফায় পর পর তিনটি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। পরবর্তী দুটো চরিত্রে সারার অভিনয় বৈশিষ্ট্যহীন হ'লো যার ফলে দুর্দ্ধর্ষ Sarcey তাদানীন্তন কমেডি-দলের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখলেন—'অভিনয় এতো নিম্নস্তরের হয়েছিলো যে দুঃখ হয়। মাদ্‌মোয়াজেল্ বার্নহার্ড-এর অযোগ্যতার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া অনুচিত হবে কারণ তিনি সবে অভিনয় করতে সুরু করেছেন এবং নতুনদের মধ্যে অনেকেরই গোড়ায় বিফল হওয়া স্বাভাবিক। একজন ভালো শিল্পী পেতে গেলে এরকম অনেককেই পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কিন্তু দুঃখ হয় এই দেখে যে তাঁর সহ-অভিনেতারা তাঁর চেয়ে বিশেষ কিছু ভালো নন্। কমেডি ফ্রাঁসেতে বছর কুড়ি থাকার পর সারা বার্ণহার্ড যা হতে পারেন তাঁর সহ-অভিনেতারা বর্তমানে তাই।'

কিন্তু একটা আকস্মিক ঘটনার ফলে কমেডি-ফ্রাঁসেতে সারা বার্ণহার্ডের বেশীকাল থাকা হলো না। পরের বছরের জানুয়ারী মাসে মলেয়ারের জন্মোৎসবে সারা অংশগ্রহণ করলেন। এই উৎসবের দিন সারা তাঁর ছোট্ট বোন রেজিনার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন মঞ্চে যাবার জন্যে। রেজিনা অনবধানতাবশতঃ মাদাম নাটালী নামে একজন মধ্যবয়স্কা অভিনেত্রীর লম্বা পরিচ্ছদের মাটিতে লোটানো

অংশটা বাদিয়ে ফেললো। মহিলা রেগে গিয়ে রেজিনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। বোনকে বাঁচাবার জন্তে সারা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন—'অসভ্য জানোয়ার' বলে মহিলার গালে মারলেন এক চড়। মঞ্চের পিছন দিকটায় দক্ষযজ্ঞ লেগে গেলো—অন্যান্য অভিনেতারা হট্টগোল করতে লাগলো; সারা রেজিনার গায়ে রক্ত দেখে চেঁচামেচি করতে লাগলেন আর মাদাম নাটালী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ফলে উৎসব শুরু হতে দশ মিনিট দেরী হয়ে গেলো।

পরের দিন থিয়েটার অফিসে সারার ডাক পড়লো—তাঁকে নাটালীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হলো। সারা রাজি হলেন না। বললেন—নাটালীরই উল্টে ক্ষমা চাওয়া উচিত তাঁর কাছে। সারাকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে দলে রাখা হলো এবং তিনি নতুন নাটকে মনের মতো একটা ভূমিকাও পেলেন। কিন্তু মহলা দিতে গিয়ে মাদাম নাটালীর কাছে শুনলেন যে সে ভূমিকাটা অন্য একজনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাটালী এইভাবে প্রতিশোধ নিলেন। সারা এই ধরণের অবিচার মেনে নিতে পারলেন না। তিনি চুক্তি ভঙ্গ করে কমেডি ফ্রাঁসে ছেড়ে দিলেন।

এরপর পুরো একবছর সারা কোথাও অভিনয় করলেন না। সব থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ জেনে গিয়েছিলেন যে সারা একজন মেজাজী ও অনির্ভরযোগ্য অভিনেত্রী এবং এইসব ক্ষতি পুষিয়ে দেবার মতো প্রতিভাও তাঁর নেই। শিল্প-শিক্ষণ ক্ষেত্রে ছ'বছরের একনিষ্ঠ পড়াশোনা এবং কমেডি ফ্রাঁসের সংক্ষিপ্ত কালের জন্তে হলেও কষ্টসাধ্য চাকরীর পর সারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করে তাঁর চেহারার যত্ন নিতে আরম্ভ করলেন তিনি, এমনকি গোটাকয়েক প্রেমের খেলাকেও প্রশ্রয় দিলেন যার ফলে জুলি ভাবলেন 'এখনো আশা আছে'। কিন্তু একটা বিত্তবান স্বামীর চাইতে থিয়েটারের প্রতি সারার আগ্রহ ছিলো অনেক বেশী। তিনি চাকরী খুঁজতে থাকলেন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জুলির বন্ধুদের অনুরোধে জিমনেজ্‌ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ সারাকে চাকরী দিলেন।

জিমনেজ্‌ দল একবার 'Palais des Tuileries'এ নিমন্ত্রিত হলো সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও তাঁর অতিথিদের সামনে অভিনয় করার জন্তে। সারা অসাধারণ আবৃত্তি করতে পারতেন বলে ঠিক হলো যে তিনি একটা কবিতা আবৃত্তি করে অনুষ্ঠান শেষ করবেন। যখন তাঁর সময় এলো, সারা ছোট মঞ্চটার ওপর উঠে রাজদম্পতিকে অভিবাদন জানালেন এবং বললেন যে তিনি ভিক্টর হ্যুগোর 'Oceano Nox' কবিতাটি আবৃত্তি করবেন।

সারা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে অমন একটা সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করার পর শ্রোতারা তাঁকে অভিনন্দন জানালো না কেন। তাঁর মনে হলো কবিতাটা শুনে সকলের মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। তিনি শ্রোতাদের মেজাজ ভালো করার জন্তে হ্যুগোর একটি হাল্কা সুরের কবিতা আবৃত্তি করবেন ভাবলেন। কিন্তু প্রথম লাইনটা বলতে না বলতেই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যাবার জন্তে উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্যদেরও সেই ইঙ্গিত করলেন। ভীত এবং হতবুদ্ধি সারা দেখলেন তাঁর সামনে পরোপুরটা আসন শূণ্য। জিমনেজ্‌-এর পরিচালক রেজায় রেগে গেলেন। তিনি এবং দলের অন্যান্য বিচলিত সদস্যরা একযোগে সারাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি কতোটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন—বললেন যে সারা গণতন্ত্রবাদী

হ্যুগো'র একজন আগ্রহী গুণগ্রাহী হলেও তাঁর এটা জানা উচিত ছিলো যে সম্রাটের বিরুদ্ধে আক্রমণসূচক পুস্তিকা লেখার জন্যে হ্যুগোকে ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে এবং তাঁর নাটকের অভিনয় আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও সারা দমে রয়ে গেলেন। 'La Demon du Jeu' নাটকে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেন এবং এই নাটকটা গোটা গ্রীষ্মকাল ধরে চললো। পরবর্তী নাটকে সারাকে বদমেজাজী ও সবলমনা এক ভ্রান্ত রাণীর ভূমিকা দেওয়া হলো। এই রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তিনি তাঁর বেশীর ভাগ সময় মঞ্চের পেছনে ব্যয় করতেন এবং একটু একটু করে কামড়ে স্যাণ্ডউইচ্ খেতেন। চরিত্রটা সারার মোটেই পছন্দ হলো না এবং প্রথম রাত্রে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত নীরস ও আনাড়ির মতো হলো। অভিনয় দেখে তাঁর মা বললেন—'তোমাকে একেবারে হাস্যকর লাগছিলো। যারা জানে যে তুমি আমার মেয়ে সেইসব লোকের সঙ্গে দেখা হলেই আমার রীতিমতো লজ্জা করছিলো।'

জুলির এই খোঁচা সারার কাছে অসহ্য লাগলো। তিনি পালাবার জন্যে তৈরী হলেন। জিমনেস্-এর পরিচালককে সারা এক চিঠি দিলেন এই মর্মে যে তিনি যেন এই 'হতভাগিনী বিকৃত-বুদ্ধি মেয়েটিকে করুণাপরবশ হয়ে ক্ষমা করেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে অসার ও উত্তেজিত কল্পনা নিয়ে সেইদিন সন্ধ্যায় সারা স্পেন-এর পথে পাড়ি দিলেন। তাঁর এই অভিযান তিন সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হল। সারা ফিরে এলেন প্যারিসে। সন্তানসম্ভবা তিনি। বুদ্ধিমতীর মতই তিনি ভাবলেন যে এখন বাড়ীই তাঁর নিরাপদ আশ্রয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সারার ছেলে মরিস্ জন্ম নিলো। ছেলের ভবিষ্যৎ এবং নিজের কথা ভেবে সারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন যে অভিনেত্রী হিসেবে তাঁকে সাফল্য অর্জন করতেই হবে।

* * *

পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে সারা এমন কোন দল খুঁজে পেলেন না যেখানে তিনি আন্তরিকভাবে তাঁর তৃপ্তির জন্যে কাজ করতে পারেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Odeon দলের একজন সভ্য হিসেবে গৃহীত হলেন। Odeon হলো ফ্রান্সের দু'নম্বর জাতীয় নাট্যশালা এবং তরুণ নির্দেশক Felix Duquesnel তখন এর পরিবর্তন সাধন করছেন। বহুদিনের বদনাম সত্ত্বেও সারার উপরে Duquesnel এর গভীর আস্থা ছিলো।

সারা শেষপর্যন্ত তাঁর মনের মতো জায়গা পেলেন। তিনি পরে বলেছিলেন—'Odeon থিয়েটারকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছি। ওখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালোবাসতো এবং প্রত্যেকে হাসিখুসী থাকতো। আমরা নাটক এবং অভিনয় কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতাম না। আমরা সকালে বিকেলে সারাক্ষণ মহলা দিতাম এবং এটা আমার খুব ভালো লাগতো।'

Odeon-এ সারা যে ভূমিকা পেতেন তাতেই অভিনয় করতেন। তিনি অন্যান্য ভূমিকাও তৈরী করে রাখতেন যাতে দরকারের সময় অন্যের বদলে অভিনয় করতে পারেন। শিশুপুত্রকে বাদ দিলে থিয়েটারই হলো সারার জগৎ এবং তিনি থিয়েটারের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিলেন।

ক্রমে তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃতি পেলো। কর্ত স্যাণ্ডের অনেকগুলো নাটকে তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (তাঁর বয়স যখন চব্বিশ বছর) সারা প্রথম সত্যিকারের সাফল্যের স্বাদ পেলেন ফ্রাঁসোয়া কোপ্পির 'Le Passant' নামক কাব্যনাট্যে বালক কবি Zanettoর ভূমিকায় অভিনয় করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তিনি বিশেষ করে প্রিয় হয়ে উঠলেন এবং ঐ চরিত্রে তাঁর আঁট-সাঁট, ফিকে লাল রঙের পোষাক পরা রোগা চেহারার জয়জয়কার পড়ে গেলো। এপ্রিল মাসে 'Palais des Tuileries'-এ ঐ নাটকের একটা বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য অনুরোধ এলো। পাছে পাঁচ বছর আগেকার অনিচ্ছাকৃত অপমানের কথা সম্রাটের মনে পড়ে যায় এই ভয়ে সারা অভিনয় করতে প্রথমে ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু এই শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন যে যাঁরা নিয়মিত অভিনয় করেন তাঁদেরকেই দেখতে চাওয়া হয়েছে। অভিনয়ের পরে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সারাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর হাতে চুমু খেলেন। এককালের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের সেই বৃদ্ধ ও ক্লান্ত চেহারা দেখে সারা অভিভূত হয়ে গেলেন। আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক নীতির সাম্প্রতিক ব্যর্থতার ফলে গণতন্ত্রবাদীদের দাবী সম্রাটকে ক্রমেই মেনে নিতে হচ্ছিলো। তিনি ম্লান হেসে স্বীকার করলেন, 'গতবার এখানে এসে তুমিই ঠিক বলেছিলে। তুমি আমার আগেই বুঝতে পেরেছিলে যে একদিন ভিক্টর হ্যুগোর লেখা আমাকে অনুমোদন করতেই হবে।'

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রুশিয়ার নেতা বিস্‌মার্ক-এর প্ররোচনায় সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। প্যারিসের অবং লোক দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় মেতে উঠলো—কয়েকদিন ধরে প্যারিসের পথে ঘাটে ধ্বনিত হতে লাগলো—'বার্লিন চলো।' Odeon-এ নির্ধারিত অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলো—বিশাল বিশাল জনসভার মঞ্চে ব্যবহৃত হতে লাগলো নাট্যশালা। এইসব জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করতেন সারা বার্ণহার্ড।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের অশিক্ষিত এবং স্বল্প অস্ত্রশস্ত্রেসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রুশিয়দের কাছে হেরে যেতে লাগলো এবং সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে সম্রাট অত্যন্ত অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন Sedan-এ। এই অবস্থায় ঠিক হলো যে প্যারিস্‌কে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। প্যারিস্ ছেড়ে যাবার কথা সারা একবারও ভাবলেন না। ধাত্রীবিদ্যায় দু'সপ্তাহের একটা শিক্ষা নেওয়ার পর তিনি Odeon নাট্যশালাকে একটা জরুরী হাসপাতালে পরিণত করার অনুমতি জোগাড় করে ফেললেন। হাসপাতালের জন্যে খাবার, কম্বল এবং ওষুধপত্র জোগাড় করতে সারা তাঁর জানা যাবতীয় সম্ভাব্য উপায় কাজে লাগালেন। যা হোক করে, রুগীদের দেখবার জন্যে ডাক্তার জোগাড় করলেন। সারার বন্ধুবান্ধবরা বা চেনা-জানা লোকেরা কেউ তাঁর সামনে গরম জামাকাপড় পরতে সাহস করতেন না, কারণ সারা তক্ষুণি সেগুলোকে তাঁর শীতার্ত আহত সৈনিকদের জন্যে কেড়ে নিতেন। সারা চিরকালই রোগা ছিলেন এবং রক্তাল্পতায় ভুগতেন। কিন্তু প্যারিস্ যতদিন অবরুদ্ধ ছিলো ততদিন তিনি প্রায় না-খেয়ে এবং না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। প্যারিস অবরুদ্ধ ছিলো তিনমাস।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে ক্লান্ত ফরাসী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো এবং প্রুশিয় সৈন্যরা বিজয় গর্বে প্যারিসের বুকে ধ্বংসলীলা চালাতে লাগলো। অবশেষে যে মাসে একটা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো এবং সেই সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

একবছরের বিরতির পর আগষ্টমাসে Odeon নাট্যশালায় আবার মহড়া সুরু হলো। এবার ভিক্টর হ্যুগোর বহু-প্রত্যাশিত নাটক 'Ruy Blas' নির্বাচিত হলো অভিনয়ের জন্যে এবং সারা বার্ণহার্ড মনোনীত হলেন স্পেনের রাণীর চরিত্র-চিত্রণের জন্যে। নাটকটি অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা'র জয়জয়কার পড়ে গেলো। হ্যুগো ইতিমধ্যে নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর নাটকের মহলার তত্ত্বাবধান করছিলেন। 'Ruy Blas' নাটকে সারা তাঁর বিখ্যাত সুরেলা গলাকে ভালোভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন—যে গলার যাদুস্পর্শে পরবর্তীকালে পৃথিবীর তাবৎ নাট্যামোদী মুগ্ধ হয়েছিলেন। Francisque Sarcey লিখলেন—'তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত কোমল এবং শান্ত; তাঁর বাচনভঙ্গী এতো ছন্দোময় এবং উচ্চারণ এতো স্পষ্ট যে একটি অক্ষরও হারায় না—এমনকি যখন তিনি খুব আস্তে এবং অনিচ্ছাভাবে কথা বলেন, তখনও না।'

সারা বার্ণহার্ড গৌরবের পথে পা দিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

। এক্সপোজেইশন ॥

চতুর্দশ-'বিশেষ'-সংখ্যা

সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ ॥

ঘরোয়া

★

—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

ঘড়ির টিক টিক শব্দের মতই একটানা বেজে চলেছে বুকের ভেতরকার ধুক ধুক্ শব্দ। হাত দিয়ে অনুভব করলাম শব্দটা। দু'টো শব্দের তফাৎ আছে, দু'টো যন্ত্রেরও। বুঝলাম।

●

কিন্তু কী করে বুঝলাম? হৃদ্-যন্ত্রের কি বোঝবার শক্তি আছে? না। তা হলে? তা হলে বোধের যন্ত্র অন্যত্র। সেটা হৃদ্-যন্ত্রের চেয়েও শক্তিমান। নিজের অজান্তে একখানা হাত নিজের মাথাটাকে স্পর্শ করেছে, অনুভব করলাম। অনুভব করলাম; মানব-দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্মতম যন্ত্র মস্তিষ্ককে।

●

গভীর রাত্রির অন্ধ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঝড় উঠলো। ঘূর্ণী হাওয়ায় শুকনো ছেঁড়া-পাতার মত বিচ্ছিন্ন চিন্তার টুকরো প্রচণ্ডবেগে পাক খেতে খেতে ঊর্ধে উঠতে লাগলো: কখনো দেখছি: মনিমাণিক্যখচিত রাজকীয় নাটমঞ্চে দুষ্মন্ত আশ্রমমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করে উন্মুক্ত শরধনু হাতে রথারোহনে ছুটে চলেছেন। কখনো দেখছি: ত্রিশ হাজার দর্শক ইডিপাসের ভয়ংকর ভ্রান্তির ততোধিক ভয়ংকর পরিণাম দেখে হায় হায় করে উঠছে। দিনের বেলায় উন্মুক্ত মঞ্চে ম্যাকবেথ!····· এ্যাস্কাইলাস, সফোক্লিস্, ইউরিপিডিস্, এ্যারিস্টফ্যানিস্, তলস্তয়, চেকভ, ইবসেন, শ' এবং রবীন্দ্রনাথ—এদের প্রত্যেকের মুখে নানান্ ধরণের দাড়ি।

শেক্সপীয়রের নীচের ঠোঁটের তলায় ক'গাছা চুল আর শানের মাথায় টাক—মলিয়েরের বিশ্রী বাঁকড়া চুল—গোর্কির অভিজাত গোঁফ—স্ট্রীণ্ডবার্গের পাগলা চোখ—ও'কেসি, ইয়েটস্, সার্ত্র, আর এলিয়টের গোঁফদাড়ি কামানো ইন্‌টেলেকচুয়াল মুখ—ও'নীলের রেখাকণ্টকিত চওড়া কপাল—ব্রেখ্‌টের চুরুট—মিলার ও ওডেট্‌স-এর চোয়াড়ে মুখ আর টেনেসি উইলিয়ামস্ এর অতিক্রান্ত-যৌবনের নীল চোখে আজো নবীনা সাগরের সেই গভীরতা!……

●

ছায়াছবির মতো মনের পর্দায় ছবিগুলো এলো, আর মিলিয়ে গেল। শুধু রেখে গেল একটা বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এদেরকে আমরা যে যেটুকু বুঝেছি সেকি হৃদয় দিয়ে? না, মস্তিষ্ক দিয়ে? হৃদয়াবেগের তাড়নায় আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি আনন্দে, হাউ হাউ করে কাঁদি শোকে, উত্তেজিত হই রাগে, হাততালি দিই বিস্ময়ের আতিশয্যের অভিব্যক্তিতে। মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝেও আমরা অভিভূত হই। কিন্তু তার প্রকাশ অত উদ্দাম হয় না—হাততালি সেখানে শুধু চাপল্য বলে উপহসিত, হাসি সেখানে স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল, কান্না সেখানে প্রশান্ত সহানুভূতির মুক্তাফলের মতো চোখের কোণে টলটল করছে। কিন্তু তবু—?

●

তবু আজও আমরা নাটকে হৃদয়াবেগের প্রাধান্যই খুঁজছি, এ কথা কি সত্যি নয়? অথচ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে যে নাটকের জন্ম ও গতি-প্রগতির ইতিহাসও একসূত্রে বাঁধা ইঙ্গিতময় ব্যাপ্তিতেই তার সূচনা। নাচই মানুষের আদিমতম কলা এবং নাচ থেকেই নাটকের যাত্রা শুরু, পৃথিবীর তাবদ্দেশের ইতিহাসকারদের একথা যদি মানি তা হলে সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হয় যে, অনুচ্চারিত কোনো প্রার্থনা, অপ্রকাশিত কোনো ভাবই তারা দেহভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাইত। অর্থাৎ যা দেখছি শুধু তাই নয়, তা'র চেয়েও কিছু বেশী বুঝে নিতে হবে। তাহলে সেইসব নৃত্যপরিকল্পনাকার আদিম 'নাট্যকারে'র অলিখিত 'নাটকে'র সঙ্গে ইবসেন-রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কিন্তু কিছুমাত্র মতবিরোধ থাকেনা। কেবল আমরা—যারা নাটক দেখবো এই বিংশ শতাব্দীর অতিক্রান্ত মধ্যভাগে—তারাই যদি যা দেখছি শুধুমাত্র তাই দেখেই অভিভূত হ'তে চাই—তার অতিরিক্ত কিছু বুঝে আনন্দ পা'বার কষ্ট স্বীকার করতে না চাই তাহ'লে আমাদের পরিচয় দেবার মত মানবগুণ কিছু অবশিষ্ট থাকে কি?

●

বস্তুত: হৃদয়র থেকে বোধবৃত্তি যে বড়, এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করলে আমরা বিপর্যয় ডেকে

আনব—নাটকের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রেও। বুদ্ধিবৃত্তির বিকার ঘটলে তাকে বলি বিকৃতমস্তিষ্ক—বিকৃত-মস্তিষ্কেরও হৃদয়বৃত্তি থাক্‌তে পারে একরকমের—সে হাসতে পারে, কাঁদতে পারে, কথা বলতে পারে। কিন্তু তার সেই অসংলগ্ন কথা ও অর্থহীন হাসিকান্না পাগলের পাগলামি মাত্র। সুতরাং যে বিশেষ এবং অশেষ গুণ ও শক্তিসম্পন্ন দেহযন্ত্রাংশ মস্তিষ্কের গুণে মানুষ মানবেতর প্রাণী থেকে ভিন্ন এবং যার অনুশীলন-লব্ধ বিবিধবিদ্যা শক্তিতেই সে গুহাবাসের যুগ থেকে আজকের এই মহাকাশ-বিজয়ের যুগে এসে পৌঁছেছে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হবার আগে পর্যন্ত সেটাকে সজাগ ও সচল রেখে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?—কী জীবনে, কী নাটকে?

●

নাটক চিরদিনই বুদ্ধিগ্রাহ্য। এবং নাটকের একটা ইতিহাসও আছে ক্রমবিবর্তনের। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নাটক লিখেছে, বুদ্ধি দিয়ে অভিনয় করেছে, বুদ্ধি দিয়েই আবার মানুষ তা দেখেছে। এই লেখা, দেখা এবং অভিনয় করা'র বুদ্ধি যুগে যুগে বদলে গেছে। অর্থাৎ নাটকের রচনাশৈলী, প্রযোজনা-পদ্ধতি এবং দর্শকরুচির পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে। আড়াই হাজার বছর আগে প্রথম এথেনিয়ান ট্র্যাজেডির যে রূপ ছিল যেভাবে তা অভিনয় হতো এবং যে দর্শক তা দেখতো স্বাভাবিক কারণেই পরবর্তী একশো বছরের মধ্যেই তার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। এমন কি, অ্যারিস্টটল-এর সময়েই গ্রীসে ট্র্যাজেডির পতন ঘটেছে। ত্রয়ী গ্রীক ট্র্যাজেডিয়ানের তৃতীয় ইউরিপিডিস-এর সঙ্গে অ্যারিস্টটল-এর সময়ের ব্যবধান একশো বছরের বেশী নয়। কিন্তু তখনই লোকে প্রমেথিউস, অ্যাগামেমনন্‌, ইলেক্ট্রা, ইডিপাসকে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে মিডিয়া ইফিজেনিয়াকে। তখন সুরু হয়েছে প্রহসন: অ্যারিস্টোফ্যানিসে যার সূত্রপাত মিনাণ্ডারে তার শেষ। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষে গ্রীসের পটভূমিকায় নাটকের ওপরই শেষ যবনিকা নেমে এলো। অন্য দৃশ্য সুরু হলো রোমে। সেনেকা ও টেরেন্স—ট্র্যাজেডি ও কমেডি। লাতিন নাট্যের মহানায়ক। হোরেস বেঁধে দিলেন ছক—অনেকটা অ্যারিস্টটলের ছাঁচ—কিন্তু একেবারেই ছক: 'এটা করো, ওটা কোরো না, গ্রীক প্যাটার্নটা চোখের সামনে রেখো সব সময়'। কিন্তু সূত্র বেঁধে দিলে আর নাটক হয় না। এটা অ্যারিস্টটলের পর গ্রীসে দেখা গেছে। হোরেসের পর রোমেও দেখা গেছে—এমনকি, ভরতের পর ভারতেও দেখা গেছে।

●

এলো রেনেসাঁস যুগ। যা কিছু প্রাচীন তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়লো নতুন করে। থিয়েটারের প্রসার ঘটলো য়ুরোপের সমস্ত দেশে। মানুষের নৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নাটক লেখা হতে লাগলো: তার নাম Morality plays। গীর্জায় গীর্জায় পথে প্রান্তরে বাজারে নাটক হলো—কখনো ঠেলাগাড়ীর ওপরে, কখনো বা বাঁধা উঁচু কোনো মঞ্চে। আমাদের কলকাতায় 'জেলেপাড়ার সং'

যাঁরা দেখেছেন বা প্রাচীন মিরোকল বা গর্ভীরা গীতশোভাযাত্রার কথা যাঁরা জানেন তাঁরা ইতালীয় কমেদিয়া দেল আর্তের পরে য়ুরোপের এই ঠেলা গাড়ীর থিয়েটার থিয়েটারের বিবর্তনের চিহ্নই দেখতে পাবেন। Every Man নাটকটী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মঞ্চস্থ হয়। এখানে এসে নাটক যেন আধুনিক হবার পথ পেল। মৃত্যুকালে মানুষকে তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে, এমন কি, তার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, রূপ, জিনিষপত্র কিছুই তার সঙ্গে যায় না—কেবল যায় তার সংকাজের কলশ্রুতি : সেই শেষপর্যন্ত তার সঙ্গে গিয়ে ভগবানের কাছে তাণ হয়ে কথা বলে শেষ বিচারের দিনে। নাটকটী জীবন্ত রকমের রূপসফল হলো : সাধারণ মানুষ যেন এর নিজের মনের কথার প্রথম প্রতিধ্বনি শুনলো নাটকে।

●

এমনি করেই ইতালীতে, স্পেনে, ফ্রান্সে জার্মানীতে, ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁর যুগে নাটক নতুন রূপ নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সর্বব্যাপক নবোন্মেষের যুগে শিল্পকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বিবর্তন দেখা দিলেও মহৎ নাটক সৃষ্টি হলো না কেন, এটা ভেবে দেখবার কথা। স্পেনের লোপ দ্য ভেগা মার্লো এবং শেক্সপীয়রের মাত্র দু'বছর আগে জন্মান—এবং দুজনের চেয়েই কয়েক বছর বেশি বেঁচে ছিলেন। এই 'Monster of Nature' নাকি হাজার দুই ছোট বড় নাটক লেখেন। যার মধ্যে কিছু নাটক অভিনন্দনযোগ্য। যেমন The Sheep Well—কৃষক শ্রেণীর গ্রামীন চরিত্রের লোকেদের সংঘবদ্ধ প্রতিবোধের কাহিনী হিসেবে একে প্রথম Proletarian নাটক বলা যাবে—নাট্যগুণেও একে অনেকে Classic পর্যায়ে ফেলেছেন।

●

য়ুরোপে সেনেকার প্রভাবে ট্র্যাজেডির অক্ষম প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন চলে। ১৫৬২ সালে স্যাকভিল ও নর্টনের Gorboduc অভিনীত হলো লণ্ডনে। ইংরেজিতে যার এই প্রথম ট্র্যাজেডি—অত্যন্ত অসার্থক রচনা। কিন্তু রক্তসফল। কিডের Spanish Tragedyও তাই। মার্লো ট্র্যাজেডিকে উন্নততর পর্যায়ে আনলেন তাঁর Tamborlaine, Dr Faustus এবং The Jew of Maltaতে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে দৃশ্যসূত্রে বাঁধার পুরোনো রীতিকেই তিনি অনুসরণ করলেন। এর আগে রোম্যান মডেলের ইংরেজী প্রহসন 'র‍্যালফ রয়ষ্টার ডয়ষ্টার'—ইংরেজী সাহিত্যে সত্যিকারের প্রহসনের পথ খুলে দিয়েছে। এর লেখক ইটনের হেডমাষ্টার নিকলাস উডল। 'Mirth Prolongeth life and causeth Health'—এই ধারণা নিয়েই এঁরা নতুন ধরণের প্রহসন লিখতে শুরু করেন। লীলি, পীল, গ্রীন, ন্যাস, কিড এবং মার্লো—এইসব University Witsদের রচনা শেক্সপীয়রের পথ প্রশস্ত করলো। ভাষার রকমফের এরা ঘটিয়ে দিলেন—লীলির Euphuism, মার্লোর Blank verse—গদ্যে ও পদ্যে নতুন রীতির সূচনা করলো। মার্লো এবং শেক্সপীয়রের বয়সের ব্যবধান মাত্র দু'মাস। তবু মার্লোর সামনে আদর্শ হিসেবে কোনো শেক্সপীয়র ছিলেন না, অপর পক্ষে শেক্সপীয়রের সামনে কীড ছিলেন, মার্লো ছিলেন এবং কিছু প্রহসনকারও ছিলেন।

৳ একশোসাতাশ ।

ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের পূর্ণতা শেকস্‌পীয়রে। শেকস্‌পীয়র ম্যারিষ্টটলকে অতিক্রম করে ট্র্যাজিডিকে যে পূর্ণতা দিলেন তা সম্পূর্ণ অভাবিত। এ যেন এক নতুন জগৎ—যে জগৎ সম্পূর্ণ গ্রীক ট্র্যাজেডির জগৎ নয়, সেনেকার জগৎ নয়, মার্লোর জগৎ নয়। অথচ এদের ছায়াও যেন এখানে অনুভবে আসে। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার—বিশ্বনাট্যসাহিত্যে পৃথকভাবে এক এবং অদ্বিতীয়। শেকস্‌পীয়রের অনুকারী তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তীরা তাঁর কাছেও পৌছুতে পারেননি। 'The Maids Tragedy', 'The White Devil', 'The Duchess of Malfi'—একখানিও না। বরঞ্চ 'A woman killed with kindness'-এ হেউড সামাজিক বিয়োগান্ত নাটকের একটা পথ দেখালেন। জনসনের 'Everyman in his humour', ডেকারের 'The Shoe-makers Holiday' প্রভৃতি প্রহসন ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের অদ্বিতীয় প্রহসন প্রতিভা মলেয়ারের অভ্যুদয়কালের সূচনা করে দেয়।

●

শেকস্‌পীয়রও কমেডিতে মোটা দাগের রসিকতা বা ভাঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছেন, এ অভিযোগ মিথ্যে নয়। মলেয়ারের রসিকতায় তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ দেখা দিল। ডন জুয়ানের নৈরাশ্যবাদের মধ্যে অদ্ভুত Wit এবং Humour—'The Misanthrope'-এ তখনকার ফরাসী সমাজের ব্যঙ্গচিত্র—'Turttuffe' তাঁর "thoughtful laughter"-এর উজ্জ্বল চিত্র—'The Would-be gentleman' ধনী মধ্যশ্রেণীর প্রতি তীব্র বিদ্রূপ। জার্মানীর শীলার এবং গ্যেটের সঙ্গে নাটকে রোমান্টিক ভাবধারা সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে—নাটকে কাব্যাশ্রয়ী ভাবানুভব প্রসার ঘটে। কীটস্‌, শেলী, বায়রন সবাই নাটক লিখলেন। কিন্তু শেলীর (The Cenci) ছাড়া আর কারো হাতে নাটক হলো না। শেলীর ট্র্যাজেডিখানিও বিশেষ কোথায়ও অভিনীত হয়নি। রোম্যান্টিক যুগের কবিরা অপূর্ব কাব্য রচনা করলেন কিন্তু নাটক লিখ্‌তে পারলেন না। ফ্রান্সে জোলা, নরওয়েতে ইব্‌সেন নাটক থেকে রোম্যান্টিসিজম নির্বাসিত করলেন। এলো ন্যাচারালিজম-এর যুগ। কিন্তু এক ইবসেনের মধ্যেই নাট্যশিল্পের তিনটি যুগের সংমিশ্রণ—। তিনিও প্রচলিত রোমান্টিসিজম দিয়েই যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী যে সব নাটকের জন্যে তাঁকে "আধুনিক থিয়েটারের জনক" বলা হয় (Hedda Gabler, The Pillars of Society, A Doll's House, Ghosts, An Enemy of the People, The Wild Duck এবং Rosmersholm) সেগুলিকে ন্যাচারালিষ্ট, রিয়ালিষ্ট এবং সিম্বলিষ্ট আংগিকেও রূপায়িত করা হয়েছে। জোলার ন্যাচারালিজম জীবনের সংকীর্ণ খণ্ডাংশ মাত্র, ইবসেনের ন্যাচারালিজম জীবনের পরিপূর্ণ রূপ—একটি পরিবারকে আশ্রয় করে সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত। আধুনিক মানুষের সমাজ ও জীবনের দ্বন্দ্ব এবং তার শোচনীয় ট্র্যাজিক পরিণতির এতবড় নাট্যরূপকার বিশ্বনাট্য সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ নেই।

নরওয়ের মঞ্চে নাটকীয় নাট্যকার স্ট্রিণ্ডবার্গের অভ্যুদয় বিশ্বনাট্যসাহিত্যের আর এক যুগান্তকারী ঘটনা—The Father, Comrades, Creditors, The Dream play, To Damascus, The Stock Sonata প্রভৃতি নাটক ইবসেন-এর নতুন ভাবধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—স্ট্রিণ্ডবার্গের মধ্যেও ন্যাচারালিজম ও সিম্বলিজম-এর সংমিশ্রণ—যুদ্ধোত্তরকালের 'Expressionism'-এরও তিনি অগ্রদূত। বেস্তারলিংক ন্যাচারালিজমকে ত্যাগ করে 'গতিহীন নাটকে' নতুন প্রতীকধর্মিতা আনলেন। আর বার্ণার্ড শ' আনলেন এক বর্ণোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত বিচিত্র নতুন নাট্যজগৎ—যেখানে হাসির পেছনে অশ্রু দুর্লক্ষ্য নয়, তীব্র বিদ্রূপের কষাঘাতের মধ্যেও সহানুভূতির অভাব নেই—নাটকের convention-এ এলেন তিনি unconventionally।—শ'র দীর্ঘ নাট্যকার জীবনে তিনি যে ঐতিহ্য রেখে গেলেন তা রূপে রসে অপূর্ব, অনন্য, অদ্ভুত এক বিস্তীর্ণ শিল্পজগৎ—Mrs. Warren's Professions, The Devils Disciple, Caesar and Cleopatra, Man and Superman, Major Barbara Androcles and the Lion, Pygmalion, Candida Back to Methuselah এবং আরো বহু নাটক নিন্দা-স্তুতির ঊর্ধে তাঁকে যে আসন দিল তাতে সহজেই বলা যায় : এই দুর্ধর্ষ Fabian কেবল রঙ্গব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক কথার তুবড়ী ছিলেন না—নতুন জীবনদর্শন ও তীক্ষ্ণ মতাদর্শের সঙ্গে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন নাট্য আংগিক যাকে কোনো একটামাত্র লেবেল এঁটে বোঝা যাবে না। He was not only a man, but a phenomenon। আগামী একশ বছরের মধ্যেও তাঁর জুড়ি মিলবে কিনা সন্দেহ।

●

ইতিহাস নয়—শুধু পেছনে তাকিয়ে দেখা আর নিজেদের অবস্থা বোঝবার তাগিদেই অপরকে বোঝবার চেষ্টা। কাজেই শ'র সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি স্মরণ করি আর ক'টি স্মরণীয় নাম তাহ'লেই আমাদের দৃষ্টি অতীত থেকে বর্তমানে এসে পৌঁছুবে যেমন, অস্কার্সাও সনেত বৃটিশ মঞ্চের অবশিষ্ট স্মরণীয় হচ্ছেন : গলস্‌ওয়াদি, মেসফিল্ড, নোয়েল কাওয়ার্ড, মম, অস্কার ওয়াইল্ড, এলিয়ট এবং ইয়েটস্‌, ও'কেসি ও সিঙ্‌। রাশিয়ায় গোগোল থেকে তলস্তয়, গোর্কি থেকে চেকভ এবং আঁদ্রেয়েভ থেকে কাতায়েভ, মধ্য যুরোপে Wedekind, Hauptman, Capek, Toller, Brecht এবং সার্ত্র্‌ ও জিরাদু, ইতালীতে পিরান্দেলো, স্পেনে লরকা এবং আমেরিকায় ও'নীল, কাফম্যান, সেরউড, এলমার রাইস, টেনেসি উইলিয়ামস্‌, ওডেট্‌স ও মিলার। নাটকের ফর্ম ও কনটেন্ট নিয়ে এই অসংখ্য নাট্যকার সারা দুনিয়া জুড়ে গত দু'হাজার বছর ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে আজকের যুগে এসে পৌঁছেছেন। রিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম, বা সিম্বলিজম পার হয়ে এসে আজ আমরা এক্সপ্রেসনিজম-এর কথা শুনছি, শুনছি এক্সিসটেনসিয়ালিজম-এর কথা। আমরা শুনছি—

'Expressionism called for the presentation of inner states rather than outer reality as well as for the distortion of the latter by the inner eye : [Gassner]

অপর পক্ষে সার্ত্র্‌ বলেছেন—'Existentialism is a form of Humanism [L' Existentialism est unhumanisme] Masses and Man যদি প্রথমোক্ত শ্রেণীর নাটক হয় তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর

নাটক The Flies, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। Mrs. Warren's Professions-এর সঙ্গে La Putain respectouse নাটকের যে পার্থক্য তা নাট্যগঠনেরই মূল চরিত্রগত। এখন প্রশ্ন, আমরা এর থেকে কি শিখবো? কতটুকু নেব? কতটা বর্জন করব? 'Mad Woman', 'Mother Courage', 'Good Woman of Setzuan' বা 'রাইনোসেরাস' কি আমাদের বুদ্ধিবাদী মনকে নাড়া দেয়? যদি দেয় তা হলেই বা কি করব আর যদি না দেয় তা হলেই বা কি করব?

●

আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করেই পুষ্টি হয়েছে। একথা কেউ অস্বীকার করবেন নি। নানাভাবে আমরা ওদের প্রভাবে প্রভাবিত, একথাও সত্যি। এমন কি, থিয়েটারের ক্ষেত্রেও আমরা ইংরেজী নাটকের অনুকরণেই নাটক লিখেছি সেই 'ভদ্রার্জুন' 'কীর্তি বিলাসের' যুগ থেকে। কিন্তু গত একশ বছরের মধ্যে আমরা শেক্সপীয়রের বাইরে যা ভেবেছি তা অতি সামান্য। এমনকি, আধুনিক থিয়েটারের জনক ইবসেনকেও খুব যে মেনেছি তা নয় (অবশ্য ইবসেনও মারা গেছেন চুয়ান্ন বছর আগে)। পৃথিবীতে যুদ্ধোত্তর যুগের যে নাট্যপ্রগতি তার সঙ্গে আমরা তো প্রায় অপরিচিত। তা'হলে আমাদের সামনে পথ কোথায়? কীর্তিমান নাট্যকার এবং প্রচণ্ড মঞ্চসফল বহু নাটকের গর্ব আমরা স্বভাবতই করতে পারি। সাহিত্য ইতিহাসকারেরা বলেন, অনেক সার্থক ট্র্যাজেডি এবং ভাল নাটক আমাদের সাহিত্যে আছে [এই সংখ্যায় অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর বিপরীত কথাও শুনতে পাই: আমাদের সাহিত্যে নাটক নেই [এই সংখ্যায় শ্রীঅজিতজিৎ সেনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় কি? নাটক থিয়েটারের প্রাণরস সরবরাহ করে। নাটক—শ্রেষ্ঠ নাটক—মহৎ নাটক—অতীতে লেখা হয়েছে কিনা তার আলোচনা—বিস্তৃত বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই দরকার—তার থেকেই আমরা আগামীকালের নতুন থিয়েটারের জন্যে আজকের নাট্যরচনার সূত্র সন্ধান করতে পারব। পারব, কিন্তু নাট্যের বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতকে অবজ্ঞা করে নয় ✓

●

বস্তুত: নবনাট্য আন্দোলনের সামনে আজ এইটেই বড় সমস্যা: 'কী নাটক করব? আর কেমন করে করব?' অবশ্য এই সংখ্যায় শ্রীসুবঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নবনাট্য আন্দোলন ব্যাপারটার ওপরই যবনিকা টেনে দেবার কথা বলেছেন, আরো কয়েকজন লেখকও প্রসঙ্গত এই ধরণের কথা বলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, যিনি যা করছেন তা-ই যদি নবনাট্য আন্দোলন হয় বা যেকোনো অক্ষম নাট্যরচনা (এমন কি, সেকেলে কোনো ফার্সও) যদি নবনাট্যের নাটক হয় তাহলে একে নাট্য আন্দোলন না বলাই সঙ্গত। সেক্ষেত্রে রক্তকরবীও নবনাট্যের নাটক নয় বা ইবসেনও নবনাট্যের নাট্যকার নন। বস্তুত: সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, নবনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে ফতোয়া দেওয়ার প্রবণতা যেমন বেড়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা সম্বন্ধে অশালীন অশিষ্ট ও ধৃষ্ট মন্তব্য করে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশের আগ্রহও তেমনই উৎকট হয়ে উঠেছে। আর এসব করছে কারা? যারা নবনাট্য আন্দোলনের কেউ নয় বা এর reflected Glory-তে নিজেদের উজ্জ্বল দেখাবার উৎকাংখায় এ-আসরে নিতান্তই অবাঞ্ছিত। অবশ্য যেখানে এইরকম সেখানে সুস্থ আলোচনার দ্বারাই এইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিহত করা প্রয়োজন। আমরা আশা করব, নবনাট্য আন্দোলন যাঁরা গড়ে তুলতে সত্যি সত্যি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন বা যাঁরা এ সম্বন্ধে সুস্থ সহানুভূতি নিয়ে চিন্তা করেছেন তাঁরা এই আলোচনার আসরে এগিয়ে আসবেন।

প্রায় বছর কুড়ি আগেকার কথা। তখনো 'নবান্ন' লেখা হয়নি, 'জবানবন্দী' ও না, এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় গণনাট্যসংঘের জন্মও হয়নি। নাট্যভারতীর মঞ্চে ছোট একটি রোগা মতন মেয়ে অন্যান্যের সঙ্গে নাচলো, 'আগুন' বলে একটি নাটিকায় একটা ছোট পার্টও করলো ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের এক অনুষ্ঠানে। শুনলাম, মেয়েটির নাম 'মণি'। 'জবানবন্দী'তে মণিকে চিনলাম। 'নবান্ন'তে তাকে বাংলাদেশ চিনলো তৃপ্তি ভাদুড়ী বলে। তারপর কলকাতায় আমরা কিছু ছোটখাট নাটিকা করছি, তৃপ্তি গেল বম্বে 'ধরতি কে লাল' ছবি করতে। ফিরে এলো তৃপ্তি মিত্র হয়ে। বন্ধুজনেরা খুশী হলাম। এরকম সম্ভাবনা কারো মনে হবার কোনো কারণ ছিলনা বলেই হয়ত বেশি করে খুশী হলাম। তারপর 'বহুরূপী'র যাত্রাসুরু। ১৯৪৮-এ নবান্ন পুনরভিনয়, পরের বছর 'পথিক', তারপর 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র', 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা'—প্রত্যেক নাটকে তৃপ্তি নায়িকা: তার সুমিত্রা, ফুলজান, এলা, নন্দিনী, বুলু ঐতিহাসিক চরিত্রসৃষ্টির নিদর্শন হয়ে আছে। 'বিসর্জন'-এ গুণবতী ও অপর্ণা এবং বিশ্বরূপার 'সেতু'তে 'অসীমা'র চরিত্রে অভিনয় তার অসামান্য অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ডাঃ কালিদাস নাগ বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নন্দিনী পাননি, এতদিন পরে যথার্থ নন্দিনীকে খুঁজে পাওয়া গেছে এই কলকাতাতেই। আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করতেন। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় য়ুরোপে তিনটি ভাষায় 'ডলস হাউস' দেখে এসে বলেছিলেন—The Indian Nora is the best। সারা ভারত এই নন্দিনী ও নোরাকে আপন করে নিয়েছে। ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক আকাদেমী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে এবছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কৃত করেছেন এ গৌরব, তৃপ্তির একার নয়, বহুরূপীরও, বাংলাদেশের এবং তার নবনাট্য আন্দোলনেরও। এর আগে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' যে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে শ্রেষ্ঠ সম্মান বাংলাদেশে বয়ে এনেছিল এবং নাট্যপরিচালক হিসেবে শ্রীশম্ভু মিত্র যে আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছিলেন সেকথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কলকাতার অভিনেতৃ সংঘ এই উপলক্ষে তৃপ্তিকে সংবর্ধনা জানিয়ে বাংলাদেশের এক অনন্যা শিল্পপ্রতিভাকেই সংবর্ধিত করলেন।

●

শিশির-যুগের অসামান্য প্রতিভাধর অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যু বাংলাদেশের নাট্য-জগতের এক পরম শোকাবহ ঘটনা। যাত্রার আসর থেকে থিয়েটার এবং থিয়েটার থেকে ফিল্ম—যেখানেই আত্মপ্রকাশ করেছেন সেখানেই স্বীয় বিশিষ্টতায় তিনি উজ্জ্বল। মঞ্চে খুব বেশি চরিত্রে তিনি অভিনয় না করলেও তাঁর অভিনীত কয়েকটি চরিত্র স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যেমন 'মীরকাশিম', 'দুষ্টবিহারী', 'রমেশ' প্রভৃতি। তাঁর একটি নিজস্ব বাচনভঙ্গী ছিল যেটা তাঁর অভিনয় চরিত্রকে তাঁর ব্যক্তিত্বের নীলমোহরেই উজ্জ্বল করে তুলত। তিনি 'বহুরূপী'র হিতাকাংখী ছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর একটি লেখায় তিনি বলেছিলেন: 'থিয়েটারের ভালো যারা চায়, তাদের ভালো আমার অন্তরের কামনা'। ব্যক্তিগত ভাবেও আমাদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে বড় হওয়া সত্বেও। তাঁর ব্যবহারে একটা ভদ্র মার্জিত সৌষ্ঠব ছিল সেটা আজ বিশেষ করে মনে পড়ে—যেমন মনে পড়ে ফিল্মে অভিনীত তাঁর অগণিত চরিত্রের মধ্যে কয়েকটি চরিত্রে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা। ছবি বিশ্বাস শুধু বড় শিল্পী ছিলেন না, মানুষ হিসেবেও তিনি বড় ছিলেন।

With the Compliments of BURMAH-SHELL